PG BN S1 01 (DSC)

দ্বি-বার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম

(সি.বি.সি.এস; এন. ই.পি ২০২০ অনুসরণে)

প্রথম ষাণ্মাসিক

বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-১

বাংলা

পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া মানবিক বিদ্যা অনুষদ

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড° **উষারঞ্জন ভট্টাচার্য,** অধ্যাপক, (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° **জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত,** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

ড° **কান্তারভূষণ নন্দী,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এল.ও.কে.ডি মহাবিদ্যালয়

ড° **সঞ্জয় ভট্টাচার্য,** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ্যবিষয়েৰ সমন্বয় রক্ষাকারী : ড° **সৈকত রাউত,** কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড° **মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী,** কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যয়ন উপকরণ নির্মাণ গোষ্ঠীর সদস্য

অধ্যায়	লেখক
১ ও ১৪	দীপঙ্কর সাহা, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
২	অশোক কুমার রায়, সন্দিকৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়
৩	ড° পবিত্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়
৪	দীপশিখা দাস, সন্দিকৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়
৫ ও ৬	ড° মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
৭	প্রাণজিৎ সরকার, গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়
৮ ও ৯	রিংকা দে, জাগীরোড মহাবিদ্যালয়
১০	ড°শান্তনু রায়চৌধুরী, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয় ও সুজিৎ সরকার, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
১১ ও ১২	ড° প্রিয়ব্রত নাথ, এস.এস. মহাবিদ্যালয়
১৩	ড° দেবারতি জানা, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পাদনা : ড° **উষারঞ্জন ভট্টাচার্য,** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° **সৈকত রাউত,** কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থন বিভাগের সম্পাদনা : ড° **সৈকত রাউত,** কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

This Self learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handique State Open University is made available under a Creative Commons Attribution-Non License (international) Commercial-Share Alike 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পঞ্জীয়ক দ্বারা প্রকাশিত

মুখ্য কার্যালয় : পাটগাঁও, রাণী গেট, গুয়াহাটি-৭৮১০১৭

নগর ক্যাম্পাস : রাষ্ট্রীয় সড়কপথ-২৭, রেশম নগর, খানাপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০২২·, www.kkhsou.in

পাঠ্য বিষয়ের পরিচয় : বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-১

বর্তমান মডিউলটি CBCS দ্বারা প্রস্তাবিত NEP-2020 আদরা অনুযায়ী সাজানো একটি দ্বিবার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের প্রথম ষান্মাসিকের জন্য গৃহীত পাঠ্য বিষয়। এই পাঠ্য বিষয়ের শিরোনাম 'বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-১', শিরোনামটি মডিউলের অধীন পাঠে কী কী আয়ত্ত করা যেতে পারে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। সমগ্র পাঠ্য বিষয়টি অধ্যয়ন করলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা অনুরাগীরা বাংলা সাহিত্যের (বিশেষত আদি ও মধ্য যুগের) বিশিষ্ট রূপ, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সামগ্রিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন। যুগসন্ধিরকাল ও তার সাহিত্য চেতনা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হবেন। সেইসঙ্গে এখানে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান ও প্রকরণকে নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল এবং পরীক্ষা-ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সমস্ত দিককে আয়ত্ত করার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত এই সকল বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্ব-অধ্যয়নমূলক বইটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিক-নির্দেশক সেতুবন্ধক মাত্র। আশা করা যায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পাঠ্য অন্তর্গত পাঠগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করে তাদের সৃজনশীলতা এবং শেখার মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁরা স্ব-শিক্ষা অর্জনের পথে সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন।

এই মডিউলটিতে সর্বমোট ১৪টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'প্রাক্ চর্যাপদ'। যেখানে মূলত চর্যাপদের পূর্বে বাঙালির যে সাহিত্যকর্ম, অপভ্রংশ-প্রাকৃত সাহিত্যে বাঙালির যে অবদান তারই নির্বাচিত বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রতিটি সাহিত্য বিষয়ে বাঙালির অবদান, মৌলিকতা ও অভিনবত্বের দিকটিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে চর্যাপদকে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চর্যাপদের সাধনপন্থা, রচনাকাল, পদকার পরিচিতি প্রভৃতি বিষয়গুলোকে নিয়ে সংবদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার সমসময়' বিষয় হিসাবে রয়েছে। এই অধ্যায়ে মূলত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির প্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে, সেইসঙ্গে তার অব্যবহিত পরের কিছু সাহিত্যিক উপাদানের উৎস নির্দেশ করা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল 'অনুবাদ সাহিত্য' ধারাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য ধারার তিন বিশিষ্ট ধারা অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের ধারার অনুবাদ কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যের ধারাকে দুটি ভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলার মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে বাংলা পদাবলি সাহিত্য, বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্য ও চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের আলোচনা রয়েছে। মূলত এই তিনটি অধ্যায় পরম্পরায় বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন ভাবে জানতে পারবেন। দশম অধ্যায়ে নাথসাহিত্য ধারাটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, সেইসঙ্গে বাংলার ব্যতিক্রমী সাধনপন্থার বিশিষ্ট চিন্তাগুলো এখানে রূপ নিয়েছে। অধ্যায় একাদশে রাজসভার সাহিত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বাংলার রাজসভার সাহিত্য বলতে রোসাঙ্গ রাজসভার সাহিত্যকেই বোঝায়, সেই মিথ খণ্ডন করে, এখানে রোসাঙ্গের পাশাপাশি কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজসভার সাহিত্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। ১২তম, ১৩তম এবং ১৪তম অধ্যায়ে যথাক্রমে বাংলার গাথা ও গীতিকা, বাউল ও সুফি সাধনা ও সাহিত্য এবং বাংলার অপরাপর সাহিত্য প্রয়াসকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থী বাংলার আরও কিছু বিশিষ্ট সাহিত্য ধারা বিষয়ে অবগত হতে পারবেন।

এই পাঠ্যবিষয়গুলো অধ্যয়ন করার সময়, শিক্ষার্থী মূল পাঠের নীচে আয়তকার বাক্সের মধ্যে পাঠের অতিরিক্ত কিছু বিষয় 'আসুন জেনে নেই' শিরোনামে জানতে পারবেন। আবার, 'অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন'-এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থীর

অধ্যয়নের অগ্রগতির স্ব-মূল্যায়নের সুবিধা দেবে। এই প্রশ্নাবলির উত্তর বা উত্তরের নির্দিষ্ট সংকেত 'অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। 'অতিরিক্ত পঠন' বিভাগে উল্লিখিত বইগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন ধারণার বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য সহায়ক, একইসঙ্গে এই অধ্যায়টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঋণস্বীকারক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী যদি এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে উল্লিখিত বইগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন। কিছু নমুনা প্রশ্নও অধ্যায়ের শেষে 'আদর্শ প্রশ্নাবলি' হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

বিষয় সূচি

অধ্যায় ১ : প্রাক্ চর্যাপদ
বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম, বাংলা সাহিত্যে জয়দেব, যুগবিভাগ ও যুগলক্ষণ

অধ্যায় ২ : চর্যাপদ
আবিষ্কার, পুথিপরিচয়, নামকরণ, প্রতিফলিত সমাজজীবন

অধ্যায় ৩ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার সমসময়
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কার, পুথি পরিচয়, কবি পরিচয়, বিষয়বস্তু

অধ্যায় ৪ : অনুবাদ সাহিত্য
বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ত্রিধারা, রামায়ণের অনুবাদ- কবি পরিচয়, মহাভারতের অনুবাদ-কবি পরিচয়, ভাগবতের অনুবাদ-কবি পরিচয়

অধ্যায় ৫ : মঙ্গলকাব্য-১
বিজয়গুপ্ত বিরচিত মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনি ও কবি পরিচয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-কাহিনি ও কবি পরিচয় ও অন্নদামঙ্গল কাব্য কাহিনি ও কবি পরিচয়

অধ্যায় ৬ : মঙ্গলকাব্য-২
ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি ও কবি পরিচয়, শিবায়ন কাব্যের কাহিনি ও কবি পরিচয়

অধ্যায় ৭ : পদাবলি সাহিত্য
চৈতন্য পূর্ব ও পরবর্তী পদকার পরিচয় (বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস) শাক্ত পদাবলির বিষয়বস্তু ও কবিপরিচয় (রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও দাশরথি রায়)

অধ্যায় ৮ : বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্য
বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়- উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পদকল্পতরু

অধ্যায় ৯ : চৈতন্য জীবনীসাহিত্য

সংস্কৃত ও বাংলা জীবনীকাব্য- সংস্কৃতে রচিত চরিত গ্রন্থ, বাংলা রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অধ্যায় ১০ : নাথ সাহিত্য

ধর্মপন্থার সম্যক পরিচয়, নাথ সাহিত্যের ভিন্নধারা (গোরক্ষবিজয় ও সতী ময়নামতীর গান) উল্লেখযোগ্য কবি

অধ্যায় ১১ : রাজসভার সাহিত্য

কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজসভার পরিচয় ও সাহিত্যচর্চা

অধ্যায় ১২ : গাথা ও গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পালা পরিচয়, সমাজজীবন

অধ্যায় ১৩ : বাউল ও সুফি সাধনা

বিশিষ্ট বাউলদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বিশিষ্ট সুফি সাধকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যায় ১৪ : অপরাপর সাহিত্য প্রয়াস

যুগসন্ধিরকাল ও কবিত্ব লক্ষণ, কবিওয়ালাদের উদ্ভব, ভোলাময়রা, হরুঠাকুর, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ্পা ইত্যাদি

অধ্যায় ১ : প্রাক্ চর্যাপদ

বিন্যাস-ক্রম

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১.২ পরিচয়
১.৩ বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম
১.৩.১ সংস্কৃত সাহিত্য
১.৩.২ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য
১.৩.৩ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাব
১.৪ বাংলা সাহিত্যে জয়দেব
১.৪.১ জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত
১.৪.২ কাব্য-বিশ্লেষণ
১.৪.৩ প্রভাব ও গুরুত্ব
১.৫ যুগবিভাগ ও যুগলক্ষণ
১.৫.১ আদিযুগ
১.৫.২ মধ্যযুগ
১.৫.৩ আধুনিক যুগ
১.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১.৮ অতিরিক্ত পঠন
১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে জানবেন।
- প্রাক্ চর্যা যুগে বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের অবদান সম্পর্কে জানবেন।
- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও যুগলক্ষণ সম্পর্কে অবগত হবেন।

১.২ পরিচয়

সাহিত্য কেবল রচয়িতার নিজের কথা নয়, সমাজসহ বাইরের জগতের ভাষাচিত্র। সাহিত্য হল সাহিত্যস্রষ্টার মনোবীণায় ঝংকৃত সুর-সুষমা কিংবা শিল্পীর মনোজাত রসমণ্ডিত শিল্প-প্রতিমা।

সাহিত্য রচয়িতা দেশ-কালের বাস্তবভূমিতে অবস্থান করেন বলেই সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে ভাষা, জাতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিচয় তিনি তাঁর রচনার দ্বারা তুলে ধরেন। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে আবুল ফজল সর্বপ্রথম 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেন। আবার এই বঙ্গ বা বাংলা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে-

- 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন : বঙ্গাল শব্দ থেকে বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গালা প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।
- 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে জাও দ্য বারোস বাংলাদেশের যে মানচিত্র ও নক্সা অঙ্কন করেছিলেন, তাতে সমগ্র বাংলাদেশকে তিনি Bengalla বলেছেন। এছাড়া ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ফান ডেন ব্রুক যে মানচিত্র অঙ্কন করেন তাতে Bengala বলতে সমস্ত দেশকেই নির্দেশ করেছেন। আবার রেনেলের বিস্তারিত মানচিত্রে এই দেশের নাম দেওয়া হয়েছে Bengal।
- 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে গোপাল হালদার বলেছেন, 'রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি প্রথম দিকে বোঝাত বিশেষ বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে; তারপরে তাদের বাসস্থল হিসাবে এক একটা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে।'
- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন- 'ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব হইতেই ইংরাজ বণিকগণ এই দেশকে Bengal বলিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বাংলা ভাষাকেও Bengal Language বলিতেন। হালহেড ইংরাজী ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাকে Grammar of the Bengal Language (1778) বলিয়াছিলেন। মনোএল-দ্য-আস্-সুম্পসাম্ ১৭৪৩ সালে পর্তুগীজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রোমান হরফে লিসবন হইতে মুদ্রিত করেন। তিনি উক্ত ব্যাকরণের আখ্যা দিয়াছিলেন, Vocabulario Idioma Bengalla e Portuguez.'
- 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার সেন বলেছেন— 'আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, অধিকাংশ দেশনাম জাতিনাম হইতে আগত। (সেইজন্য সংস্কৃতে দেশনামে সাধারণত বহুবচন হয়। যেমন, 'অস্তি মগধেষু চম্পকবর্তী নামারণ্যানী', 'বঙ্গেষু আহববর্তিনঃ' ইত্যাদি।) সুতরাং বঙ্গজাতির অধ্যুষিত অঞ্চল 'বঙ্গ' দেশ। অথবা বঙ্গে-জলময় দেশে-যাহারা পূর্বাপর বাস করিত তাহারা 'বঙ্গ' এবং পরে তাহাদের নিবাসভূমি 'বঙ্গ' দেশ।'

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির আবাস তথা সেই সমভূমিকে বলা হত 'বঙ্গদেশ'। ইংরেজিতে যার নাম 'বেঙ্গল'। প্রথম 'বঙ্গ' শব্দটি ছিল এক কৌমগোষ্ঠীর নাম। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসেবে 'বঙ্গ' নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গবাসীদের 'বয়াংসি' বা পক্ষিজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, আর 'পুণ্ড্র'দের দস্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারত রচনার যুগে 'বঙ্গ', 'কবট', 'সুহ্ম' প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়। হিন্দু যুগের ইতিহাসে বঙ্গ ও গৌড় দুই জনপদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পাঠান

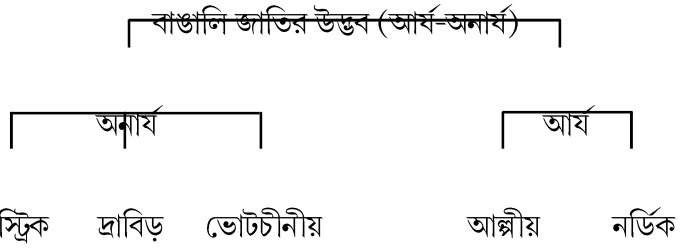
আমলে বঙ্গভূমি শুধু 'গৌড়' নামে পরিচিত হয়েছে। 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যবহার যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হয়েছে, একথা বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ মনে করে থাকেন।

বাঙালি জাতি বলতে আমরা কেবল তাদেরই বুঝি, যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলাদশের এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন—

- বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু এই জাতি গঠনের কাজ কবে শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। এমনকি যেসব লোক বাংলাদেশে এসে বসবাস করেছে তাদের দৈহিক সমাবেশও স্পষ্ট নয়।
- ভারতে বা বাংলায় মানুষের উদ্ভব হয়নি, আগমন হয়েছিল। এ আগমনের প্রথম হল নিগ্রোবটু জাতীয় মানুষ, যারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকা থেকে স্থলপথে ভারতে এসেছিল। আসামে নাগাদের মধ্যে এদের অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন মেলে। পরবর্তীকালে অন্য জাতির সঙ্গে সংঘাতের ফলে এরা বিনষ্ট হয় এবং কিছু মিশেও যায়।
- নিগ্রোবটুদের পর আসে 'প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড বা প্রাথমিক-অস্ত্রালাকার জাতি, যাদের ভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে এখনকার নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে এরা মিশে রয়েছে।
- প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডের পর আসে অস্ট্রিক জাতি। এদের আকৃতি, আগমনের সময় ও পথ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অস্ট্রিক ভাষী লোকজন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এদের অধিষ্ঠান ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায়। এই অনুমানের ভিত্তি হল- তাদের ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর প্রভৃতি মধ্য ও পূর্ব ভারতের কতকগুলি ভাষা এবং আসামের খাসিয়া ভাষা অস্ট্রিকের নিদর্শন।
- অস্ট্রিকের পর আসে দ্রাবিড়রা। এরা আসে পশ্চিম দিক থেকে এবং এদের উৎপত্তি ভূমধ্যসাগরীয় জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্য থেকে। দ্রাবিড়রা বেশি করে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতেই উপনিবিষ্ট হয় এবং উত্তর ভারতের নদীমাতৃক সমতলভূমিতে অস্ট্রিকদের সঙ্গে দ্রাবিড়রা মিশে যায়।
- দ্রাবিড়দের পর আর্যরা আসে পশ্চিম থেকে এবং এদের আগমনে ভারতে 'মহামানবের মেলা' পূর্ণ ও সার্থক হবার অবকাশ পায়। কারণ অনার্যরা ছিল মূলত সভ্যতায়, নগর গঠনে, বাদ্য ও অন্য শিল্পে উন্নত এবং আর্যরা ছিল কল্পনাশীল ও কৃতকর্মা জাতি। এই দুয়ের সংমিশ্রণের ফলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বৎসরের মধ্যে।
- এরপর আগমন ঘটে ভোটচীন বা মোঙ্গল জাতির মানুষের। তারা উত্তর চিন থেকে তিব্বতে এসেছিল এবং পরে হিমালয় অতিক্রম করে আসামের পথ ধরে ভারতবর্ষের উত্তরে বা উত্তরপূর্ব কোণে উপনিবিষ্ট হয়।

  আর্য আগমনের পূর্বে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষাভাষী অনার্যরা এদেশে বসবাস

করত। আর্য অধিকারের পর আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। ইতিহাসের এই বিবর্তনেই বাঙালি জাতির উদ্ভব। বাঙালি জাতির প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেন বাংলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্কদেব (সপ্তম শতাব্দী)। সেই থেকে এ পর্যন্ত বাঙালি জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।



বাংলা লিপির উৎস ও ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের দুটি লিপি- ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। এমনকি পরবর্তীকালের সমস্ত ভারতীয় লিপির উৎস ছিল এই দুই লিপি। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন—

'ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুটি খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী-অশোকের অনুশাসনে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মী বাম হইতে ডাহিনে, খরোষ্ঠী ডাহিন হইতে বামে লিখিত হয়। খরোষ্ঠী সেমীয় লিপি হইতে উৎপন্ন।'

খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপির তিনটি প্রধান আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়, যা -উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় ও বহির্ভারতীয়। ক্রমবিকাশের নানাস্তরের মাধ্যমে উত্তর ভারতীয় লিপি থেকে বাংলা, নাগরী প্রভৃতি, দক্ষিণ ভারতীয় লিপি থেকে তামিল, তেলেগু প্রভৃতি এবং বহির্ভারতীয় লিপি থেকে তিব্বতী, বর্মী, শ্যামদেশীয়, যবদ্বীপী প্রভৃতি লিপির জন্ম হয়েছে। অবশ্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যভারতীয় লিপি বলে আর একটি লিপির উল্লেখ করেছেন।

দশম শতকে মহীপালের বাণগড় লিপিতে সর্বপ্রথম বাংলা লিপির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এর এক শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা লিপির প্রায় পূর্ণরূপ গড়ে উঠে। সেনযুগে বাংলা অক্ষরের আকার গঠিত হলেও স, চ, ছ, ট, ণ, ও, শ, হ তখনও বেশ পরিণত রূপ লাভ করেনি। মুসলমান রাজত্বের সময় এই অক্ষরগুলি পূর্ণতা লাভ করে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরও বাংলা অক্ষরের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বেশ কিছু কাল পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব ভারতে বাংলা লিপির আধিপত্য ছিল। এমনকি ওড়িয়াও বাংলা লিপি থেকে উদ্ভূত। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা অক্ষর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আর এই বাংলা লিপির উদ্ভবের পেছনে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা আছে। কারণ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে ।

বাংলা ভাষা ভারতীয় 'হিন্দু আর্য' গোষ্ঠীর ভাষারই বংশধর। বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস ছিল এইরকম-

- বাংলা ভাষা আধুনিক রূপ গ্রহণ করেছিল খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে, চর্যাপদে যার অন্যতম পরিচয় মেলে।

  বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তর ছিল মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ বা মাগধী প্রাকৃত।
- সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে মাগধী প্রাকৃত ভাষা প্রতিবেশী মগধ থেকে আগত রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, ঔপনিবেশিকের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে আসতে থাকে।
- আর্যভাষা বাংলাদেশের কতকগুলি নগরে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে দেশের অভিজাত উচ্চবংশীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে রাজভাষার মর্যাদা পাওয়ায় এবং শক্তিশালী উত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের ভাষারূপে পরিগণিত হওয়ায় বিনা বাধায় তা তৎকালীন লোকসমাজে প্রচলিত হতে থাকে।
- আর্যভাষা প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশের লোকেরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় ভাষায় কথা বলত। সুতরাং 'অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীন এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে এক-ই ভাষাসূত্রে এবং এক-ই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধিয়া দিল বিহারের পথ ধরিয়া আগত উত্তর ভারতের আর্যভাষা।'

যে মূল ভাষা থেকে বাংলা ভাষা জন্ম নিয়েছে তার নাম ইন্দো-ইওরোপীয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর আগে সম্ভবত দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে এই ভাষাভাষীরা মানুষেরা বসবাস করত। পরে এরা ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার অন্যতম সন্ততি ইন্দো-ইরানীয় ভাষার (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০) শাখা হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০; বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ এই সময়ের রচনা।

পরবর্তী স্তর হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তর। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ১০০০। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা এই স্তরের। পালি (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব ২০০) ভাষার নিদর্শন মেলে অশোকের শিলালিপি ও বুদ্ধদেবের উপদেশাবলির মধ্যে। প্রাকৃত ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর (খ্রিস্টপূর্ব ২০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ)। প্রাকৃতের প্রধান শাখা চারটি— উত্তর পশ্চিমা (পৈশাচী), দক্ষিণ পশ্চিমা (শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী), প্রাচ্যা (মাগধী), মধ্যপ্রাচ্যা (অর্ধমাগধী)। আবার এইসব প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ- মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ, শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ। বিদ্যাপতি রচিত 'কীর্তিপতাকা' এই ধরনের অপভ্রংশের নিদর্শন। এইসব অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ থেকে আধুনিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম (১০০০ খ্রিস্টাব্দ)। মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক নব্য ভারতীয় ভাষা বাংলার জন্ম হয়।

১.৩ বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম

বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিদের রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের

প্রভাব রয়েছে অনেকটাই। চর্যার কাল যে বাংলা ভাষার জন্মের উষালগ্ন, তাতে সন্দেহ না থাকলেও আমরা জানি, ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বাঙালির সেই প্রাচীনতম ঐতিহ্যের পরিচয় নিঃসন্দেহেই প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন সেই ঐতিহ্যের দ্বারাই একান্তভাবে পরিপুষ্ট। বাংলাদেশে আর্যভাষা প্রবর্তিত হবার পর থেকে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অপভ্রংশে যা কিছু রচিত হয়েছে, তার আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুখ্য অঙ্গ না হলেও উপক্রমণিকারূপে গণ্য। এই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বের সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) সংস্কৃত সাহিত্য।

(খ) প্রাকৃত সাহিত্য।

(গ) অপভ্রংশ-অবহট্ট সাহিত্য।

১.৩.১ সংস্কৃত সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে—

(১) প্রস্তর, তাম্রপত্র, মন্দিরগাত্র প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ রাজকীয় শাসন, দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক শ্লোক, শিলালেখ প্রভৃতি: মৌর্য যুগে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য আর্যসংযোগ ঘটে বলে পণ্ডিতেরা মনে করলেও এ যুগে বাঙালির সাহিত্য সাধনার তেমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া গেছে-

- বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে, যা পূর্বীপ্রাকৃতে রচিত। লিপিটি খণ্ডিত এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। লিপিটি মৌর্য যুগের, হয়তো খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ হয়েছিল।
- এরপরের লিপিটি শুশুনিয়া পাহাড়ে। সংস্কৃত ভাষার এই লিপিটি রাজা চন্দ্রবর্মা উৎকীর্ণ করেছিলেন। প্রত্নবিশারদদের মতে এর লিপিকাল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।
- এছাড়াও গুপ্তযুগের এমন অন্তত আটটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

এইসব তাম্রলিপিগুলি মূলত পুরাণাশ্রয়ী, যা সেন ও বর্মন বংশের শাসনকালে উৎকীর্ণ। যেমন, কাটোয়ার কাছে সীতাহাটি-নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লাল সেনের শাসনের আরম্ভশ্লোক:

'সন্ধ্যাতাণ্ডবসম্বিধানবিলসান্নান্দী নিনাদোর্ম্মিভির্
নির্ম্মর্য্যাদরসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈর্
নাট্যারম্ভরয়ৈর্জায়ত্যতভিনবদ্বৈধানুরোধশ্রমঃ।।'

অনুবাদ : 'যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে সুললিত অঙ্গচেষ্টায় এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নাট্যারম্ভ-প্রচেষ্টায় অভিনয়দ্বয়ানুরুদ্ধ শ্রম উদ্ভুত হইতেছে, সন্ধ্যাতাণ্ডবোৎসবে উদ্যত নান্দীনিনাদরূপ উর্ম্মিতে উদ্বেলিত রসার্ণব যাঁহার স্বরূপ সেই অর্দ্ধনারীশ্বর তোমাদের শ্রেয় বিধান করুন।'

(২) সাহিত্যের বিষয় যথা-নিবন্ধ, ব্যাকরণ ইত্যাদি : খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে

সাহিত্য-গুণান্বিত গদ্য বা পদ্য লেখার নিদর্শন পাওয়া না গেলেও বাঙালির সংস্কৃত রচনার পরিচয় খুব দুর্লভ নয়। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পালকাপ্য রচিত 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' গ্রন্থ। এছাড়া চন্দ্রগোমীর 'চান্দ্রব্যাকরণ', 'লোকানন্দ' (নাটক) এবং 'শিষ্যলেখ' (ধর্মকাব্য) রচনাগুলিও ছিল উল্লেখযোগ্য। গৌড়পাদের 'গৌড়পাদকারিকা' নামক আগমশাস্ত্র খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে রচিত।

সেইসময় বাংলাদেশে কিছু ন্যায়বৈশেষিক সংক্রান্ত তর্কবিদ্যা এবং অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে শ্রীধর ভট্টের 'ন্যায়কন্দলি' নামক টীকাটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভবদেব ভট্টের 'ব্যবহারতিলক', 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ'; জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'ব্যবহারমাতৃকা', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালির সমাজগঠনের বিচিত্র প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি বৌদ্ধ মহাযান ও সহজযান মতাবলম্বী বহু বাঙালি যোগী ও তান্ত্রিক সিদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষায় দর্শন ও যোগতত্ত্বঘটিত কিছু গ্রন্থ, দেবদেবীর স্তব ও পূজা সাধন-বিষয়ক নিবন্ধ লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, সরহপাদ, কৃষ্ণপাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

(৩) প্রকীর্ণ কবিতা : একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্বে বাঙালি কবিরা বড় বড় কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট কবিতা, শ্লোক রচনায় বেশি তৎপর ছিলেন, এবং সেইসব শ্লোকে বাঙালির লিরিক-প্রতিভা একটা নতুন প্রকাশ-রীতি লাভ করেছিল। বিদ্যাধর সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তুর্কী আক্রমণ পূর্ব তথা দ্বাদশ শতকের প্রথমে পালরাজত্বে বাংলাদেশের কবিতাকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ধরা পড়েছে 'সুভাষিত রত্নকোষ' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংকলন গ্রন্থে।

বিদ্যাধর সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' সংস্কৃত ভাষায় প্রথম সংকলিত কোষকাব্য, এর আগে প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহের অনুরূপ উদ্যম তেমন দেখা যায়নি। এতে প্রায় ১৫০ জন কবির ১৭৩৮টি প্রকীর্ণ শ্লোক গৃহীত হয়েছে। সকলেই বাঙালি কবি ছিলেন না। শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় কবিগোষ্ঠীর শ্লোকও গৃহীত হয়েছে। এমন অনেক বাঙালি কবির নাম রয়েছে, যা এই কোষগ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত ভাষায় প্রকীর্ণ কবিতা রচনায় বাঙালি কবিকুল একাদশ শতকের আগেই সাধারণভাবে যে সাবলীলতা অর্জন করেছিলেন, তারই ঐতিহাসিক দলিল ছিল এই গ্রন্থ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান' গ্রন্থে জানিয়েছেন— 'সুভাষিত রত্নকোষ'-এর অংশবিশেষ হল 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থ। এই সংকলনের সম্পাদক এফ. ডব্লিউ, টমাস সমগ্র পুথিটিকে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে অভিহিত করেছেন। এই গ্রন্থের সংকলক কে তা জানা যায় না। কবিতা সমষ্টির অনেকগুলি বাঙালি কবিদের (গৌড় অভিনন্দ, মধুশীল, শ্রীধর নন্দী) রচনা। গ্রন্থটিতে মোট ৫২৫টি কবিতা আছে। কবিরা কেউই একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নন, তাই খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে

গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। গ্রন্থের কবিতাগুলি লিরিকধর্মী। বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনাও বেশ লাবণ্যময়। 'হরিব্রজ্যায়' উদ্ধৃত 'ব্রজ্যা' শ্লোকগুলিতে রাধা-কৃষ্ণলীলার মধুর রসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— 'সুগত ব্রজ্যা', 'লোকেশ্বর ব্রজ্যা', 'হরিব্রজ্যা', 'সূর্যব্রজ্যা', 'বসন্ত', 'মালিনী', 'বিরহিণী' প্রভৃতি ব্রজ্যা।

রাধাকৃষ্ণের এই লীলাই বর্ণিত হয়েছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলিতে। আসলে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাক্‌রূপ। বিরহিণী বা অসতীব্রজ্যায় যে সব লৌকিক প্রেমের কবিতা রয়েছে, তারও প্রভাব পড়েছে বৈষ্ণব পদাবলিতে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য সম্পাদনে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ তাই 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের' শ্লোকগুলির কাছে ঋণী।

বাংলাদেশে সংকলিত আর একটি জনপ্রিয় চয়নিকা হল 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। এর সংকলক হলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের 'প্রেমৈক পাত্র সখা' তথা বটুদাসের সুযোগ্য পুত্র 'মহামান্তলিক' শ্রীধর দাস। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাঙালির জীবন ও সমকালীন সমাজের যে প্রতিফলনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই চয়নিকার প্রভাব অপরিসীম। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলিত হয়। এতে মোট পাঁচটি প্রবাহ, এক-একটি প্রবাহে কয়েকটি বীচি এবং প্রত্যেক বীচি-তে পাঁচটি করে কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মোট ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা রয়েছে। অজ্ঞাত পরিচয় ৮০ জন কবি (সম্ভবত বাঙালি) ছাড়াও কালিদাস, ভাস, ভামহ, ভর্তৃহরি, উমাপতিধর, জয়দেব প্রভৃতি বাঙালি কবিদের শ্লোক গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। স্বভাবতই সংকলন গ্রন্থটির শুরুত্ব ছিল যথেষ্ট—

- সংগৃহীত শ্লোকাবলি থেকে বাংলার চিরকালীন রূপ, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম-দর্শন এবং বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই সংকলন গ্রন্থটির প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষভাবে বৈষ্ণব পদাবলিতে এবং মঙ্গলকাব্যে দৈনন্দিন জীবনবিষয়ক কবিতাগুলির প্রতিফলন পড়েছে।
- বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে বাঙালি যে বিভিন্ন শ্লোক রচনার মধ্য দিয়ে তার লিরিকধর্মী মনের পরিচয় প্রকাশ করছিল, তারই প্রমাণ মেলে এই সংকলন গ্রন্থে।
- গ্রন্থটি ছিল বাঙালি কবিদের রচিত এবং বাঙালির দ্বারা সংকলিত পদসংকলন গ্রন্থ।
- স্বভাবতই ক্ষিতিমোহন সেন গ্রন্থটি সম্পর্কে জানিয়েছেন— 'নানা কবির রচনা হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে সংগ্রহ করিবার কাজটা হয়তো বাঙলাদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল।'

(৪) কাব্য নাটক ইত্যাদি : প্রাচীনকালে যাকে রসসাহিত্য বলা হত, যার দ্বারা একটা জাতির

প্রাণ ও মনের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করা যায়, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ সাহিত্যের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। তার কারণ, সেনযুগে যখন নতুন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যানুশীলন আরম্ভ হয়েছে তখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবক্ষয়ের যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। অপভ্রংশ সাহিত্যের ছায়াতল ছেড়ে উত্তর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ কেবল স্বাতন্ত্র্য লাভ করছিল; ফলে সেই অঞ্চলগুলিতে সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার বিশেষ অবকাশ ঘটেনি।

জনশ্রুতি ছিল, সেইসময় কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের নাট্যকার বাঙালি ছিলেন, অথবা দু-একটি সংস্কৃত নাটক বাংলাদেশে রচিত হয়েছিল। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', নারায়ণ ভট্টের 'বেণীসংহার', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নাটকগুলিতে এমন কোনো উল্লেখ নেই, যার দ্বারা নাট্যকারদের জাতকুল নির্ণয় করতে পারা যায়।

কাব্যের ক্ষেত্রে শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', নীতিবর্মার 'কীচকবধ' প্রভৃতি বাঙালি কবির রচনা বলে দাবি করা হলেও সেই দাবির পিছনে ঐতিহাসিক প্রমাণের যথেষ্ট অভাব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-কেই সেই সময়ের বাঙালির সাহিত্যকর্মের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন বলা চলে। রচনাটি শ্লেষ কাব্যের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কাব্যটির কাহিনিতে রামকথা যেমন প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হয়েছে, বঙ্গাধিপ রামপালদেবের ইতিহাস ঠিক তেমন ভাবে ব্যক্ত হয়নি।

এছাড়া সেইসময়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ভুমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এই পঞ্চরত্ন ছিলেন—

- উমাপতি ধর। (লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম মন্ত্রী, পল্লবিত কাব্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় 'গৌড়ীয় রীতির অনুসরণ করেছেন'।)
- শরণ। (তাঁর ব্যক্তি পরিচয় জানা যায় না। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে শরণদেব, শরণ, শরণদত্ত, চিরন্তন শরণ প্রভৃতি নামে ২২টি শ্লোক পাওয়া যায়।)
- ধোয়ী। ('সুভাষিতাবলি'-তে ধোয়ীকে 'কবিরাজ' বলা হয়েছে। তাঁর কাব্যের নাম 'পবনদূত', 'মেঘদূতের' অনুসরণে 'বৈদর্ভী' রীতিতে রচিত।)
- গোবর্ধন আচার্য। (দ্বাদশ শতকের বিশিষ্ট কবি, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'আর্য সপ্তসতী'।)
- জয়দেব। (পঞ্চরত্নের অন্যতম। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'গীতগোবিন্দ'।)

১.৩.২ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস অনেকটাই সুপ্রাচীন। বিশেষত পালি, বৌদ্ধ-সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত, কাব্যের প্রাকৃত, অর্ধমাগধী-সমস্তই প্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা

প্রতিষ্ঠার পর পুরোপুরি প্রাকৃত নাটক পাওয়া যাচ্ছে দশম শতকে। রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রধানত শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত। সপ্তম শতাব্দীর আগে থেকেই অবশ্য প্রাকৃতে রচিত কয়েকটি আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য পাওয়া যায়— মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত প্রভারসেনের 'সেতুবন্ধ' বা 'রাবণবহো', শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত বাক্পতিরাজের 'গৌড়বহো', জৈনতীর্থঙ্করদের জীবনী অবলম্বনে রচিত প্রাকৃত মহাকাব্য 'পউমচরিঅ', 'মহাবীরচরিঅ', অপভ্রংশে রচিত 'নেমিণাহচরিউ প্রভৃতি। প্রাকৃত রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকীর্ণ কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মহাকবি হাল রচিত 'গাহা-সত্তসই' এবং প্রাকৃত ছন্দের গ্রন্থ পিঙ্গল রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'।

প্রাকৃত কবিতাসংগ্রহ হিসেবে হালের 'গাথাসপ্তশতী' (গাহাসত্তসই) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন বংশের রাজা 'হাল' শ্লোকগুলি মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচনা করেছিলেন। কাব্যটি লোকজীবনের উজ্জ্বল চিত্র হিসেবে বিশেষ প্রশংসিত। ড° অসিতকুমার প্রসঙ্গতই বলেছেন— 'বাঙালি জীবনচিত্র হিসেবেই গাথাসপ্তসতী ও প্রাকৃতপৈঙ্গল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার বস্তু।' মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত মোট ৭০০ শ্লোকে বিরহ-মিলনের অশ্রুবেদনা ও কামনার চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'গাথাসপ্তসতী' গ্রন্থটিতে। এই সংকলন গ্রন্থেই প্রথম রাধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থটি বারাণসীতে পিঙ্গলের দ্বারা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি বিভিন্ন কবির রচনা, যার মধ্যে কিছু কিছু বাঙালির রচনাও রয়েছে; কেননা এতে এমন অনেক শ্লোক আছে যার ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষ্যকৌশল প্রায়ই বাংলার সমধর্মী। সংকলনের কোনো কোনো পদে বাঙালি জীবন ও মনোভাবের স্পষ্ট প্রভাব সূচিত হয়েছে— কৃষ্ণের গোপলীলা, প্রকৃতির বর্ণনা, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনচিত্রও এই সংকলনের কোন কোন শ্লোকে লক্ষ করা যায়। গ্রন্থে রাধাকে পৌরাণিক দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উজ্জ্বল রসসৃষ্টির দিক থেকে, বিরহিণীর স্বরূপ বর্ণনায়, বীররসের প্রকাশে ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রভাবের দিক থেকে এই সংকলন গ্রন্থের ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।

অবহট্ঠ :

অষ্টম শতাব্দীর আগেই অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ ভাষার নিদর্শন লক্ষ করা যায়। চর্যাপদের পাশাপাশি সরহপাদ ও কাহ্নপাদ দোহাকোষের দোহাগুলিও অবহট্ঠ ভাষায় রচনা করেছিলেন। সেই সব দোহায় বৌদ্ধ দার্শনিকতা ও দেহকেন্দ্রিক সাধনার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। দোহাকারেরা ধর্মসাধনায় আনুষ্ঠানিক পূজাচার ও মন্ত্রের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করতেন, বোধি বা পরমজ্ঞান দেহের মধ্যেই আছে, তাকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই। চর্যাপদের বিষয় ও বাক্ভঙ্গির সঙ্গে দোহাগুলির ভাবসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। চর্যাপদের সঙ্গে বিষয় ও আঙ্গিকের সাদৃশ্য থাকার কারণে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এই অবহট্ঠ কবিতার আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

১.৩.৩ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাব

হালের 'গাহাসত্তসই'-এ রাধার উল্লেখ এবং কৃষ্ণ ও গোপীপ্রেমের উল্লেখ আছে।

পরবর্তীকালের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'গীতগোবিন্দ'-র রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত শ্লোকাবলি ও ভাবাদর্শে হালের কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'-র ছন্দ যে গীতগোবিন্দ, চর্যাপদ ও তৎপরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল তা মেনে নিতেই হয়। প্রাকৃত যুগের শেষ স্তরের অর্থাৎ অপভ্রংশের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায় বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'-য়। অপভ্রংশে বস্তুত পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কবিতা লেখা হত।

বাঙালি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দোহাকোষগুলিও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। দোহাকোষ ও চর্যাপদের লিখন ভঙ্গিমায় ও ভাষা বিষয়ে মৌলিক সাধ্য অস্বীকার করা যায় না। ভাব ও প্রকাশরীতিতে চর্যা ও দোহাকোষ একই ভাবগোষ্ঠীর ভাবনা-সম্বলিত। ঊনবিংশ শতকের বাউল গানে তারই চরম পরিণতি লক্ষ করা যায়। পূর্বালোচিত সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার অভিজাত মনন-চিন্তার সঙ্গে অনভিজাত বাঙালি চেতনার নিবিড় জীবন-রসবোধের সমৃদ্ধিকে একত্র লক্ষ করা যায় চর্যাপদের বিভিন্ন গানে। আদিযুগ অতিক্রম করে মধ্যযুগের পথে বাংলা সাহিত্য যতই অগ্রসর হয়েছে, এই মিলন বন্ধন ততই হয়েছে ঘন সন্নিবিষ্ট। স্বভাবতই অভিজাত বাংলার সঙ্গে অনভিজাত বাংলার জীবন-সম্মিলনের এই ঐতিহ্য সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস বাঁধা পড়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালির সাহিত্যচর্চা বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১.৪ বাংলা সাহিত্যে জয়দেব

সংস্কৃত সাহিত্যে শেষ বাঙালি কবি 'জয়দেব', যাঁর দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হয়েও বাঙালি হৃদয়ে নিজ আসন তৈরি করে নিয়েছেন। কারণ, তাঁর কাব্যের ভাব ও ভাষা একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির। তাই বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য তাঁকে ভুলতে পারে না, পারবেও না। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলি বাংলা ভাষার উদ্ভবের সূচনা প্রস্তুত করে গিয়েছে। তাঁর ভাষার মাধুর্য, ভাবের চিরন্তনত্ব এবং সর্বোপরি রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রচিত পদাবলি বাংলা সাহিত্যের কাছে বিশেষ পাথেয় স্বরূপ। 'গীতগোবিন্দ' রচিত হওয়ার আটশত বৎসর পরও গ্রন্থটি উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। একটি কাব্যের দ্বারা বাঙালি সংস্কৃত সাহিত্যের সারস্বত সমাজে বিশেষ গৌরব লাভ করেছে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস। এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা বা সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে নাটগীতের ধরনে কাব্যটি রচিত। প্রসঙ্গত কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরম-আনন্দ।'

ষোড়শ শতকের হিন্দি কবি নাভাজী দাসও তাঁর 'ভক্তমাল' গ্রন্থে জয়দেবের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন—

'জয়দেব কবি হলেন রাজচক্রবর্তী অন্য সব কবিরা খণ্ডমণ্ডেলেশ্বর (ক্ষুদ্র গোস্বামী)। ত্রিলোকের এই 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।'

১.৪.১ জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত

জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নের মধ্যে অন্যতম। অজয় নদের তীরে বীরভূম জেলার 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী (মতান্তরে রাধাদেবী), পত্নী পদ্মাবতী। বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য জীবনী মতে পদ্মাবতী পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করতেন, এবং জয়দেব বোধ হয় নৃত্য-গীতের তাল রক্ষা করতেন। তাই 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে কবি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন— 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী'। বৈষ্ণব গোস্বামী ও মধ্যযুগীয় সাধক-সন্তদের কৃপায় ভারতের প্রায় সর্বত্র জয়দেব সম্বন্ধে নানা গল্প কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে। ফলত জয়দেবকে বাংলাদেশের, বীরভূমের, উড়িষ্যার, মিথিলার বলে প্রত্যেকে দাবি করেছেন।

জয়দেবের জন্মস্থান সম্পর্কে ওড়িয়া পণ্ডিত ও গবেষকগণ সিদ্ধান্তে এসেছেন জয়দেব বাঙালি নন, তাঁর জন্মভূমি বলে পরিচিত কেন্দুবিল্ব গ্রাম পুরী জেলায় অবস্থিত। ওড়িয়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক 'হরেকৃষ্ণ মহাপাত্র' জয়দেবকে ওড়িয়া কবিরূপে চিহ্নিত করলেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিমত মানেননি।

জয়দেব যে গৌড়ীয় কবি ছিলেন সেকথা মনোমোহন চক্রবর্তী ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ড° কৃষ্ণমাচারিয়া তাঁর 'History of Classical Sanskrit Literature' গ্রন্থেও জয়দেবকে বাঙালি ও লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি বলেছিলেন। গীতগোবিন্দের একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক পুঁথির পুস্তিকায় জর্জ বুলার দেখেছেন যে, লক্ষ্মণ সেন জয়দেবকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছেন। আবার 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায়- সেখানে একজন মুসলমান লেখক জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সভাসদরূপে চিহ্নিত করেছেন। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'যুক্তির পথে হাঁটলে জয়দেবকে বাঙালি বলেই গ্রহণ করতে হবে। আটশো বছর ধরে বাঙালি সেকথা স্মরণে রেখেছে। গৌড়ে মুসলমান অভিযানের পর সম্ভবত জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী-সহ পুরীধামে প্রস্থান করেছিলেন। ওড়িশার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব সুগভীর।'

১.৪.২ কাব্য-বিশ্লেষণ

'গীতগোবিন্দ' ছাড়া জয়দেব রচিত অন্যান্য কবিতাসমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও এই একটি কাব্যই জয়দেবের স্থান নির্ধারণে যথেষ্ট। সেকালের লৌকিক সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃতে ঢেলে সাজিয়ে তিনি দেবভাষায় অভিনব কবিতার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরই গীতিকবিতার

আদর্শে বাংলাদেশে, মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ পদাবলি ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারা নেমেছিল। 'গীতগোবিন্দ' মহাকাব্যের আধারে রচিত কৃষ্ণলীলাত্মক গীতিনাট্য। দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত, উক্তি-প্রত্যুক্তি ও সংগীতময় রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা নিয়ে চবিবশটি গানে কাহিনিটি বর্ণিত। এই বারোটি সর্গ হল- সামোদ দামোদর, অক্লেশকেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসুদন, সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ, বিলক্ষলক্ষ্মীপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ মাধব, সানন্দ গোবিন্দ এবং সুপ্রীত পীতাম্বর। জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাট-গীতের আকারে লেখা। তবে গীতগোবিন্দের গানগুলি অপরিহার্য ও মর্মস্পর্শী নাট্যধর্ম তুলনায় গৌণ। উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতের আকারেই পরিবেশিত। পাত্রপাত্রী মাত্র তিনটি সখী, কৃষ্ণ ও রাধা।

কাব্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণের শ্লোক, তারপর কবি পরিচিতি, হরিস্মরণ, কবি প্রশস্তি ও বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্র স্থান পেয়েছে। মূল কাব্যের আরম্ভ অপূর্ব বসন্ত দিয়ে। কৃষ্ণ রাধাকে এড়িয়ে অন্য গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে জেনে রাধার দুর্জয় মান, ভৎসিত ও পরিত্যক্ত কৃষ্ণের নির্বেদ এবং সখী দূতীর মধ্যস্থতায় দুই জনের মিলন এই কাব্যের বস্তু। পুরাণ, উপপুরাণ এবং লৌকিক কাহিনির অনুসরণে রচিত এই কাব্য। কাব্যখানিতে আছে মানব-মানবীর প্রেম মিলনের ছবি, আছে বাস্তবতাজনিত নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি আর গীতিমাধুর্য-যার অন্তঃস্থলে ভক্তিরসধারা বহমান। 'গীতগোবিন্দ' পরিস্ফুট হওয়ায় জয়দেবকে বৈষ্ণব কাব্যধারার আদি কবির সম্মান প্রদান করা হয়। উত্তরচৈতন্য যুগের কবিগোষ্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিমার জন্য জয়দেবের খ্যাতি প্রতিপত্তি বাঙালির মধ্যে কালজয়ী হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়দেবের কবিখ্যাতিকে আচ্ছন্ন করে তার উপর ভক্তের গৌরব আরোপিত হয়েছে। চৈতন্যদেব 'শ্রীগীতগোবিন্দ' দিবারাত্রি আস্বাদন করতেন। কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন-

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিনে করায় প্রচুর আনন্দ।।'

সহজিয়া মতে বৈষ্ণবগণ জয়দেবকে 'নবরসিক'-এর অন্যতম এবং আদিগুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। জয়দেবের ভাষাভঙ্গি পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্রের অনুসারী হলেও অন্তরঙ্গে বাংলা ভাষা-শৈলীর সম-স্বভাবের। সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি বাদ দিলে যে বাগমূলক পদাবলি গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হলেও এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গি যতটা প্রাকৃত বা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী, ততটা সংস্কৃতের নয়। গীতগোবিন্দের গীতাবলির ছন্দ মাত্রাপ্রধান হলেও তা প্রাকৃত অপভ্রংশের স্বভাবযুক্ত, সংস্কৃতের সঙ্গে তার পার্থক্য আমূল।

জয়দেবের কাব্য অতি মধুর। ভাষা সুললিত, পরিমার্জিত ও শ্রুতি সুখকর। এর রস শৃঙ্গার রস। এই কাব্যে মানব প্রেমের দেবায়ন সুপ্রতিষ্ঠিত। লৌকিক বৈভব এখানে রাধা কৃষ্ণে পরিণত। লৌকিক প্রেমানুভব এখানে দেব শৃঙ্গারানুভবে রূপান্তরিত। জয়দেব নিজেই স্পষ্ট করে বলেছেন- 'এই কাব্য হরির বিলাস বর্ণনা। এই কাব্য বর্ণনা করলে হৃদয় সরস হয়।' পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি ছিলেন জয়দেব। তিনি অপার্থিবকে পার্থিব রূপ ও রসের সীমানায় লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি জয়দেব তাঁর আত্মগত ভাবনার দ্বারা রূপ ও রসের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের অপূর্ব

এক যুগলমূর্তি রচনা করেছেন। তিনিই প্রথম রাধাপ্রেমকে কাহিনির অখণ্ডতায় নায়িকার পূর্ণ মর্যাদা দান করেন।

'গীতগোবিন্দ' কোন্ শ্রেণির রচনা এ নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে—

- উইলিয়াম জোনস্ বলেছেন - রাখালী নাটগীতি।
- লসেন বলেছেন - গীতিনাট্য।
- ভনশ্রোয়েভার বলেছেন - উন্নত ধরনের যাত্রা।
- পিসেল বলেছেন - অপেরা (অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত)।
- R.W. Frazer এর মত এই প্রসঙ্গে আলোচ্য- 'The poem of Jayadeva marks the gradual development in the twelfth century of the doctrine of Faith (bhakti), of emotion, and personal love towards a deity in human form.'

'গীতগোবিন্দ'-র গীতাংশই আসলে 'মধুর কান্ত পদাবলি'। ভাষাগত বিচারে জয়দেব পদাবলি যে পরিমাণে সংস্কৃত, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে সদ্যোজাত বাংলা ভাষা সাহিত্যের সংলগ্ন। গীতগোবিন্দের কাহিনি সংস্থাপনে নাট্যলক্ষণটুকুও লক্ষ করার মতো। অধিকাংশ ভাগই কৃষ্ণ ও সখীর সংলাপ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে; মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক শ্লোকের দ্বারা সেই সংলাপমূলক ঘটনাবলিকে গ্রথিত করা হয়েছে। চৈতন্যদেব যে জীবনবোধের চূড়ান্ত পরিণতি, জয়দেবে তারই প্রথম অঙ্কুরোদগম। এই কারণেই জয়দেব চৈতন্যদেবের কাছে পূর্বাচার্যের মর্যাদা পেয়েছিলেন। আর চৈতন্যের হাতে বাংলা সাহিত্যপথের যে মুক্তি, গীতগোবিন্দ-পদাবলিতে তার পূর্বসূচনা বলেই, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পথের প্রথম একক উল্লেখ্য নির্মাতা কবি জয়দেব গোস্বামী। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁকে আদি রসিক বলে ধরলেও আমরা তাঁকে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলেই গ্রহণ করেছি। জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের একজন বলার কারণগুলি সূত্রাকারে দেওয়া গেল—

- জয়দেব বাঙালি কবি।
- তাঁর প্রেমময় রাধাকৃষ্ণলীলা বাঙালি মনের অনুরূপ।
- পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব।

১.৪.৩ প্রভাব ও গুরুত্ব

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব স্মরণীয়। বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, ধ্বনিঝংকার, অলংকার কৌশল প্রভৃতিতে জয়দেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পদাবলির চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রায়শেখরের পদে রাধাকৃষ্ণলীলার যে পরিণতি লক্ষ করা যায়, জয়দেবের মধ্যে তার সার্থক সূচনা। জয়দেবের অনেক পদ কাব্যমূল্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও তাঁর ধ্বনিঝংকার চৈতন্য পরবর্তী অনেক সফল পদকর্তা জ্ঞানদাস, জগদানন্দ, যদুনন্দন প্রভৃতি অনুসরণ করে পদ রচনা করেন।

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর নানা জায়গায় গীতগোবিন্দের সাক্ষাৎ অনুসরণ

করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'জয়দেব' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'জয়দেব বৈষ্ণব পদাবলির আদি গঙ্গা-হরিদ্বার।' দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' কাব্যে এবং সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে নায়িকাদের রূপ বর্ণনায় জয়দেবের প্রভাব পড়েছে। কেবল মধ্যযুগ নয়, আধুনিককালেও মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জয়দেবকে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন-

'গীতগোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'-এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত। ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল।...সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের গুরুত্ব-

- গীতগোবিন্দের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে।
- নতুন ছন্দচেতনা এনে জয়দেব বাংলা কাব্যে প্রাকৃত ছন্দ স্পন্দন সঞ্চারে প্রেরণা জুগিয়েছেন।
- গীতগোবিন্দের নাটগীতি পালা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনুসৃত হয়েছে।
- অলৌকিক দেবকাহিনির মধ্যে রোমান্টিক মানবিক প্রণয়রাগ সঞ্চারিত করেছেন যার ফলে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, নাথ সাহিত্য এবং সাধারণ ভাবে রাজসভার সাহিত্যে মানবিকতা প্রকাশের পথ সুগম হয়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের অবদান বিষয়ে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১.৫ যুগবিভাগ ও যুগলক্ষণ

বাংলা ভাষায় বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিরা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। মৌর্য-গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মার্ত সংস্কারে ব্রাত্য বাঙালির যে দীক্ষা হয়েছিল, সেন যুগে তার পল্লবিত বিকাশ ঘটে। অবশ্য বৌদ্ধ-পাল যুগে সদ্যোজাত বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। অজস্র লিপি-লেখন, স্মৃতিশাস্ত্রের নকল, ন্যায়শাস্ত্রাদির টীকাটিপ্পনী, গৌড়ীয় রীতির উল্লেখ ইত্যাদি থেকে মনে হয় সেইসময় বাঙালিরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা করত। সেন যুগে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সেরা প্রমাণ জয়দেব। এছাড়া বাঙালির কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে ধোয়ীর 'পবনদূত' ও গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'-র মধ্যে। প্রসঙ্গত বাঙালির দুটি সংকলন গ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য-

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ('সুভাষিত রত্নকোষ') এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ('সূক্তিকর্ণামৃত')। এইসব সংকলন গ্রন্থের বিভিন্ন প্রকীর্ণ কবিতাগুলি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম বলে অনুমান করা হয়। দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির নানা পরিবর্তন ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটেছে। নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ও ঘটেছে এই সময়ে, সেসব দিকে লক্ষ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

- আদি যুগ (৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)।
- মধ্য যুগ ১৩৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ, মতান্তরে (১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ), (ভারতচন্দ্রের মৃত্যু)। মধ্যযুগকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়- (আদিমধ্য এবং অন্ত্যমধ্য।) অন্যদিকে আবার প্রাক্-চৈতন্যযুগ, চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগ হিসেবেও মধ্যযুগকে ভাগ করা যায়।
- আধুনিক যুগ (১৮০১ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)।

বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকগণ আবার বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগকে আলাদা চোখে দেখেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো সন-তারিখের কালসীমায় সাহিত্য-ইতিহাসের যুগবিভাগ সম্ভব নয়। যুগের প্রভাবে জাতির অন্তর্জীবনে পরিবর্তনের ইতিহাসকে অনুসরণ করে সাহিত্যের যে রূপবদল এবং বিবর্তনের যে দিকচিহ্ন, তা হল সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগের অন্যতম শর্ত।

১.৫.১ আদিযুগ

'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক নিদর্শন। এছাড়া 'শূন্যপুরাণ', 'ময়নামতীর গান', 'ডাক ও খনার বচন', 'রূপকথা' প্রভৃতি লোকগাথাগুলিতে আদি নিদর্শনের ইঙ্গিত থাকলেও গবেষকেরা রচনাগুলিকে চর্যাপদের সময়কার রচনা নয় বলে সিদ্ধান্তে আসেন। তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় আদি যুগের ব্যাপ্তিকাল। এই যুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বীদের সহজ সাধনের কথা রূপকের মাধ্যমে 'সন্ধ্যা ভাষায়' ব্যক্ত হয়েছে। তৎকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনের ছবি এ যুগের সাহিত্যে সহজলভ্য।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সময়কে 'হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন। যার সময়সীমা ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাষ্ট্র শাসনের দিক থেকে সময়টা বাংলায় পালবংশের রাজত্বের সময়। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাল বলেই দীনেশচন্দ্র সেন সময়টিকে 'হিন্দু' ও 'বৌদ্ধ' যুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যে কারণগুলির কথা তিনি বলেছেন, সেগুলি হল—

- 'বঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউ-এন্-সাঙ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বর্তী প্রদেশসমূহে ১১৫০০ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সংখ্যক পুরোহিতের অন্তত এক কোটি শিষ্য থাকিবার কথা। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।'

- 'পালরাজাগণের সময়েও বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী দন্তপুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। উহা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধধর্মের বিলয়োন্মুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।'
- 'অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে।'
- 'রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদও বৌদ্ধধর্মেরই কথা। পরবর্তী কতকগুলি ধর্মমঙ্গলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথ-মহন্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাদের ধর্ম বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন।'
- 'হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ, এই জন্যই সেই সকল ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়।'
- 'শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্মূল করিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাবের অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে আরও পাওয়া যায়।'
- 'বৌদ্ধ প্রভাবের আধিক্য নিবন্ধনই এই দেশ এবং এই দেশের ভাষা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপেক্ষণীয় ছিল।'

পাল-সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় পুষ্ট ছিল হিন্দু এবং বৌদ্ধরা। সেখানে ধর্মের মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না। হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম নির্ভর সাহিত্য বা ধর্ম-বিভিন্নতা কোনো বিরোধকে অপরিহার্য করে তোলেনি। তাই দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের আদি যুগকে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ নামে অভিহিত করেছেন। অনেক সমালোচক অবশ্য এ বিষয়ে একমত নন।

১.৫.২ মধ্যযুগ

তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলত অনুমান করা হয়, এই দুটি শতাব্দীতে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগকে 'বন্ধ্যা যুগ', 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ', 'মাৎস্যন্যায়'-এর যুগ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই প্রকৃত মধ্যযুগের সূচনা এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতে মধ্যযুগের অবসান। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের চারটি ধারা—

- গীতি সাহিত্যের ধারা,
- মঙ্গলকাব্যের ধারা,
- জীবনী সাহিত্যের ধারা ও
- অনুবাদ সাহিত্যের ধারা।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্য যুগের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাই সেদিক থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

- চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ।
- চৈতনা সমসাময়িক যুগ।
- চৈতন্য পরবর্তী যুগ।

গোপাল হালদার তাঁর বইটিতে মধ্যযুগের এই সাহিত্যধারাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

- প্রথম পর্ব: যুগসন্ধিকাল (১২০০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)
- দ্বিতীয় পর্ব: প্রাক্‌চৈতন্য যুগ (১৩৫০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)
- তৃতীয় পর্ব: চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ)
- চতুর্থ পর্ব: নবাবী আমল (১৭০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) ('বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা')

এই যুগের সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মনির্ভরতা ও ভক্তিবাদ। তুর্কী আক্রমণের প্রভাবে বাঙালির ভক্তিবিশ্বাস অর্থাৎ দৈবনির্ভরতা ক্রমশ অনেকটাই বেড়ে যায়। আবার চৈতন্যের আবির্ভাবে মানবিকতার কিছুটা প্রসার ঘটে। কিন্তু মধ্যযুগের শেষদিকে নাগরিক ছলাকলা, অবিশ্বাস ও সংশয়ের মনোভাব প্রকাশিত হতে থাকে। এসবের পরিচয় পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'শাক্ত' সাহিত্যে।

১.৫.৩ আধুনিক যুগ

মোটামুটি পলাশির যুদ্ধ ও ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সমসাময়িক কাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের সমাপ্তি বলে ধরা হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা। ইংরেজ মিশনারিদের আগমন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের এই যুগের সূচনা। মুদ্রণ যন্ত্রের আগমন, বাংলা লিপির সংস্কার, গদ্যের বিকাশ ও ব্যাপ্তি, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যাপক প্রচলন আধুনিক যুগের যুগ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে মধ্যযুগের পুথিসর্বস্ব। বাংলা সাহিত্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করে আধুনিক যুগে-মুদ্রণযন্ত্রের প্রসারের ফলে। বাংলা গদ্য রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাতে লালিত ও পুষ্ট হয়ে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র প্রমুখের প্রতিভায় কথাসাহিত্যের নানা বিভাগে যুগোত্তীর্ণ অমরতা লাভ করে। আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকবিতায় রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন এবং আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনা বিশ্বের দরবারে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তারকে প্রকাশিত করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বাংলা সাহিত্যে যুগবিভাগ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা ভাষার সৃষ্টির পূর্বে বাঙালির সাহিত্যকর্ম বাঙালির উন্নত শিল্প-সংস্কৃতি চেতনাকে প্রকাশ করে। আসলে যেকোনো ভালো কাজ আত্মপ্রকাশের পূর্বে একটি প্রস্তুতি দরকার। প্রাক্

চর্যাপদ পর্বের সাহিত্য সৃষ্টি এই প্রস্তুতি পর্বকেই আত্মপ্রকাশে উন্মুখ করে। তাই এই সমস্ত সাহিত্যে বাংলা সমাজ-সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাই কেবল বঙ্গ বংশোদ্ভুত কবি সাহিত্যিক নয়, সেই সকল সাহিত্য দেহে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির স্পষ্ট উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যের পূর্ব পরিচয়ের দাবি জানায়।



১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আমরা-

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত হলাম।
- বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে জানলাম।
- প্রাক্ চর্যা যুগে বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা পেলাম।
- বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের অবদান সম্পর্কে জানলাম।



- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও যুগলক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পেলাম।

১.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড° দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড° অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বাংলা ভাষায় সাহিত্য..... প্রস্তর তাম্রপত্র..... একাদশ দ্বাদশ শতকের পূর্বে..... এভাবে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে উত্তরটি লিখুন।

২। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বাঙালি কবি 'জয়দেব' ..... 'গীতগোবিন্দ' ছাড়া জয়দেব রচিত..... এভাবে সাজিয়ে উত্তরটি তৈরি করুন।

৩। বাংলা ভাষায় সাহিত্য..... বাংলা সাহিত্যের..... মোটামুটি পলাশির যুদ্ধ..... এভাবে



সাজিয়ে লিখুন।

১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

২। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের অবদান কতখানি, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও যুগলক্ষণ সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৫। টীকা লিখুন — 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'গাথাসপ্তসতী', 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'।

.....

অধ্যায় ২ : চর্যাপদ

বিন্যাস ক্রম

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
২.২ পরিচিতি
২.৩ চর্যাপদের আবিষ্কার
২.৪ চর্যাপদের পুথি পরিচয়
২.৫ চর্যাপদের নামকরণ
২.৬ চর্যাপদে প্রতিফলিত সমাজজীবন
২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
২.৯ অতিরিক্ত পঠন
২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন—

- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুথির গঠন আকৃতি চর্যাপদের বিভিন্ন নামকরণ সম্পর্কে ওহাকিবহাল হতে পারবেন।
- বাঙালির জীবন চিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- চর্যার সমকালীন সমাজের চালচিত্র সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

২.২ পরিচিতি

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন হল এই চর্যাগীতিগুলি। চর্যাপদের ভাষাকে ভিত্তি করে সুনীতিকুমার মনে করেন দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (৯৫০-১২০০) এই প্রাচীন বাংলার স্থিতিকাল। চর্যার আদি কবি লুইপাদকে মনে করা হয়। চর্যা কথাটির একাধিক অর্থ রয়েছে। তবে চর্যা শব্দটির সাধারণ অর্থ 'আচরণ'। তা অবশ্যই যোগসাধনপদ্ধতি সম্পর্কিত আচরণকে বুঝিয়ে থাকে। তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় চর্যায় দু'টি দিকের প্রাধান্য পায়— (ক) দার্শনিক তত্ত্বের দিক (খ) সাধনতত্ত্বের দিক। চর্যা আসলে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনসংগীত।

২.৩ চর্যাপদের আবিষ্কার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন আবিষ্কার করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে; নেপাল থেকে। যা সমগ্র বিশ্বে সারা ফেলেছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নষ্ট

দলিল উদ্ধার করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২- ১৮৯১) মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব পান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। এর আগে ১৮৮৬ সালে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেওয়ার সময়ে প্রচুর বাংলা গ্রন্থ দেখে বাংলা পুথি সংগ্রহে আগ্রহী হন। সোসাইটির দায়িত্ব পেয়ে ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে দু'বার নেপালে যান শাস্ত্রী মহাশয়। প্রথমে নেপাল ও তিব্বতে সংরক্ষিত বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রের পুথির প্রতি বিদেশি, বিশেষত ইংরেজ গবেষকরাই আগ্রহী ছিলেন। ১৮৪৪ সাল থেকেই এই তৎপরতা নিয়মিত লক্ষ্য করা গেছে। বহু গবেষক এ উপলক্ষে নেপালে বহুবার গিয়েছেন, বহু পুথিও সংগ্রহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে Cecil Bendall-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। বাঙালি গবেষকদের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য প্রেমী রাজেন্দ্রলাল মিত্রও পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি নেপালে গিয়ে সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহ করেন অনেকগুলি। ১৮৮২ সালে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal নামে একটি পুথি তালিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে সরকারি দায়িত্ব পেয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলালের তালিকা ও আরো কয়েকটি নতুন আবিষ্কৃত পুথি অবলম্বনে গভীর পর্যালোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যে সমস্ত পুথিগুলি ছড়িয়ে আছে সেগুলি সংগ্রহ ও একত্রিত করতে পারলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের মূল্যবান ও অপরিহার্য উপকরণ পাওয়া যাবে। প্রথম দু'বার নেপাল গিয়ে কয়েকটি সংস্কৃত পুথি পেলেও ১৯০৭ সালে তৃতীয় বার নেপাল গিয়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পুথি আবিষ্কার করেন। এগুলি হল: (ক) 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', (খ) সরোরুহ বজ্রের অথবা 'সরোজ বজ্রের দোহাকোষ' এবং অন্বয় বজ্রের সংস্কৃত টীকা, (গ) 'কৃষ্ণাচার্য্যপাদের দোহাকোষ' এবং আচার্যপাদের সংস্কৃত টীকা ('মেখলা'), (ঘ) 'ডাকার্ণব'। প্রথম তিনটি পুথিকে শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এবং ডাকার্ণবকেও একই গোত্রে ফেলে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ সালে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। চর্যাপদের আবিষ্কার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লিপিবদ্ধ করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

২.৪ চর্যাপদের পুথি পরিচয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে চর্যাগীতিসংগ্রহের পুথিটিকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে উল্লেখ করেছেন। পুথিটি নেপালের রাজদরবার থেকে পাওয়া গেছে। পুথিটি ছাপা হওয়ার পর সেটি দরবারের গ্রন্থাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নেপালের 'রাষ্ট্রীয় অভিলেখালয়ে' (প্রাচীন দরবার গ্রন্থাগার) সংরক্ষিত পুথিটির প্রথম পাতার পুথির পরিচয় হিসেবে নাগরী হরফে 'চর্যাচর্য্যটীকা' শব্দটি লেখা আছে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশের আগেই 'A

catalogue of palmleaf and selected paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal' (Vol. II) গ্রন্থের তালিকায় পুথিটির নাম হিসেবে শাস্ত্রী মহাশয় দু'জায়গায় 'চর্যাচর্য্যটীকা' কথাটির উল্লেখ করেছেন (পৃঃ XI ও 94)। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে বোঝা যাচ্ছে পুথিতে লিখিত শিরোনামটি শাস্ত্রীর অজ্ঞাত ছিল না, তবু তিনি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় সেটি উল্লেখ করেননি। এর কারণ অজ্ঞাত। (সূত্র— ড. নির্মল দাশ ও ড. সত্যব্রত দে। যথাক্রমে 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' ও 'চর্যাগীতি পরিচয়' গ্রন্থ) চর্যাগীতির পুথিটি তালপাতায় লেখা। লিপিতাত্ত্বিকরা বলেছেন, এটি প্রত্ন বাংলা অক্ষরে রচিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর গ্রন্থে পুথির পৃষ্ঠাঙ্ক এমনভাবে উদ্ধৃত করেছেন যাতে পুথির কোন্ পৃষ্ঠায় কতদূর পর্যন্ত ছিল স্পষ্ট বোঝা যায়। পরবর্তীকালে ড. নীলরতন সেন সমগ্র পুথিটির ফটোমুদ্রণ প্রকাশ করে পুথির প্রকৃতরূপ কেমন ছিল তা দেখিয়েছেন। তালপাতার পুথির প্রতি পাতার মাপ সাধারণ ভাবে ৩৩ সে.মি ৪ সেমি (১২ ইঞ্চি ×১৩ ইঞ্চি)। পুথির দীর্ঘতর পাতাগুলির আকার মোটামুটি ১২ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি। পুথির নামপত্রে মাপ হিসেবে লেখা আছে "লে ১২" চৌ ১ "এছাড়াও ক্যাটালগে বা তালিকায় হরপ্রসাদ মাপ দিয়েছেন '১২×২ inches'

হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলিতে তিনটি সম্পূর্ণ চর্যাগীতি আর এক গীতির শেষাংশ ছিল। তাই পুথিতে পাওয়া গীতির সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথির প্রথম পত্রের সামনের পৃষ্ঠায় বাঁদিকের উপরে লাল কালিতে নাগরী হরফে একটি তারিখ উল্লিখিত হয়েছে: 'সম্বত ৭৪১ ভান যমবাত' অর্থাৎ ভাদ্র ৭৪১ সংবৎ।

পুথির লিপি বাংলা হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন এ-কার, ও-কার, ঐ-কার ইত্যাদির মধ্যে নাগরী ও নেওয়ারী অক্ষর ঢুকে পড়েছে। কাহেরে (এ), চান্দে (এ), জইসো (ও)। আরো দেখা গিয়েছে ই-কারের মাত্রার উপরকার চৈতনটি কখনও বড়ো কখনও ছোট। চৈতনটি ছোট হলে এবং বাঁদিকের দাঁড়িটি অর্ধবৃত্তাকার হলে ই-কার (১) অনেক সময় এ-কারের (৫) মতো মনে হতে পারে। ৪৭ সংখ্যক চর্যায় শেষ পংক্তিতে এইভাবে পাঠভেদ হয়েছে- উঠি/উঠে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। চর্যাপদের পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

২.৫ চর্যাপদের নামকরণ

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩) 'বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশের আগের বছর শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নেপালের রাজদরবারে প্রাপ্ত তালপাতার পুথির তালিকা প্রকাশ করেন। তার দ্বিতীয় খণ্ডের তালিকায় এই পুথির নাম হিসেবে একাধিক জায়গায় 'চর্যাচর্য্যটীকা' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৩২৩) প্রকাশ করে তার মধ্যে একটি পুথির নাম উল্লেখ করেন

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। সাধারণত পুথির পুষ্পিকায় পুথির নাম পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পুথিটি খণ্ডিত, পুষ্পিকার পাতাটি এবং শেষ পাতাটি লুপ্ত থাকায় এ পুথির প্রকৃত নাম কী ছিল- পণ্ডিতসমাজে এ বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। শাস্ত্রী মহাশয় এত নিশ্চিত ভাবে পুথির নামটি প্রকাশ করেছেন যে মনে হতে পারে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পদগুচ্ছটি পুথির মধ্যেই কোথাও সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র পুথিতে কোথাও এই পদগুচ্ছের চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে এই নামটি তিনি কোথায় পেলেন? এ-কি তাঁর স্বকপোলকল্পিত, নাকি এ-নামের কোনো উৎস আছে-এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। পুথির মলাট বা প্রচ্ছদে এই নামটি তিনি লিখিত অবস্থায় দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। পরের বছর গ্রন্থ প্রকাশের সময় পুথির নাম হিসেবে 'চর্যাচর্য্যটীকা' নামটি বাদ দিলেন কেন? তার পরিবর্তে তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে সরাসরি লিখলেন: ১৯০৭ সালে নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।' শাস্ত্রী মহাশয় এর কোনো ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে দেননি। ফলে ধরে নেওয়া যায় 'চর্যাচর্য্যটীকা' এই নামটি তাঁর কাছে হয়তো প্রামাণিক মনে হয়নি বা অনেক অর্বাচীন কালের নামকরণ মনে হয়েছিল। এর কারণও অনুমান করেছেন ড. নির্মল দাশ: 'মলাটে লেখা পুথিনামের নাগরী হরফই এই নামের প্রামাণিকতা সম্পর্কে তাঁকে সন্দিহান ক'রে তুলেছিল। এই সন্দেহের কারণ, মলাটের পর গোটা পুথিটিই 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি রেখেছিলেন এবং এই নামকরণ জনপ্রিয় এবং যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থের নামকরণের প্রচলিত রীতি এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। এই নামকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'যে গ্রন্থ আচরণীয় ও অনাচরণীয় তত্ত্বসমূহকে বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া দেয়- তাহাই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপালের রাজদরবারে রক্ষিত পুথিতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি আছে বলে উল্লেখ করেছেন: "Shastriji published the text under the caption Carya-Caryaviniscaya. That was the title found on the Nepalease Manuscript." প্রথম দিকে ড. বাগচী এই নামটিতে সন্দেহ পোষণ করলেও পরবর্তীকালে 'চর্যাগীতিকোষ' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। ড. সত্যব্রত দে'ও তাঁর গ্রন্থে এই নামটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'Is it Caryascaryaviniscaya or Ascaryacaryacaya' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে পুথির মধ্যে পুথির নাম দেওয়া আছে। পুথির পুষ্পিকা পাওয়া না গেলেও পুথির শুরুতে কখনও কখনও প্রসঙ্গক্রমে পুথির নাম দেওয়া থাকে। এটাও এ ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রচলিত রীতি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই সূত্র ধরে পুথির প্রারম্ভিক শ্লোকের বাক্যাংশটির দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: 'শ্রী লুয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেহ প্যাশচর্য্যাচর্য্যচয়েসম্বাবগমায় নির্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটং' ইত্যাদি বাক্যাংশের অন্তর্গত 'আশচর্য্যচর্যাচয়' পদগুচ্ছটিকে বিধুশেখর শাস্ত্রী পুথির প্রকৃত নাম বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে এই নামটিই সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত। আবার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের ধারণা হয়েছিল পুথির প্রকৃত নাম ছিল 'চর্যাশচর্য্য-বিনিশ্চয়'। এটিই পুথির শুদ্ধ নাম; শাস্ত্রী মহাশয় সন্দেহাতীত না হয়, তবে পুথিটির প্রকৃত নাম কী ছিল জানার উপায় কি? এ-বিষয়ে গবেষকরা একটি ভিন্নতর উৎসের সাহায্য নিয়েছেন। এটি মুনিদত্তের

গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্যসূত্রের সাহায্যে গবেষক P. Cordier যে 'তেঙ্গুর গ্রন্থতালিকা' প্রস্তুত করেছিলেন সেই তালিকা থেকে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই তিব্বতী অনুবাদ উদ্ধার তথা আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এটি সংস্কৃত অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই তিব্বতী অনুবাদের পুথির পুষ্পিকায় চর্যাপুথির নাম, টীকাকার ও অনুবাদকের নাম সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। এই তথ্যপঞ্জিতে জানা যাচ্ছে 'বুধগণ' নামে একজন সংকলক একশ' চর্যার একটি কোষ সংকলন করেছিলেন। শিষ্যদের শেখাবার জন্য আচার্য মুনিদত্ত এই কোষ থেকে পঞ্চাশটি চর্যা নির্বাচন ক'রে টীকা রচনা করেন। এই টীকাগ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পুথিটি আবিষ্কার করেন সেটি এই টীকারই পুথি। মুনিদত্তের টীকাটির নাম 'নির্মলগিরা'। তবে টীকার সঙ্গে মূল গানগুলির পাঠ আছে। লিপিকর বা সম্পাদক পৃথক পৃথক পুথি থেকে গান ও টীকা একত্রে সন্নিবেশিত করে টীকা যুক্ত পাঠ প্রস্তুত করেন। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল গীতি ও টীকার পাঠে সামান্য হেরফের লক্ষ করা যায়। পুথিটি মূল সমেত টীকারই পুথি। এই পুথিটিই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র নেপালের স্বয়ম্ভু নগরে। তিব্বতীতে অনুদিত প্রত্ন-বাংলা পুথিটির নাম নিশ্চয়ই অপরিবর্তিত ছিল। ফলে গীতিসংগ্রহের নাম 'চর্যাগীতিকোষ' হতে পারে কিন্তু তিব্বতী ভাষায় অনুদিত পুথিটি গানসহ আচার্য মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা। ফলে বলা যেতে পারে, এর প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। চর্যাপদের নামকরণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২.৬ চর্যাপদে প্রতিফলিত সমাজজীবন

চর্যাগীতির মূল বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্বদর্শন জীবন বিমুখ এবং সুখ-দুখের আশা-নিরাশায় ভরা এই সংসার ও রক্তমাংসের বাস্তবজীবন দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো সত্য বলে মনে হলেও আসলে সত্য নয়। এটাই চর্যাকবিদের বিশ্বাস এবং চর্যাগীতিতে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। ইহলোক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সিদ্ধাচার্থদের রচনায় সমসাময়িক সমাজজীবনের বিস্তৃত রূপ রসের পরিচয় পাওয়া যাবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তত্ত্বের দিক থেকে যে জীবন রূপকে বা রূপময় জগৎকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন, সেই ধর্মতত্ত্ব বা গূঢ়তর সাধন প্রক্রিয়ার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরাই জীবনরূপ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। তাই সরাসরি জীবনকে অস্বীকার করেও তাঁরা পরোক্ষে জীবনরসকেই অবলম্বন করেছেন, ফিরে এসেছেন যেন জীবনেরই মাঝখানে। তাই চর্যাগীতিতে বস্তুত সমাজ ও জীবনের পরোক্ষ, খণ্ডিত ও ইঙ্গিতময় রূপ পাওয়া যায়।

চর্যাগীতি বাঙালি বা বাংলাদেশের সহজিয়া সাধকদের সাধন সংগীত, তাই বাংলার ভূ-প্রকৃতি তাঁদের গানে উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সর্বাধিক। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী-

খাল-বিল সমুদ্রের কথা যেমন আছে, তেমনি অনুচ্চ পর্বত বা টিলা, জঙ্গল, অরণ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গত এসেছে চর্যাগীতিতে। ভূ-প্রকৃতির দিক দিয়ে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। নদী ও সমুদ্রের রূপক ভারতীয় সাহিত্যে নতুন নয়, কিন্তু নদী-খাল-নৌচালনা, দাঁড়, পাল, কাছি ইত্যাদি এবং সাঁকো বানানোর কথা যেভাবে চর্যাকাররা বর্ণনা করেছেন, তা অভিনব। চাটিলপাদ বলেন: ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী। (চর্যা/২) ভুসুকুপাদ বলেছেন, বজ্র নৌবহরের পদ্মা খালে পাড়ি দেওয়ার কথা এবং দস্যুদ্বারা সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার প্রসঙ্গ। এমন কি এতে ভুসুকুকে বাঙালি হতে হয়েছে চণ্ডালীকে নিজের গৃহিণী করার জন্য বা চণ্ডালের দ্বারা নিজ গৃহিণী অপহৃত হওয়ায়। (চর্যা/৪৯) নৌকার বিভিন্ন অংশের ও অনুষঙ্গের বর্ণনাও বাংলার নব্য ভূ-প্রকৃতির ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, চর্যায় রথ, হস্তী ইত্যাদি স্থলযানের বর্ণনা থাকলেও জলযান হিসেবে নৌকার গুরুত্ব বেশি ছিল। পর্বত ও অরণ্যের কথাও চর্যাগীতিতে এসেছে। উঁচু উঁচু পাহাড়, টিলা, পাহাড়ের গুহা, মালভূমি এবং বনভূমি অনেকটা অংশ জুড়ে আছে চর্যাগীতির। এর থেকে বাংলাদেশের পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল বোঝা যায়। শবরপাদের গানে এই ছবিগুলি লক্ষণীয়।

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
....
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।।" (চর্যা/২৮)

এছাড়াও ঢেণ্ঢণপাদের গানে আছে 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির প্রসারে সামাজিক স্তর বিভাগ অনুযায়ী বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত বা উচ্চকোটির এবং বেদ বহির্ভূত আচার আচরণে অভ্যস্ত মানুষ ছিল অনভিজাত বা নিম্নকোটির। তারা সমাজে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য ছিল। দুটি চর্যায় এই অন্ত্যজদের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক) 'উঁচা উঁচা পাবত এঁহি বসই সবরী বালী।' (চর্যা/২৮)

(খ) 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।' (চর্যা/৩৩)

উচ্চবর্ণের মানুষদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ একেবারেই ছিল না এমন নয়, তাদের মনোহরণ বা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করত ডোম্বী বা ডোম রমণীরা। এতে উচ্চশ্রেণির মানুষও অনাগ্রহী ছিল না। শুধু সমাজ শাসনে তাদের অনেক সময় নিবৃত্ত হতে হত। অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য মানহারা এইসব মানুষ বা সমাজ শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। তাদের যে সমস্ত জীবিকার উল্লেখ পাওয়া যায় চর্যাগীতিতে সেগুলি হল: তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি প্রস্তুত করা 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেড়া'। (চর্যা/১০)। নৌকা বাওয়া বা পাটনী বৃত্তি, বাহ তু কামলি সশুরু পুচ্ছী। (চর্যা/৮), নৌবাহী নৌকা টানত গুণে। (চর্যা/৩৮) ডোমদের প্রধান বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, চাঙাড়ি তৈরি করা। এসব বিক্রি করে খুব সামান্যই উপার্জন হত। পাটনীর কাজেও অর্থ বিশেষ পাওয়া যেত না। পারাপারের বিনিময়ে পারগামীর কাছে সামান্য কড়ি বা বুড়ি পেত। এই সামান্য পারিশ্রমিকটুকু উপার্জন করতে তাদের বেগ পেতে হত। অনেক পারার্থীই সামান্য এই কড়িও পারানি হিসেবে দিতে অস্বীকার করত বা অনিচ্ছা প্রকাশ করত। তখন পাটনীকে জোর খাটাতে

হতো পারিশ্রমিক উদ্ধারের জন্য। ডোমপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ পায়ে নুপুর ও কানে কুন্তল গলায় হাড়ের মালা পড়ে কাপালিক বেশে নগরে ঘুরে বেড়াত কিছু উপার্জনের আশায়। নটবৃত্তিও নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে দেখা যেত- এক সো পদমা চৌসট্ঠী পাড়ী। তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।...খুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী। তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।। (চর্যা/১০) শিকার করা: কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহঁ কীস। বেঢ়িল হাক পড় চৌদীস। অপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী। খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী।। গাছ কেটে সাঁকো বানানো কাঠের কাজ, ইত্যাদি সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জীবিকার জন্য কায়িক শ্রম করতে হত না। তারা রাজার শাসনপড়া বা তাম্রশাসনের দ্বারা প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করতেন। তাদের ঘরে রাজার অনুগ্রহে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। এমনকি তাদের কারো কারো ঘরে 'চতুস্কোটি' সম্পদ ও সোনারূপার ভাণ্ডারও থাকত। ভুসুকুপাদের একটি গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে চৌর্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তিও কিছু লোকের জীবিকা ছিল সেযুগে। তারা শ্রমজীবীদের মতো কায়িক শ্রম করত না বা রাজানুগ্রহে স্বচ্ছল জীবনও যাপন করত না। তারা তির্যকভাবে জীবিকা অর্জন করতো। এই বক্রপথের কথা আছে বেশ কিছু চর্যায়। যেমন 'কানেট চৌরি নিল অধরাতী।'

তবে এই অন্ধকার পথের জীবিকা খুব সহজ, সুখের বা বাধা বন্ধনহীন ছিল না। দস্যু ও চোরের উপদ্রব থেকে বাঁচতে প্রহরী নিয়োগ করা হত 'সুণ বাহ তথতা পহারী' (চর্যা/৩৬)। সম্পদ রক্ষার জন্য তালা চাবির ব্যবস্থাও ছিল-সাসু ঘরে ঘালি কোঞা তাল (চর্যা/৪)। চোর ধরার জন্য কো চর্যাগীতিতে বাঙালির যে দৈনন্দিন জীবনচর্যার পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলত সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের দিনলিপি। দুঃখ, অশান্তি, অসঙ্গতি ও দৈন্য তাদের নিত্যসঙ্গী। পারিবারিক বিন্যাসের যে ছবি পাওয়া যায় তা যৌথপরিবার। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী স্ত্রী-পুত্রবধূ এই সবাইকে নিয়ে ছিল পরিবার। বেশ কিছু চর্যায় এই যৌথ পারিবারিক সংগঠনের উল্লেখ আছে: সাসু ঘরে ঘালি কোঞা তাল।

পরিবারে কিছু শৃঙ্খলা ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না। কাহ্ন ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হলে তাঁকে পরিবারভুক্ত শাশুড়ী-ননদ-শালী ইত্যাদি পরিজনকে হত্যা করে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে হয়েছিল। পুত্রবধূ পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাকে পরিবারের কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হত এবং রাত্রিবেলা প্রেমিকের সঙ্গে অভিসার কালে শ্বশুরের নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। শাশুড়ীর ঘরে তালাচাবি দিয়েও নানা অসামাজিক কাজ করার প্রসঙ্গ আছে ৪ সংখ্যক চর্যায়। অন্নাভাব ও সামাজিক অসঙ্গতির প্রসঙ্গ আছে দুটি চর্যায়। প্রাচীন এক বাঙালি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর দারিদ্র্য কাহিনি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে: টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী, হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।। (ঢেণ্ঢণপাদ/চর্যা-৩৩ সমাজ-সংসার থেকে দূরে টিলায় তার ঘর, প্রতিবেশীহীন অবস্থায় থাকতে হয় একাকি বা একঘরে হয়ে। অথচ বেদনার বিষয় এই যে হাড়িতে ভাত চাপে না, কিন্তু অতিথির বিরাম নেই। নিত্য কেউ না কেউ এসে হাজির হয়। পারিবারিক জীবনে গোপালন ও দুধ দোহার প্রসঙ্গ আছে চর্যায়। লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষের জন্য বলদের ব্যবহার ছিল। এমন কি 'দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো এই প্রবাদটি সে যুগেও প্রচলিত ছিল- 'সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালা কি মো

বলন্দেং' (চর্যা/৩৯)। ধনী ব্যক্তিরা হস্তী, ঘোড়া, রথ ব্যবহার করতেন যানবাহন হিসেবে। নিম্নবর্ণের মানুষরা রথারোহী ব্যক্তিদের তির্যক দৃষ্টিতে দেখত: 'জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলে কুল বুড়ই'। (চর্যা/১৪) শবর-শবরীর সুখী দাম্পত্য জীবনে কখনও মধুরতর বৈচিত্র্য আসে। শবরী ময়ূর গালকের মেখলা পরে, গলায় দেয় গুঞ্জামালা। পান খেয়ে নিবিড় মিলনে শবর দম্পতি রজনী পোহাল। এতে গূঢ়তত্ত্ব থাকলেও সেকালের শবর যুবক-যুবতীদের মধুর দাম্পত্যের ছবিটি এখানে চিত্র রূপময় হয়ে উঠেছে।

বেশ কিছু চর্যাগীতিতে বাঙালির অবসর বিনোদনের প্রসঙ্গও আছে। এর মধ্যে আছে সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠানও। এই বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে 'নঅবল' বা দাবাখেলার কথা আছে যেমন, তেমনি এই খেলার রীতিপদ্ধতিরও বর্ণনা আছে কাহ্নপাদের একটি পদে: করুণা পিহাড়ি খেলই নঅবল। সদগুরু বোর্হে জিতেল ভববল।।

মদ এটি তাদের কাছে সামাজিক ব্যসনের অঙ্গ ছিল। এই মদ্যপানের বহুল ব্যবহারের জন্য মদ্য প্রস্তুত, শুঁড়িখানার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় চর্যার গানে। মদ চোয়ানোর পদ্ধতি, মদের অঢেল পসরা সাজানো পানশালা, শুন্তি রমণী এবং শুঁড়িখানার বিশেষ ছবি পাওয়া যায় বিরুআপাদের রচনায়।

সামাজিক আনন্দ-উৎসব উপলক্ষ্যে নাচগানের প্রচলন ছিল সেকালে। চর্যায় নৃত্যগীত নানা রাগরাগিনী ও বাদ্যযন্ত্রের বারবার উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে। চর্যাগীতিগুলিও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে গাওয়া হত বলে জানা যায়। বীণাপাদ রচিত একটি পদে 'হেরুব্বীণা' বা 'হেরুঅবীণা' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। সাধারণত 'দেবী' বা নারী নৃত্যে অংশ নিতেন এবং বাজিল (বজ্রদেব) বা পুরুষ গান গাইতেন নাটকে। এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটেছে- দেবী গাইছেন আর বজ্রধর নাচছেন। ফলে 'বুদ্ধনাটক' বিপর্যস্ত হয়ে গেল। আনন্দানুষ্ঠানে নাটগীতির পালা অভিনীত হত বোঝা যাচ্ছে। সেই পালায় নারী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতেন। কিছু কিছু মানুষ নটবৃত্তির দ্বারা একদিকে যেমন জীবিকা অর্জন করত, তেমনি নটপেটিকা থেকে নানা উপকরণের সাহায্যে নানা রকম বেশ ধারণ করে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিত। বিভিন্ন রকম সাজসজ্জার দ্বারা নিম্নবর্গীয় নারীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টাও করত তারা। কাহ্নপাদের একটি গানে আছে: তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গেড়া। তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।। তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী। তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।। (চর্যা/১০)

সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না চর্যাগীতিতে। তবে সুখ-দুঃখ-বিপর্যয়ের সময়ে নারীরাও পুরুষের সহযোগিনী ও সমদুঃখভাগী ছিল বলে মনে হয়। নারীরাও সাধন প্রক্রিয়ায় অংশ নিত, পুরুষ যোগীর সাধন-সঙ্গিনী বা যোগিনী হিসেবে কায়সাধনায় বা তন্ত্রসাধনায় অংশগ্রহণ করত তা বিভিন্ন চর্যায় উল্লিখিত হয়েছে। (চর্যা/৫০) ২০ সংখ্যক চর্যায় এক 'নিরাসী' অসহায় নারীর কথা আছে। তার স্বামী উদাসীন কাপালিক। প্রসববেদনায় সে কাতর হয়ে আঁতুড ঘর যায়। মা'কে তার বেদনার কথা বলে। যাকে সে প্রসব করে তাকেও সে হারায় নাড়িকাটতে গিয়ে। পতি নিরুদ্দেশ, মৃতবৎসা নারীর কান্না শোনা যায় এই চর্যায়। কিছু চর্যায় বাঙালির ব্যবহৃত প্রাত্যহিক জীবনযাপনের কিছু উপকরণের উল্লেখ আছে।

তৈজসপত্রের মধ্যে উল্লেখ্য: হাড়ি, পিঠা, ঘড়া, ঘড়ুলি (গাড়ু)। অলঙ্কার-কানেট (কর্ণভূষণ), ঘণ্টানেউর (নূপুর), কাঙ্কান (কঙ্কন), মুত্তিহার (মুক্তাহার), কুণ্ডল (দুল)। অদশ বা আয়না/আরশির উল্লেখ আছে একটি চর্যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পড়হ (পটহ), মাদল, করণ্ড (ঢোল), কসাল (কাঁসি), ডমরু, বীণা, বাঁশি, হেরুকবীণা ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসও ছিল। পরিশেষে বলা যায় অবশ্যই সমাজ জীবনের দলিল হয়ে থাকবে এই চর্যাপদগুলি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। চর্যাপদে প্রতিফলিত সমাজ জীবন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন চর্যাপদের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পুথির আকার প্রকৃতি জানা যায়। চর্যাপদে প্রতিফলিত সমাজ জীবনে উঠে এসেছে সমকালীন সমাজে যান বাহন, খাদ্য, নারীদের জীবন যাত্রা, বিনোদন, বিভিন্ন পেশা থাকা মানুষজন, প্রকৃতির বর্ণনাও পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়, পর্বত, নদী, এগুলির কথাও বাদ পড়েনি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উপকরণও উঠে এসেছে বিভিন্ন চর্যাপদে।



২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- চর্যাপদ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ বিষয়ে অবগত হতে পারা গেল।
- চর্যাপদে বর্ণিত পুথির ধারণা থেকে সহজেই পাঠকেরা জানতে পারেন অতীতে তালপাতার ব্যবহার ছিল।
- চর্যাপদের পদগুলি থেকে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার যে ধারণা ফুটে উঠেছে সেই সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম।
- চর্যাপদের পদগুলি থেকে বাঙালির জীবন চিত্রের ছবি জানা সম্ভব হল।



২.৯ অতিরিক্ত পঠন

১। দাশ নির্মলকুমার (১৯৯৭); চর্যাগীতি পরিক্রমা, কলকাতা, দে'জ

২। দে, সত্যব্রত (১৯৬০); চর্যাগীতি পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (সম্পা) (১৯৮৯); নবচর্যাপদ, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৪। মুখোপাধ্যায়, তারাপদ (১৯৬৮) : চর্যাগীত, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৫। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ : (১৩২৩); 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

৬। সেন, নীলরতন (২০১০) : চর্যাগীতিকোষ, কলকাতা : সাহিত্যলোক

৭। সেন, সুকুমার (১৯৬৬); চর্যাগীতি পদাবলী, কলকাতা : পরিমার্জিত সংস্করণ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স

৮। সেন, সুকুমার (১৯৯৭); বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স

২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হারিয়ে যাওয়া আদি নিদর্শন আবিষ্কার করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। ...'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' যেহেতু ১০০ পদে সম্পূর্ণ ছিল, তার থেকে ৫০টি চর্যা বেছে মুনিদত্ত সংস্কৃতে টীকা লিখে ...এই ভাবে আলোচনাটি প্রস্তুত করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ২.৩ অংশ)

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাগীতিসংগ্রহের পুথিটিকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে উল্লেখ করেছেন, তাঁর 'বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে ..... হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথির প্রথম পত্রের সামনের পৃষ্ঠায় বাঁদিকের উপরে লাল..... এই ভাবে বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করে উত্তরটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। (দ্রষ্টব্য ২.৪ অংশ)

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৩২৩) প্রকাশ করে তার মধ্যে একটি পুথির নাম উল্লেখ করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। সাধারণত পুথির পুষ্পিকায় পুথির নাম পাওয়া যায়। ...তিব্বতীতে অনুদিত প্রত্ন-বাংলা পুথিটির নাম নিশ্চয়ই অপরিবর্তিত ছিল। ...বিভিন্ন সমালোচকের মতামতের উপর ভিত্তি করে চর্যাপদের নামকরণটি নিবার্চন করার প্রয়াস রাখতে হবে। (দ্রষ্টব্য ২.৫ অংশ)

৪। চর্যাগীতির মূল বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্বদর্শন জীবন বিমুখ এবং সুখ-দুখের আশা-নিরাশায় ভরা এই সংসার ও রক্তমাংসের বাস্তবজীবন ...তারা সমাজে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য ছিল... এই ভাবে চর্যায় প্রতিফলিত সমাজ জীবনের প্রতিফলন ধরা পড়বে আলোচ্য প্রশ্ন উত্তরে। (দ্রষ্টব্য ২.৬.০ অংশ)



২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। চর্যার আবিষ্কার সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত কতটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা করুন।

২। চর্যার পুথি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তুলে ধরুন।

৩। চর্যার নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪। চর্যায় প্রতিফলিত সমাজ জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৩ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার সমসময়

বিন্যাস ক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৩.২ পরিচিতি
৩.৩ পুথি আবিষ্কার
৩.৪ পুথি পরিচয়
৩.৫ কবি পরিচয়
৩.৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু
- ৩.৬.১ জন্মখণ্ড
- ৩.৬.২ তাম্বুলখণ্ড
- ৩.৬.৩ দানখণ্ড
- ৩.৬.৪ নৌকাখণ্ড
- ৩.৬.৫ ভারখণ্ড
- ৩.৬.৬ ছত্রখণ্ড
- ৩.৬.৭ বৃন্দাবনখণ্ড
- ৩.৬.৮ কালীয়দমনখণ্ড
- ৩.৬.৯ যমুনাখণ্ড
- ৩.৬.১০ হারখণ্ড
- ৩.৬.১১ বাণখণ্ড
- ৩.৬.১২ বংশীখণ্ড
- ৩.৬.১৩ রাধাবিরহ

৩.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
৩.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৩.১০ অতিরিক্ত পঠন
৩.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা-

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল বিষয়ে বিশদে জানতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হবেন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার ও কাহিনি বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান উপলব্ধি করবেন।

৩.২ পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়-প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ, যাকে প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়। অপর দিকে মধ্যযুগের আদিতম নিদর্শন হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিকে ধরা হয়। ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে যে কাব্যটি চৈতন্য-পূর্ববর্তী এবং এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মধ্যযুগের প্রাচীনতম নিদর্শন তা বিভিন্ন সমালোচক ও গবেষকদের মন্তব্যে প্রমাণিত। আমরা এই পর্বে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুথি আবিষ্কার, পুথিপরিচয়, কবিপরিচয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানব।

৩.৩ পুথি আবিষ্কার

১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের জহুরী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিটি আবিষ্কার করেন। এর প্রায় দু-বছর পর, অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, বসন্তরঞ্জন পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নিয়ে যান। তারও প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁরই সম্পাদনায় কাব্যটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টাব্দের হিসাবে কাব্যটির প্রকাশকাল হিসাবে প্রথম সাড়ির প্রায় বেশিরভাগ পণ্ডিতই ১৯১৬ সালের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বঙ্গাব্দের যে মাসে কাব্যটি প্রকাশিত হয়, ততদিনে ১৯১৬ পেরিয়ে ১৯১৭ সাল শুরু হয়েছে। এই তথ্যটি শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও আধুনিক মনস্তত্ত্ব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রকাশের ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি সভার কার্যবিবরণীর উল্লেখ করেছেন। সেই সভা মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ব্লক প্রস্তুতির জন্য ৫৫ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ব্লক প্রস্তুতিই যদি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে হয়ে থাকে, তাহলে কাব্যের প্রকাশকাল তার আগে হতে পারে না। এই কাব্যের ভূমিকা লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুথি আবিষ্কার বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।। (৮০ শব্দের মধ্যে)

৩.৪ পুথি পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি একটি নাট্য লক্ষণাক্রান্ত আখ্যায়িকামূলক কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। কাব্যের প্রথমে, মাঝের ও শেষের কতকগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাব্যনাম ও কাহিনির সম্পূর্ণতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা থেকে যায়। পুথিটি আগাগোড়া তুলোট কাগজে লেখা। কাব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত দেখে বসন্তরঞ্জন রায়

বিদ্বদ্বল্লভ কাব্যের নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। যদিও কাব্যের মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া যায় সেখানে নাম লেখা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে পুথি পরিচয় সংক্ষেপে লিখুন। (৬০ শব্দের মধ্যে)

৩.৫ কবি পরিচয়

চণ্ডীদাস বঙালির প্রিয়কবি। একথাটির সঙ্গে কোনো চণ্ডীদাসের নাম জড়িয়ে রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত আমরা পদাবলির চণ্ডীদাস বলে একজন বাঙালি কবির পরিচয় পাই। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হলে চণ্ডীদাস নাম নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। এ-কোন চণ্ডীদাস? পদাবলির চণ্ডীদাস আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের চণ্ডীদাস কী একই ব্যক্তি না অন্য কেউ? তাছাড়া বসন্তরঞ্জন প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির মধ্যেই বিভিন্ন ভণিতা পাওয়া যায়- যেমন বড়ুচণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, অনন্ত চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস। এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে চণ্ডীদাস সমস্যা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি।
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করতেন তিনি কোন চণ্ডীদাস? চৈতন্যদেব যদি বড়ুচণ্ডীদাসের আদিরসাত্মক কাব্য পড়ে পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন তাহলে সেটি বৈষ্ণব ভক্তদের কাছেও পরম সমাদরের বস্তু হয়ে উঠত। কিন্তু কাব্যটি সেই মর্যাদায় উন্নীত হয়নি। তাই সাধারণ ভাবেই বলা যায় পদাবলির চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা চণ্ডীদাস পৃথক ব্যক্তি।

কাব্যটিতে কবি তাঁর নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় দেননি। তাছাড়া অনেক পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কবি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যও পাওয়া যায়নি। তাই কবির আসল নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কেও মতপার্থক্য দেখা যায়। তবুও বড়ুচণ্ডীদাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তা থেকে বলা যায় যে, তিনি বাসুলীদেবীর সেবক ছিলেন। বড়ু শব্দটি এসেছে 'বটু' শব্দ থেকে। 'বটু' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ সন্তান। কবির জন্মস্থান বীরভূমের নানুর বা বাঁকুড়ার ছাতনা হতে পারে, কারণ দুটি জায়গাই চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ। তাই কোথায় কোন চণ্ডীদাসের জন্ম সে-নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যেহেতু পুথিটি বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গেছে এবং বাঁকুড়ার ছাতনায় বাসুলীদেবীর মন্দিরও পাওয়া যায়, তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি বড়ুচণ্ডীদাসের জন্মস্থান বাঁকুড়ার ছাতনা বলে ধরে নেওয়া যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি পরিচয় তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি তেরোটি (১৩টি) খণ্ডে বিন্যস্ত। এই তেরোটি খণ্ড হল-(১) জন্মখণ্ড, (২) তাম্বুলখণ্ড, (৩) দানখণ্ড, (৪) নৌকাখণ্ড, (৫) ভারখণ্ড, (৬) ছত্রখণ্ড, (৭) বৃন্দাবনখণ্ড, (৮) কালীয়দমনখণ্ড, (৯) যমুনাখণ্ড, (১০) হারখণ্ড, (১১) বাণখণ্ড, (১২) বংশীখণ্ড এবং (১৩) রাধাবিরহ। অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্ম থেকে তাঁর মথুরা গমন পর্যন্ত কাব্যের কাহিনি বিস্তৃত।

কাব্যটির এক দিকে যেমন সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তেমনি রয়েছে এর নাটকীয় গুণ। কেবল মাত্র জন্মখণ্ড ছাড়া কাব্যের বাকি খণ্ডগুলোর প্রায় প্রতিটি গান বা পদই সংলাপমূলক, অর্থাৎ কেবল জন্ম খণ্ডটিই কেবল বর্ণনামূলক তথা কবির বিবরণ। সংলাপমূলক পদগুলোর দুটি রীতি লক্ষ করা যায়— কোনো পদ একক উক্তিমূলক অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি পদ একটি চরিত্রেরই উক্তি। এক্ষেত্রে একটি চরিত্রের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি-উক্তি ঠিক তার পরবর্তী ভিন্ন পদে সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার কতগুলি পদের একটির মধ্যেই দুটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি পাওয়া যায়। জন্ম খণ্ডের পরবর্তী খণ্ডগুলির অতি নগণ্য সংখ্যক পদে কবির বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আদ্যন্ত নাটকীয় রীতিতে রচিত। যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নাট্যকলার সূত্রধরের ভূমিকার মতো সন্নিবেশিত হয়েছে।

যাই হোক, নাটকীয় গুণ সম্পন্ন এই কাব্যটির কেবল জন্ম খণ্ডেই পৌরাণিক কাহিনির অনুসরণ আছে। বাকি খণ্ডগুলিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় সংক্রান্ত ঘটনাই দেখা যায়। এবার খণ্ড-পরম্পরায় কীভাবে কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে, সে-দিকে নজর দেওয়া যাক।

৩.৬.১ জন্ম খণ্ড

কংসের অত্যাচারে পৃথিবী তথা সৃষ্টি সংকটে পড়েছে। তাই দেবতারা চিন্তিত হয়ে কংসের বিনাশ কীভাবে হবে, সেই উদ্দেশ্যে আকাশে একটি সভার আয়োজন করলেন। কোনো কুল-কিনারা না পেয়ে তাঁরা ব্রহ্মদেবের পরামর্শে নারায়ণের কাছে প্রার্থনা জানালেন। নারায়ণ তাঁদের প্রার্থনা শুনে একটি কালো ও একটি সাদা কেশ দিলেন। কালো কেশ থেকে কৃষ্ণ ও সাদা কেশ থেকে বলরামের জন্ম হল পৃথিবীতে। সুতরাং কংসকে হত্যা করার জন্যই কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবীও সাগর ও পদুমা বা পদ্মার ঘরে রাধা নামে জন্মগ্রহণ করেন। দৈব ঘটনায় সুন্দরী রাধার বিয়ে হয় নপুংসক গোয়ালা আইহনের সঙ্গে। আইহনের মাতা রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পদ্মার কাছে এক বৃদ্ধা চাইলে পদ্মা তাঁর বৃদ্ধা পিসিমাকে পাঠান। এই বৃদ্ধা সম্পর্কে রাধার বড়ায়ি হন।

৩.৬.২ তাম্বুল খণ্ড

বড়ায়ির সঙ্গে রাধা প্রতিদিন মথুরার হাটে দুধ-দৈ বিক্রি করতে যান। এক দিন বনপথে বৃন্দাবনের বকুলতলায় রাধা হারিয়ে যান। বড়ায়ি চিন্তিত মনে খুঁজতে খুঁজতে গোপালক কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। কৃষ্ণকে পেয়ে বড়ায়ি রাধার সংবাদ জিজ্ঞেস করলে, কৃষ্ণ তাঁর রূপের বর্ণনা করতে বলেন। বড়ায়ি-এর মুখে রাধার রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পড়ে যান। বড়ায়িকে দূতি হিসাবে নিয়োজিত করে তাঁর হাত দিয়ে ফুলের মালাসহ তাম্বুলাদি পাঠান। এর পর কৃষ্ণের নির্দেশিত পথে গিয়ে বড়ায়ি রাধার সাক্ষাৎ পান এবং কৃষ্ণের পাঠানো ফুল পান-তাম্বুল তাঁর হাতে দিলে ঘৃণাভরে তিনি সেগুলো প্রত্যাখান করেন এবং এই ধরনের কাজের জন্য বড়ায়িকে অপমান করেন। রাধার এই প্রত্যাখানের কথা বড়ায়ি কৃষ্ণকে জানিয়ে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নিতে বলেন।

৩.৬.৩ দান খণ্ড

রাধা নিত্য মথুরায় দৈ-দুধ বিক্রি করতে যান। বড়ায়িয়ের পরামর্শ মতো একদিন কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে দানি সেজে থাকেন। রাধা সেপথে এলে তাঁর কাছে মহাদানস্বরূপ আলিঙ্গন চেয়ে বসেন। রাধা পরস্ত্রী হওয়ায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং কংস ও তার বলবান স্বামী আইহনের ভয় দেখান। কৃষ্ণ তবুও পিছপা না হলে তিনি যে সম্পর্কে কৃষ্ণের মামি হন, সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাঁর জেদে অটল থাকেন, পথ ছাড়েন না। নিরুপায় হয়ে রাধা কৃষ্ণের আলিঙ্গনপাশে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু শর্ত দেন যেন তাঁর শৃঙ্গার তথা সাজ-সজ্জার কোনো ক্ষতি না হয়, যাতে ঘটনাটি গোপনেই থাকে, বাড়ির লোক বা অন্য কেউ জানতে না পারে।

৩.৬.৪ নৌকা খণ্ড

কৃষ্ণের কাছে এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে রাধা আর মথুরার হাটে দৈ-দুধ বিক্রি করতে আর যাচ্ছেন না। এদিকে কৃষ্ণ দীর্ঘদিন তাঁকে দেখতে না পেয়ে বড়ায়ির কাছে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা জানান। বড়ায়ি কৃষ্ণেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌশলে রাধার শ্বাশুড়ির কাছে অনুমতি নিয়ে তাঁকে আবার হাটের জন্য বাড়ি থেকে বের করে আনেন। ষোলোশত সখী সঙ্গে করে রাধা যমুনার ঘাটে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ ঘাটোয়াল সেজে তাঁর ছোটো নৌকায় বড়ায়িসহ একে একে সকল সখীকে পার করে দেন। শেষে রাধাকে পার করার সময় নদীতে ঝড় ওঠে। রাধা ভীত হন, কৃষ্ণ নদীর মাঝপথে কৌশলে নৌকা ডুবিয়ে দেন। রাধা এবার আরও ভয় পেয়ে যান। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার সঙ্গে জলকেলি করে সম্ভোগ করেন। শেষে ভরাডুবি থেকে রাধার জীবন রক্ষা করেন। এই প্রথম রাধার মুখে কৃষ্ণের প্রশংসা শোনা গেল যে, আজ কৃষ্ণ অনেক কষ্টে করে তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন এবং মাঝ নদীতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা গোপন করে গেলেন।

৩.৬.৫ ভার খণ্ড

কৃষ্ণের প্রতি রাধার সাময়িক দুর্বলতা জন্মালেও ঘরে ফিরে রাধা কুল ও সমাজের কথা চিন্তা করে কৃষ্ণের ভয়ে আবার হাটে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বড়ায়ি তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, শরৎকালে মথুরার হাটে লোকজনের যাতায়াত বেশি। এবার দুষ্ট কৃষ্ণকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। একে শরৎকাল, তার ওপর প্রখর রৌদ্র, তাই রাধা এক জন ভারবাহকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কৃষ্ণ ভারি সেজে সেখানে উপস্থিত হয়ে মজুরি হিসেবে আলিঙ্গন প্রার্থনা করলেন। রাধা তাঁকে সুরতি দানের আশা দিয়ে ভার বহন করতে বললেন। কৃষ্ণও আশায় আশায় ভার বহন করে দিলেন কিন্তু রাধা তাঁর আশা পূর্ণ করলেন না।

৩.৬.৬ ছত্র খণ্ড

এই খণ্ডে দেখা যায় রাধা তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় কৃষ্ণ রুষ্ট এবং অপমানিত বোধ করছেন। ফেরার পথে রাধা প্রখর রৌদ্রে হাটতে পারছেন না। তখন তিনি আবার কৃষ্ণকে তাঁর মাথায় ছত্রধারণের কথা বলে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের আশ্বাস দেন। কৃষ্ণ আবারও আশা নিয়ে ছত্রধারণ করলেন। কিন্তু এবারেও রাধা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন না।

৩.৬.৭ বৃন্দাবন খণ্ড

এই খণ্ডে দেখা যায় কৃষ্ণ সুন্দর বৃন্দাবন রচনা করেছেন। কৃষ্ণ যেমন রাধার প্রতি আসক্ত তেমনি রাধাও এখন কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা হয়ে উঠছেন। তিনি নিজেই এখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশী। তাই সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবন দেখতে গেছেন। কিন্তু এবার কৃষ্ণ বাকি সমস্ত গোপিকে দেখা দিলেন কিন্তু রাধার কাছেও ঘেসছেন না। এদিকে কৃষ্ণকে দেখার জন্য রাধার ব্যাকুলতা লক্ষ করা যায়। তবে সবার শেষে কৃষ্ণ রাধাকে দর্শন দেন।

৩.৬.৮ কালীয়দমন খণ্ড

কালীয় নাগের উপস্থিতিতে যমুনার কালিদহের জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সেই বিষ সমস্ত নদীতে ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতে কৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করার জন্য কালিদহে ঝাপ দেন। দৈব সংঘটনে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পরে কালীয় নাগ পরাস্ত হয়। কৃষ্ণ তাকে দক্ষিণ সাগরের জলে পাঠিয়ে দেন। এই যুদ্ধের সময়ে রাধার কাতরতা বেশ লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৩.৬.৯ যমুনা খণ্ড

যমুনা খণ্ডে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের যমুনাবিহার। রাধা তাঁর সখীদের সঙ্গে যমুনায় জল আনতে যান। ঐ সময় কৃষ্ণ যমুনার জলে ডুব দিয়ে আর উঠছেন না। সবাই মনে করলেন কৃষ্ণ ডুবে গেছেন। কিন্তু কৃষ্ণের এটা একটা চাল ছিল, তিনি সবার চোখ এড়িয়ে জল থেকে উঠে

এসে কদম গাছে লুকিয়ে থাকেন। এই সুযোগে তিনি সমস্ত গোপিদের বস্ত্র ও হার হরণ করেন। শেষে রাধার অনুনয়ে সব কিছু ফিরিয়ে দিলেও তাঁর গলার হার ফিরিয়ে দিলেন না।

৩.৬.১০ হার খণ্ড

রাধা এই অভিযোগ কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে পেশ করেন। কৃষ্ণ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মাকে উল্টে প্রশ্ন করেন যে, কেন তিনি রাধার হার চুরি করতে যাবেন, সেখানে রাধা সম্পর্কে তাঁর মামি হয়। অপর দিকে বড়ায়ি রাধার স্বামী আইহনকে বলেন যে, বনের কাঁটায় রাধার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

৩.৬.১১ বাণ খণ্ড

বাণ খণ্ডে রাধার উপরে কৃষ্ণের সম্মোহন বাণ নিক্ষেপের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল রাধা তখনও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বড়ায়ির পরামর্শে রাধার উপরে তিনি পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন। রাধা সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। বড়ায়ির অনুরোধে কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য ফিরিয়ে দিলেন। এর পর থেকেই রাধা কৃষ্ণপ্রেমে কাতর হয়ে উঠলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রাধাকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

৩.৬.১২ বংশী খণ্ড

এই খণ্ডে দেখা যায় যে, রাধা কৃষ্ণপ্রেমে কাতরা হয়ে ওঠার পর থেকেই কৃষ্ণের আর তেমন কাতর ভাব দেখা যাচ্ছে না। তিনি যেন এই সময়টুকুর জন্যই যেন অপেক্ষা করে ছিলেন যে, কবে রাধা তাঁর প্রেমপাশে বন্দী হন। ব্যাস যখনই সেটা হল, ঠিক তখন থেকেই তিনি আড়ালে চলে গেলেন। এদিকে রাধা দূর থেকে কেবল কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে আরও কাতর হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর মনে হয়, বাঁশির শব্দে তাঁর সব কিছুই যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যমুনার ঘাট থেকে ভেসে আসা কৃষ্ণের মোহনবাঁশীর সুর শুনে রাধা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি ঘরে স্থির থাকতে পারছেন না। এই উল্টো যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে বড়ায়ি 'নিন্দালি' মন্ত্রে কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করেন। তাঁরই পরামর্শে এই সুযোগে রাধা কৃষ্ণের মোহন বাঁশি চুরি করেন। কৃষ্ণ সে কথা বুঝতে পেরে বাঁশি ফেরত পাওয়ার জন্য রাধার কাছে যান। কিন্তু রাধা সহজে চুরির কথা স্বীকার করেন না। এবার শুরু হয় বাঁশির জন্য কৃষ্ণের কাতরতা। শেষে রাধাকে ছেড়ে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে কৃষ্ণ এ যাত্রায় বাঁশি ফেরত পান।

৩.৬.১৩ রাধাবিরহ

রাধাবিরহে রাধা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা হয়ে ওঠেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর ধরা দেন না। রাধা তাঁর দুঃখের কথা বড়ায়িকে জানায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কৃষ্ণকে বাঁশি বাজানো অবস্থায় বৃন্দাবনে খুঁজে পান রাধা। কিন্তু কৃষ্ণ আর রাধার দিকে ফিরেও তাকাতে চান না। তখন

বড়ায়ির প্রচেষ্টায় তাঁদের মিলন ঘটে। কিন্তু কৃষ্ণ কংস বধের জন্য নিদ্রিত রাধাকে ফেলে মথুরায় চলে যান। এর পর থেকে কৃষ্ণবিরহে রাধার বিলাপের অন্ত নেই। বড়ায়ি রাধার এই অবস্থা দেখে থাকতে না পেরে মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে সব কথা জানান। কিন্তু কৃষ্ণ আর ফিরে আসেন না। তাই রাধার বিরহের শেষ হয় না। এই সীমাহীন বিরহ নিয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমাপ্তি ঘটে।

৩.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

যদিও ভারতীয় সাহিত্যে বিয়োগান্তক সমাপ্তি দেখা যায় না, বরং তা হয় সুন্দরে সমাপন। কিন্তু এই কাব্যটি শেষ হয়েছে রাধার বিরহের মাধ্যমে। তাই অনেক সমালোচক মনে করেন যে, এর পরেও হয়তো আরো কিছু বিষয় ছিল। কিন্তু শেষের পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া না যাওয়ায় নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

উপরে আমার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম থেকে শেষ খণ্ড পর্যন্ত কাহিনি খণ্ড-পরম্পরায় সুন্দর ভাবে গ্রথিত। কাহিনি একমুখীন, সোজা পরিণতির দিকে প্রবাহিত। কোথাও কোনো সূত্রছিন্নতার লক্ষণ দেখা যায় না। তিনজন চরিত্র -রাধা, বাড়ায়ি ও কৃষ্ণের উক্ত-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়েই প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনি বর্ণিত। প্রতিটি ঘটনা নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপিত।



৩.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যের কাল সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হলো।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি পরিচয় সম্পর্কে জানা গেল।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল।
- কাব্যের পরিণতি বিয়োগান্তক হবার কারণ বিষয়ে বোঝা সম্ভব হলো।



৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি একটি নাট্য লক্ষণাক্রান্ত আখ্যায়িকামূলক কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। ...কাব্যনাম ও কাহিনির সম্পূর্ণতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা থেকে যায়। (দ্রষ্টব্য ৩.৪ অংশ)

২। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের জহুরী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম ...এর প্রায় দু-বছর পর, অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, বসন্তরঞ্জন পুথিটি ...এভাবে উত্তরটি গড়ে তুলতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৩.৩ অংশ)

৩। চণ্ডীদাস বাঙালির প্রিয়কবি। এ কথাটির সঙ্গে কোন চণ্ডীদাসের নাম জড়িয়ে রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন আমাদের জাগে। ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাস বলে ...এভাবে গড়ে তলুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৫)



৩.১০ অতিরিক্ত পঠন

১। আচার্য্য, দেবেশ (১৯৮৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

২। বন্দ্যোযাপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯০); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি

৩। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (২০১১) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং



৩.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি পরিচয় বিষয়ে আলোচনা করুন।

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারকাল বিষয়ে লিখুন।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকার বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৪ : অনুবাদ সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৪.২ পরিচিতি

৪.৩ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ত্রিধারা

- ৪.৩.১ রামায়ণের অনুবাদ
- ৪.৩.২ কবি পরিচয় কৃত্তিবাস ওঝা
- ৪.৩.৩ কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালি
- ৪.৩.৪ রামায়ণ অনুবাদক- অদ্ভুত আচার্য
- ৪.৩.৫ রামায়ণ অনুবাদক- চন্দ্রাবতী
- ৪.৩.৬ রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক

৪.৪ মহাভারতের অনুবাদ

- ৪.৪.১ কবি পরিচয়- কবীন্দ্র পরমেশ্বর
- ৪.৪.২ কবি পরিচয় শ্রীকর নন্দী
- ৪.৪.৩ কবি পরিচয়- সঞ্জয়
- ৪.৪.৪ সপ্তদশ শতকের মহাভারত অনুবাদক
- ৪.৪.৫ কবি পরিচয় নিত্যানন্দ ঘোষ
- ৪.৪.৬ কবি পরিচয়- কাশীরাম দাস
- ৪.৪.৭ কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঁচালি

৪.৫ ভাগবতের অনুবাদ

- ৪.৫.১ কবি পরিচয়-মালাধর বসু
- ৪.৫.২ মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’
- ৪.৫.৩ ষোড়শ শতকের ভাগবতেব অনুবাদক
- ৪.৫.৪ কবি পরিচয়- ভাগবতাচার্য
- ৪.৫.৫ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ভাগবতের অনুবাদক

৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

- অধ্যায়টি পড়ে আপনি মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত হবেন।
- পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে অনুবাদ-চর্চা জমে ওঠে, তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হবেন। বাংলাদেশে কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসু যথাক্রমে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৪.২ পরিচিতি

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চর্যাপদের রচনাকাল বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তুর্কী, তাতার, খোরাসানি, পাঠান প্রভৃতি ইসলামপন্থী শাসকদের আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে সাহিত্য সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে এই দুশো বছরের সময়সীমাকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের জলে-স্থলে বর্ধিত হয়ে মুসলমান শাসকেরা বাংলাদেশকে ভালোবাসলেন, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহলী হলেন। ফলে বাঙালি লেখকেরা আবার নতুন করে সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোযোগ দিলেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সূচিত হল। মধ্যযুগের আদিপর্বে বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একটি কাব্য রচনা করলেন। এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন। তারপর একে একে বিভিন্ন ও বিচিত্র সাহিত্যসম্ভারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

৪.৩ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ত্রিধারা

পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলাদেশে অনুবাদ সাহিত্যের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ সেই সময় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালেও সেই জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে মুসলমান শাসকেরা বাংলাদেশে এসে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই দেশে বর্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুকূল হলেন। অনেক সুলতান রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনতে পছন্দ করতেন। তাঁরা নানারকম খেতাব-খেলাত-নজরানা দিয়ে স্থানীয় কবিদের রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাংলা ভাষায় রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। অনুবাদ সাহিত্যের তিনটি ধারা হিসেবে সংস্কৃতে রচিত দুটি মহাকাব্য ও একটি পুরাণের বঙ্গানুবাদকেই চিহ্নিত করা হয়। এই অনুবাদ সাহিত্যের সূচনার ফলে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কয়েকটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

প্রথমত, সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছিল; তাদের সম্পর্ক ছিল বিজয়ী ও বিজিতের, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের অনুশীলনের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হল। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ দুশো বছরকাল বিদেশি তথা বিধর্মী শাসকের অধীনে থাকার ফলে

হিন্দুসমাজে ভাঙন ধরেছিল; হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা হারাতে বসেছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচারের ফলে হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি হৃত আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে পেল। তৃতীয়ত, পৌরাণিক সাহিত্য তথা আর্যসংস্কারের প্রভাব না পড়লে বাংলা সাহিত্য লৌকিক সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করতে পারত না। সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের বাংলা রূপান্তর মধ্যযুগের কাব্যকে এক ক্লাসিক মহিমা দিয়েছে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্য যে মধ্যযুগের গুটি থেকে বেরিয়ে আধুনিক কালে এক বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম রূপে সম্মানিত হয়েছে, তার মূলেও রয়েছে এই অনুবাদ সাহিত্য। চতুর্থত, এতকাল অবধি সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের প্রচার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের ফলে বাঙালি স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দল সহজেই পৌরাণিক সাহিত্যকে আস্বাদন করতে সক্ষম হল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের কারণে যে ফল দেখা যা সে সম্পর্কে লিখুন (৮০ শব্দের মধ্যে)

৪.৩.১ রামায়ণের অনুবাদ

মহাকবি বাল্মীকির রচিত রামায়ণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর চারটি প্রাচীনতম মহাকাব্যের মধ্যে এটি একটি। বাল্মীকি রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত এবং ২৪,০০০ শ্লোকে গ্রথিত বিশাল এক কাব্য। রাম-রাবণের বিরোধকে অবলম্বন করে সে যুগে আরও অনেক কবি কাব্য লিখেছিলেন। কিন্তু রচনার উৎকর্ষের জন্য বাল্মীকির মহাকাব্য কালজয়ী হয়েছে।

হাজার হাজার বছর আগে রচিত রামায়ণের কাহিনি নানা যুগে ভারতীয় মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রামায়ণের জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম কৃত্তিবাস ওঝার রচিত রামায়ণ পাঁচালি। বাংলা রামায়ণ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক এই কৃত্তিবাস। তবে কৃত্তিবাস ছাড়াও মধ্যযুগে আরও অনেক কবি বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অদ্ভুত আচার্য। তাছাড়া ছিলেন চন্দ্রাবতী, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যামদাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু প্রমুখ কবিরা।

৪.৩.২ কবি পরিচয় : কৃত্তিবাস ওঝা

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখনও সেই জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু কৃত্তিবাসের জীবন কাহিনি নিয়ে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবকাল, গ্রন্থ রচনার সময় ইত্যাদি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ কোনো কোনো ছাপা রামায়ণে 'কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, যেখানে কবি তাঁর

বংশপরিচয়, বিদ্যাশিক্ষা, গৌড়শ্বেরের সভার কাহিনি ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তারে বলেছেন। কিন্তু কবে তাঁর জন্ম এবং কবে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি বা এমন কোনো তথ্যও দেননি যার দ্বারা তাঁর জন্মসন বা গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

'কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়' শীর্ষক কবিতা থেকে জানা যায় তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ছিলেন পূর্ববঙ্গ নিবাসী এক ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেই দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে নদীয়া জেলার গঙ্গা তীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এঁরই বংশধর মুরারি ওঝা, যিনি ছিলেন কৃত্তিবাসের পিতামহ। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ওঝা এবং মাতা মালিনী। তাঁরা ছয় ভাই ও এক বোন। নিজের জন্ম সম্পর্কে কৃত্তিবাস বলেন- 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস। তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।'

অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ দিনে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কিন্তু সেটি কোন সন বা কোন শতক তা নিয়ে কবি নিশ্চুপ ছিলেন। তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি শৈশব থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এগারো-বারো বছর বয়সে তিনি বিদ্যার্জনের জন্য পদ্মা নদী পার হয়ে উত্তর দেশে যান। সেখানে কয়েক বছর ধরে তিনি গুরুগৃহে অবস্থান করেন। গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি রাজপণ্ডিত হওয়ার অভিপ্রায়ে গৌড়রাজার সভায় উপস্থিত হন। এ সম্পর্কে কৃত্তিবাস বলছেন-

"রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়শ্বেরে।।"

কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় পেয়ে গৌড়শ্বের মুগ্ধ হন এবং তাঁকে চন্দন, পুষ্পমাল্য ও পট্টবস্ত্রে ভূষিত করে কবির আসনে বরণ করে নেন। তিনি তাঁকে অর্থও দিতে চান। কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ কবি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইতিমধ্যে গৌড়শ্বের কৃত্তিবাসকে বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে বাংলায় রামকথা লিখতে নির্দেশ দেন। এই গৌড়শ্বেরেরই নির্দেশে পরবর্তী সময়ে কৃত্তিবাস তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন। কৃত্তিবাস এই গৌড়শ্বেরের সভা ও সভাসদদের বিস্তৃত পরিচয় দিলেও গৌড়শ্বেরের নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। তবে কৃত্তিবাস যে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি, সে সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। তাঁর কাব্যের ভাষা, রচনাভঙ্গিমা, পুথিতে হাতের লেখা সমস্ত কিছুই সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি নানারকমের জ্যোতিষ গণনার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ১৩৮৬ থেকে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। গুরুগৃহে সাত-আট বছর থেকে তিনি যদি উনিশ-বিশ বছর বয়সে গৌড়শ্বেরের সভায় যান, তাহলে সেটা হবে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো একটা সময়। সেই সময় গৌড়ের রাজা ছিলেন গণেশ। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, তিনি রাজা গণেশের সভায় যাননি, বরং পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কবিকে যে সকল প্রথা মেনে রাজসভায় সম্মান জানানো হয়েছিল, তার থেকে মনে হয় তিনি কোনো মুসলমান সুলতানের সভায় যাননি; তাঁর আত্মপরিচয়মূলক কবিতা থেকেও মনে হচ্ছে তিনি কোনো সুলতানের সামনে গিয়ে হাজির হননি। অতএব ধরা যাক কবি কৃত্তিবাস রাজা গণেশের

সভাতে গিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই অনুসারে বলা যেতে পারে যে কৃত্তিবাস চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীরাম পাঁচালি লেখেন। গ্রন্থের প্রমাণও সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

৪.৩.৩ কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালি

কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করতে গিয়ে মূলত বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনিকেই অনুসরণ করেছিলেন; তাছাড়া অন্যান্য রামায়ণ, সংস্কৃত কাব্য ইত্যাদি থেকেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, কিছু নিজেও বানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের কাব্যটি ভাবানুবাদ পর্যায়ের হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী কৃত্তিবাস বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালি' নামে বিখ্যাত। বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে তাঁর কাব্যটিও সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডগুলির নামকরণও প্রায় এক। সেগুলি হল যথাক্রমে— আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, আরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। তবে বাল্মীকি সৃষ্টি করেছিলেন মহাকাব্য, আর কৃত্তিবাসের রচনা হল পাঁচালি। অতএব দুইয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য রয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণের ঐশ্বর্যশালী ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রকল্প, শিল্পগুণসমৃদ্ধ চরিত্র, গাম্ভীর্যপূর্ণ বর্ণনা প্রভৃতির তুলনায় কৃত্তিবাস সহজ-সরল ভাষায় জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালির ঢঙে তাঁর রামায়ণকে পরিবেশন করেছেন। তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঁচালির আদর্শে ও বাঙালি মানসিকতার অনুকূলে তাঁর কাব্যকে সাজিয়েছেন। ফলে তাঁর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাঙালির ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছেন। রাম সেখানে স্নেহশীল অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য লক্ষ্মণ সর্বসুখত্যাগী, সর্বংসহা কুলবধূ সীতা বাঙালি পরিবারের চরিত্র সেখানে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ, বাঙালির লৌকিক অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি তাঁর কাব্যের বিশাল একটি জায়গা জুড়ে রয়েছে। ফলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালির জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। এই কাব্য শুধু বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ নয়, বাঙালির হৃদয়ের সঙ্গেও এর এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। প্রথিতনামা সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— "মধ্যযুগীয় কোন কাব্যকে যদি জাতীয় কাব্য বলতে হয়, তবে সে গৌরব কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রাপ্য।"

কৃত্তিবাস যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ হল তাঁর রামায়ণের যত পুথি পাওয়া গেছে, মধ্যযুগের আর কোনো কবির কোনো কাব্যের এত পুথি পাওয়া যায়নি। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনের মিশনারী উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালি'র একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৩.৪ রামায়ণ অনুবাদক - অদ্ভুত আচার্য

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হওয়ার পর সপ্তদশ শতকের পূর্ব অবধি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রামায়ণ-অনুবাদকের হদিস পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের সর্বগ্রাসী প্রভাবের ফলেই কবিরা রামায়ণ রচনায় অগ্রসর হতে সাহস করতেন না। তবে সপ্তদশ শতকের রামায়ণ অনুবাদক হিসেবে অদ্ভুত আচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ একসময় উত্তরবঙ্গে কিছু জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সর্বপ্রথম এই কবির পুথি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী উত্তরবঙ্গে জমি জরিপের কাজে গিয়ে যে রিপোর্ট দেন তাতে অদ্ভুত আচার্য সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন। বুকানন লিখেছিলেন যে, উত্তরবঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণেরও বিশেষ প্রচার আছে। অবশেষে ১৯১৩ সালে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় রংপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হলে এই কবি ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। তাঁর পিতার নাম শ্রীনিবাস ও পিতামহের নাম প্রচণ্ড। নিত্যানন্দের চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড়। অদ্ভুত আচার্যের জন্মস্থান নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অনুমান তাঁর জন্মস্থান বগুড়া বা রাজশাহী জেলার কোনো গ্রাম। আবার কেউ কেউ মনে করেন পাবনা জেলার কোনো একটি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর রামায়ণের কোনো পুথিতে এই গ্রামের নাম সোনাবাজু, আবার কোথাও একে অমৃতকুণ্ডা বলা হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সেই তিনি বহু শাস্ত্র পাঠ করেন। একবার স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হয়ে কিশোর কবিকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ করেন। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ নিয়ে প্রথম বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। রজনীকান্তের সম্পাদনায় এই রামায়ণের কিছু অংশ প্রকাশিত হবার পর এই বিষয়ে নানা তথ্য ও প্রশ্নের উত্থাপন করেন নলিনীকান্ত। তিনি সমসাময়িক কুলজী গ্রন্থ এবং স্থানীয় জমিদার বংশের ইতিহাস ঘেঁটে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অদ্ভুত আচার্য বা নিত্যানন্দ ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর রামায়ণ ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে রচনা করেন।

অদ্ভুত আচার্য রামায়ণের সাতকাণ্ডই রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। তাঁর রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ বলে পরিচিত হলেও মূল সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই। বর্ণনার রীতিতে তিনি মোটামুটি কৃত্তিবাসের স্টাইলকে অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি কৃত্তিবাসের সমকক্ষ কবি নন। কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকি রামায়ণকে সর্বাংশে অনুসরণ না করলেও তাঁর সামঞ্জস্যবোধ অধিকাংশ স্থলেই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত আচার্য সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। তিনি তাঁর কাব্যে এমন সব আজগুবি আখ্যান সংযোজন করেছেন যে, তাতে তাঁর সংযম ও সামঞ্জস্য বোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর কাব্যের রচনারীতি পরিচ্ছন্ন ও সুখপাঠ্য, করুণরস ও আবেগের বর্ণনায় তাঁর লেখনী সহজ ও সরস। অদ্ভুত আচার্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাঁর কিছু কিছু রচনা চলে গেছে। তাঁর বেশির ভাগ পুথি মালদহ ও রংপুর থেকে পাওয়া গেছে।

অদ্ভুত আচার্য কৃত্তিবাসের সমতুল্য না হলেও সপ্তদশ শতকের রামায়ণ সাহিত্য অনুবাদে তাঁর যে কৃতিত্ব রয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য।

৪.৩.৫ রামায়ণ অনুবাদক- চন্দ্রাবতী

সপ্তদশ শতাব্দীতে আর একজন রামায়ণ-কবি আবির্ভূত হয়ে রামায়ণ অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর নাম হল চন্দ্রাবতী। তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা বংশীদাস চক্রবর্তীর বিদুষী কন্যা। প্রসিদ্ধ ছড়া সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্ত্রীলোকদের মুখ থেকে এই রামায়ণের কাহিনি সংগ্রহ করেন এবং 'সৌরভ' পত্রিকায় 'মহিলাকবি চন্দ্রাবতী' শীর্ষক প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র চতুর্থ খণ্ডে এই রামায়ণের কিছুটা মুদ্রিত হয়েছে। চন্দ্রাবতী মূল রামায়ণকে অনুসরণ না করে গ্রাম্য রামকথার উপর ভিত্তি করেছিলেন। তাঁর রচনাতে কিছু কিছু স্থানে মেয়েলি ঢঙ আছে। তবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। কারণ এর ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর নয়; তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির অনুপস্থিতি এর যথার্থতা নিয়ে সংশয় ঘন করে তুলেছে।

দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনা থেকে জানা যায়, চন্দ্রাবতী পাটওয়ারী নামে এক গ্রামের পাঠশালায় পড়ার সময় ব্রাহ্মণ যুবক জয়চন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু জয়চন্দ্র অন্য এক মুসলমান যুবতীর প্রেমে পড়লে চন্দ্রাবতী চিরকৌমার্য অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন। কথিত আছে, বংশীদাস নিজ কন্যাকে হতাশাবোধ থেকে রক্ষা করার জন্যই রামায়ণ রচনা করার আদেশ দিয়েছিলেন। চন্দ্রাবতীর বেশ কবিপ্রতিভা ছিল। তখন পিতার আদেশ শিরোধার্য করে তিনি রামায়ণ লিখেছিলেন। তবে তাঁর রামায়ণ সম্পূর্ণ নয়। এতে সীতার বনবাস পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের রামায়ণ অনুবাদক হিসেবে চন্দ্রাবতীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪.৩.৬ রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক

সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন রামায়ণ-কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন- দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যামদাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউই পুরো রামায়ণ অনুবাদ করেননি বা করতে পারেননি। ফলে তাঁরা রামায়ণের জনপ্রিয় একটি বা দুটি আখ্যান গ্রহণ করেছিলেন, আবার কেউ কেউ অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কোনো কোনো আখ্যান একসঙ্গে মিশিয়ে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

৪.৪ মহাভারতের অনুবাদ

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারত ভারতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের চরম নিদর্শন হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্যের মধ্যে এটি অন্যতম। এর মূল উপজীব্য বিষয় পাণ্ডব ও কৌরবের বিরোধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা তথা তাঁর প্রচারিত ভাগবতধর্ম। কিন্তু এই

মহাভারতে মূল ঘটনা-বহির্ভূত অনেক কাহিনি, উপকাহিনি, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। ফলে বেদব্যাসের মহাভারত ভারতীয় ঐতিহ্যের পরাকাষ্ঠারূপে পরিণত হয়েছে। বাংলায় একটি প্রবাদ বেশ প্রচলিত - যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যা-যা আছে, তার সবই পাওয়া যাবে মহাভারতে। তবে ব্যাসের মহাভারত ছাড়াও পাণ্ডব-কৌরবদের সংঘাত নিয়ে আরও কয়েকটি মহাভারত লেখা হয়েছিল। কিন্তু রচনার গুণে ব্যাসের মহাভারত শ্রেষ্ঠ তথা কালজয়ী হয়ে উঠেছে। মহাভারত অনেক কবি লিখলেও রচনার উৎকর্ষের জন্য ব্যাসদেবের কাব্য মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। ফলে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মহাকাব্যের মধ্যে দুটিই ভারতীয় একটি বাল্মীকির রচিত রামায়ণ ও আরেকটি ব্যাসদেবের মহাভারত। ব্যাসের মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক রয়েছে, তাছাড়া দীর্ঘ গদ্যাংশও রয়েছে। এই মহাভারত আঠারোটি পর্বে বিন্যস্ত। সেগুলি হল যথাক্রমে আদি পর্ব, সভা পর্ব, বন পর্ব, বিরাট পর্ব, উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, দ্রোণ পর্ব, কর্ণ পর্ব, শল্য পর্ব, সৌপ্তিক পর্ব, স্ত্রী পর্ব, শান্তি পর্ব, অনুশাসন পর্ব, অশ্বমেধিক পর্ব, আশ্রমবাসিক পর্ব, মৌসল পর্ব, মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব। সব মিলিয়ে মহাভারত মহাকাব্যটি এক বিশাল কলেবর ধারণ করেছে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুদিত হতে শুরু হয়। তবে সপ্তদশ শতকের কবি কাশীরাম দাসের আগে প্রায় কোনো কবিই মহাভারতকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারেননি। তবু তার মধ্যেই পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে দুই-একজন কবি মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেভাবে সফল হননি।

৪.৪.১ কবি পরিচয়-কবীন্দ্র পরমেশ্বর

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যে সকল কবি মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কবীন্দ্র পরমেশ্বরের। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খাঁর সভাকবি ছিলেন পরমেশ্বর। কবীন্দ্র খুব সম্ভব তাঁর উপাধি। এই পরাগল খাঁ গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং হিন্দুদের মহাকাব্য-পুরাণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। একবার তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ডেকে এমন ভাবে মহাভারত অনুবাদ করতে বললেন যাতে তিনি একদিনের মধ্যেই সমগ্র মহাভারতের কাহিনি শুনতে পারেন। তখন তাঁর নির্দেশে পরমেশ্বর খুব সংক্ষেপে ব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। তবে এতে প্রধান ঘটনা প্রায় কিছুই বাদ পড়েনি। তত্ত্বকথা পরাগল খাঁর মনোরঞ্জন করতে পারবে না আশঙ্কা করে পরমেশ্বর শুধু মূল মহাভারতের কাহিনিটি অনুসরণ করেছেন, অনেক মূল্যবান তত্ত্বকথা একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন। পরমেশ্বরের ভাষাভঙ্গি সহজ সরল, কিন্তু উৎকৃষ্ট বা কাব্যগুণসম্পন্ন নয়। মূল মহাভারতের আস্বাদ এই কাব্য থেকে পাওয়া যায় না। ফলে পরাগল খাঁ এ থেকে কতটুকু আনন্দ পেয়েছিলেন সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়া পরাগল খাঁর প্রাসাদের বাইরে এর প্রচারও তেমন ছিল না। তবে মহাভারতের বিশাল কাহিনির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনিই প্রথম তুলে ধরেছিলেন। পুথিপত্র বিচার করলে পরমেশ্বরকে মহাভারতের প্রথম অনুবাদকের

মর্যাদা দিতে হয়। তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে। তখন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন একাদিক্রমে হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ। পরমেশ্বরের মহাভারত 'পাণ্ডববিজয়' তথা 'ভারত পাঁচালি' নামে বিখ্যাত।

৪.৪.২ কবি পরিচয় শ্রীকর নন্দী

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের প্রায় সমকালে বা কিছুসময় পরে শ্রীকর নন্দী নামে আরও এক কবি মহাভারতের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন। লস্কর পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ বা ছোটো খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। তিনিও তাঁর পিতার মতো হিন্দুদের কাব্যাদি শুনতে ভালোবাসতেন। এঁরই সভাকবি ছিলেন শ্রীকর নন্দী। ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে কোনো এক সময় মহাভারত অনুবাদ করতে আদেশ করেন। পাণ্ডবদের যজ্ঞানুষ্ঠান ও ঐশ্বর্য-গৌরব লাভের কাহিনি এঁর খুব প্রীতিজনক ছিল। তখন শ্রীকর নন্দী বেদব্যাসের মহাকাব্যকে পরিত্যাগ করে এবং জৈমিনি নামে এক অখ্যাত কবির মহাভারতকে অবলম্বন করে শুধু অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। জৈমিনির নামে অশ্বমেধ পর্বটিই রক্ষা পেয়েছে। এই অশ্বমেধ পর্বের অনুসরণেই শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের উপস্থাপনা। শ্রীকর নন্দীর রচনাশৈলী পরমেশ্বরের চেয়ে উৎকৃষ্ট, বিশেষ করে হাস্যরসের প্রকাশে তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। শব্দ যোজনা এবং ছন্দ প্রয়োগেও তিনি কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ফলে এই কবির অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ বেশ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীকর নন্দীর কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক। তবে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী প্রায় এক সময়ে, একস্থানে, একই শাসকবংশের অধীনে এবং নির্দেশে মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন বলে কখনও কখনও একের পুথিতে অন্যের ভণিতা ও রচনাংশ অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু দুজনেই যে স্বতন্ত্র কবি ছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৪.৪.৩ কবি পরিচয় - সঞ্জয়

সঞ্জয় নামের আরেকজন কবির মহাভারত পাওয়া গেছে। অধ্যাপক মুনীন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঞ্জয়ের মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অনুমান করা হয় তিনি ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল শ্রীহট্টে। তবে কোনো কোনো সমালোচকের মতে সঞ্জয় বলে কোনো আলাদা কবি ছিলেন না; কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতকেই সঞ্জয়ের মহাভারত হিসেবে পুথির লিপিকারেরা গুলিয়ে ফেলেছেন। আসলে এই দুই কবির রচনায় অনেক সাদৃশ্য থাকায় সঞ্জয়কে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে সমালোচকদের আপত্তি। তাছাড়া তাঁর কাব্যের ভণিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি অনেক সময়ই মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের উপদেষ্টা সঞ্জয়ের নামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন। তবে তাঁর মহাভারতের পুঁথিপত্র দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, সঞ্জয় নামে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে এক স্বতন্ত্র কবি বর্তমান ছিলেন এবং তিনি বেশ প্রতিভাবান ছিলেন।

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বলে আর একটি মহাভারত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তবে এটি একটি জাল গ্রন্থ। পরমেশ্বরের কাব্যই 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' নামে প্রচারিত হয়েছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর গ্রন্থের কোনো কোনো জায়গায় 'পাণ্ডব বিজয়কথা'

বা 'বিজয়পাণ্ডবকথা' বলে নিজের কাব্যকে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে নকলনবিশদের অজ্ঞতার জন্য এই পাণ্ডববিজয়কথা বা বিজয়পাণ্ডবকথা পরিণত হয়েছে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে। অতএব বিজয় পণ্ডিত নামে কোনো কবি কোনোদিনই যে ছিলেন না সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

৪.৪.৪ সপ্তদশ শতকের মহাভারত অনুবাদক

সপ্তদশ শতকের অনুবাদ সাহিত্যের মানদণ্ড কাশীরাম দাস একাই ধরে রেখেছেন। তবে তাঁর পূর্বে কোনো কোনো কবি মহাভারতকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যামদাস, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মহাভারতকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন, আবার কেউ আংশিক ভাবে অনুবাদ করেছিলেন। তবে বেশির ভাগ কবিই মহাভারতের দুই-এক পর্ব অথবা কোনো একটি পর্বের কোনো একটি বিখ্যাত কাহিনিকে অবলম্বন করেছিলেন। অশ্বমেধ পর্বের প্রতি এই সকল কবির যেন একটু বেশি আগ্রহ ছিল, কারণ অশ্বমেধ পর্বের বিভিন্ন পুথি বিভিন্ন কবির ভণিতায় পাওয়া গেছে। কেউ কেউ আবার ব্যাসের মহাভারতকে বাদ দিয়ে জৈমিনি ভারতের কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে সাহিত্যগুণের দিক থেকে এই সকল অনুবাদের বিশেষ কোনো গৌরব নেই। এগুলো শুধু সপ্তদশ শতকের অনুবাদ সাহিত্যে সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তবে এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৪.৪.৫ কবি পরিচয় নিত্যানন্দ ঘোষ

নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরাম দাসের পূর্বে মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। অনেকে আবার তাঁর লেখা মহাভারতকে কৃত্তিবাসের পূর্বে রচিত বলে মনে করেন। সমালোচকের এ ধরনের ধারণা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি বেশ প্রাচীন কবি এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কারণ সপ্তদশ শতকে (১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ) নকল করা নিত্যানন্দের একটি পুথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। নিত্যানন্দ ঘোষের কাব্য একসময় যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা তাঁর কাব্যের একাধিক পুথি থেকেই অনুমান করা যায়। কাশীরামের মহাভারতের সঙ্গে নিত্যানন্দের মহাভারতের বহু জায়গায় গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকী একই পুথিতে কাশীরাম ও নিত্যানন্দ উভয়ের ভণিতাই পাওয়া যায়। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্যই হয়তো বা কাশীরামের পুথিতে নিত্যানন্দের কোনো কোনো রচনা চলে গেছে। অল্পশিক্ষিত নকলনবিশেরাই এর জন্যে মূলত দায়ী। নিত্যানন্দ ঘোষ প্রতিভাধর কবি ছিলেন। তাঁর রচনা বিশেষ কোনো কাব্যগুণান্বিত নয় ঠিকই; তবে তা সহজ, সরল ও বাহুল্যবর্জিত। নিত্যানন্দের নামে মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের পুথি পাওয়া গেলেও তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্য মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেনি বলে বাঙালি পাঠকসমাজ তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন। তবে সীমিত ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ ঘোষ যে কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা স্বীকার করতে হবে।

৪.৪.৬ কবি পরিচয়- কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকী সপ্তদশ শতকে মহাভারত ছাড়াও রামায়ণ ও ভাগবতের যে সমস্ত অনুবাদ হয়েছিল, তাদের মধ্যেও কাশীরামই শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবি সম্পর্কে বলছেন- 'কৃত্তিবাসের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে গিয়ে বাঙালীর নিত্য স্মরণীয় হয়েছে, তিনি মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কায়স্থ-বংশীয় কাশীরাম দাস।' কাশীরামের বংশপরিচয় ও কাব্য রচনা নিয়ে এক সময়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনার কিছু কিছু নিদর্শন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় রয়েছে। কাশীরাম কৃত্তিবাসের অনেক পরবর্তী কালের কবি হলেও তাঁর কুল পরিচয়াদি নিয়ে কৃত্তিবাসের মতোই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এই কবি তাঁর মহাভারতের দুই-এক জায়গায় নিজের সম্বন্ধে একেবারে সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন। তার ফলেই এই জটিলতার সৃষ্টি। তবে তাঁর অগ্রজ-অনুজেরাও কমবেশি কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁদের কাব্যেও কাশীরাম সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা রয়েছে। সব মিলিয়ে কাশীরামের বংশ ও কাব্য রচনা নিয়ে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে কবিরা তিন ভাই-কৃষ্ণরাম, কাশীরাম ও গদাধর। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। তাঁর পৈতৃক পদবী ছিল দেব। কায়স্থবংশীয় কাশীরাম বিনয়বশত দেবের পরিবর্তে দাস ব্যবহার করেছেন। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। কাশীরামের জন্ম হয় বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে। গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এই কাব্য থেকে আরও জানা যায়, তিনি মেদিনীপুর জেলার আত্রাস গড়ের রাজার বাড়িতে শিক্ষকতা করতেন। কাশীরাম তাঁর গুরু হরিহরপুরের অভিরাম মুখোটির উপদেশে মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্রের নাম নন্দরাম দাস। তাঁর কোনো কোনো পুথিতে এই নন্দরামের ভণিতা আছে।

৪.৪.৭ কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঁচালি

কাশীরাম দাস অনুবাদ করতে গিয়ে সংক্ষেপে ব্যাসদেবের মূল কাহিনিকে অনুসরণ করেছেন, দুই-এক জায়গায় দুই-একটি আখ্যান নিজেও বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রচনার গুণে তাঁর সংযোজিত অংশও মূলের অনুবাদ বলেই মনে হয়। তাছাড়া নানা পুরাণ ও উপপুরাণ থেকেও তিনি তাঁর কাব্যের জন্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ফলে কাশীরামের মহাভারত ভাবানুবাদ পর্যায়ের হয়েছে। ব্যাসের মহাভারতকে বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে তিনি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রসন্ন ভঙ্গিতে পরিচ্ছন্ন ভাবে কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন। তবে কোথাও কোথাও তত্ত্ব ও নীতিকথাগুলোকে তিনি অবিকল অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচনা সহজ, সরল, সরস ও গতিময় হলেও চৈতন্যোত্তর যুগের প্রভাবে ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দ, সমাস-সন্ধি ও অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কাশীরাম যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তা প্রমাণিত হয় ব্যাসদেবের মহাভারতের সঙ্গে তাঁর কাব্যের ভাষাগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের ফলে। সুতরাং অত্যন্ত সংস্কৃত-প্রভাবিত বলে তাঁর কাব্যের ভাষা ও রচনারীতি মাঝে মধ্যে কিছু কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তিনি যদিও সাধারণ মানুষের বোধগম্য করেই মহাভারতের অনুবাদ করেছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো গ্রামীণ সরলতা তাঁর ভাষার বহু জায়গায়ই দুর্লক্ষ্য। তাছাড়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালির ঘরোয়া রূপ যতটুকু ফুটে

উঠেছে, ততটা বাঙালিয়ানা কাশীরামের কাব্যে ছিল না। তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, কাশীরাম যখন মহাভারত অনুবাদ করতে শুরু করেন, তখন সাহিত্যের আদর্শ ছিল চৈতন্যদেব প্রভাবিত উত্তরাপথের আদর্শ। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কাশীরামের রচনায় তৎসম শব্দপ্রাধান্য, সমাস-সন্ধি-অলংকারের অতিরেক ইত্যাদি চলে এসেছে। কৃত্তিবাসের মতোই তিনি পাঁচালির ঢঙে মহাভারত লিখেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে ক্লাসিক রীতি যুক্ত হয়ে কবির গ্রন্থন নৈপুণ্যকে বিশেষ মানদণ্ড সম্পন্ন করে তুলেছে।

কাশীরামের মহাভারতের দুই-একটি পুথিতে সন-তারিখ জ্ঞাপক পয়ারের নির্দেশ আছে। তা থেকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৬০২-০৩ ও ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের ইঙ্গিত পেয়েছেন। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে কাশীদাসী মহাভারতের নকল করা একটি পুথি পাওয়া গেছে। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কাশীরামের একটি পুথিতে ১০০২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ এবং আরেকটি পুথিতে ১০২০ বঙ্গাব্দ বা ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, কাশীরাম ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মূল মহাভারত অবলম্বনে ভারত পাঁচালি অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু কাশীরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেছেন কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত কাশীরামের কোনো কোনো পুথিতে রয়েছে যে, মহাভারতের আদি পর্ব, সভা পর্ব, বন পর্ব ও বিরাট পর্বের কিছুটা রচনা করার পর কাশীরাম পরলোকগমন করেন। এবং মৃত্যুকাল নিকটবর্তী দেখে কাশীরাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের ওপর অসম্পূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে যান। তবে কাশীরাম-অনুজ গদাধর বলেছেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরাম শুধু চারটি পর্ব নয়, সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন। তবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতো কাশীরাম-বিশেষজ্ঞরা বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে মাত্র চারটি পর্ব রচনা করার পর তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। কবির বংশের সকলেই কমবেশি কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফলে বিশেষজ্ঞদের মতে কবির তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা মিলে কাব্যটি সমাপ্ত করেন। প্রথম চার পর্ব কাশীরামের রচনা বলে কাহিনির বাঁধুনি প্রশংসনীয়, রচনাও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তার পরের পর্বগুলি বিভিন্ন লোকের রচনা বলে তাতে নানা ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতি ঘটেছে। তবুও কাশীরামের মহাভারত যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতোই খ্যাতি লাভ করেছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কাশীরাম দাস সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— 'মহাভারত-মহাসাগর সন্তরণ করা অতি দুরূহ, বিশেষতঃ বাংলার মতো প্রাদেশিক ভাষায়। সেই বিশালকায় মহাগ্রন্থকে কবি কাশীরাম বাঙালির উপযোগী করে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। তাই এই কায়স্থ কবিকে বাংলার ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরাও মহাসম্মানে শিরোধার্য করেছেন।'

৪.৫ ভাগবতের অনুবাদ

মধ্যযুগে রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্য দুটির অনুবাদের পাশাপাশি একটি পুরাণেরও অনুবাদ হয়েছিল এবং তার নাম ছিল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। এটি অন্যান্য প্রধান পুরাণদের মধ্যে অন্যতম। সংস্কৃতে রচিত আঠারোটি মহাপুরাণ রয়েছে। যেমন ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ,

ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি। আবার উপপুরাণ গ্রন্থের সংখ্যাও আঠারোটি। যেমন আদিপুরাণ, নরসিংহপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি। সমস্ত পুরাণেরই রচয়িতা হিসেবে মহাভারতকার বেদব্যাসকে মান্যতা দেওয়া হয়। তবে এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে, ব্যাসদেব নন, বোপদেব হেমাদ্রি ভাগবত পুরাণের রচয়িতা এবং চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি রচিত হয়। কিন্তু অন্য সমালোচকদের অভিমত এই যে, ভাগবতপুরাণ চতুর্দশ শতকেই বাংলাদেশে প্রচারলাভ করেছিল। অতএব এর অনেক আগেই যে এটি রচিত হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য। আনন্দতীর্থ মাধব নামে এক টীকাকার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন। তাছাড়া একাদশ শতকের গোড়ার দিকে পর্যটক আলবেরুনি আরবি ভাষায় রচিত ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গ্রন্থ ভাগবত পুরাণের উল্লেখ রয়েছে। এই সমস্ত তথ্য থেকে সমালোচকেরা মনে করেন যে এর রচনাকাল দশম শতকেরও পূর্বে। তবে গবেষকদের মতে অষ্টম শতকের কাছাকাছি সময়ে ভাগবত পুরাণ রচিত হয়েছিল। ভাগবত বারোটি স্কন্ধে সম্পূর্ণ। এতে রয়েছে ৩৩২টি অধ্যায় এবং ১৮,০০০ শ্লোক। গ্রন্থে শুধু দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও পরবর্তী কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাকি নয়টি স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা-বহির্ভূত গল্প-আখ্যান এবং তত্ত্বকথা স্থান লাভ করেছে। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি এবং একাদশ স্কন্ধে যদুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের দেহত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। আর দ্বাদশ স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী ও রাজা পরীক্ষিতের কথোপকথন বর্ণনা করে সূত গোস্বামী ঋষিদেরকে কলিযুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। ফলে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দশম-একাদশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। আসলে কৃষ্ণলীলা ভাগবত পুরাণের খণ্ডাংশ, কিন্তু এই খণ্ডাংশের জন্যই ভাগবতের এত জনপ্রিয়তা। ফলে বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাগবত পুরাণের শুধু কৃষ্ণলীলা-সমন্বিত স্কন্ধই অর্থাৎ দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত অনুদিত হয়েছে। বাংলাদেশে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ আরম্ভ হয় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই। ভাগবত-অনুবাদকদের মধ্যে মালাধর বসু শ্রেষ্ঠ কবি। তারপর ভাগবতাচার্য, মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, শঙ্কর কবিচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য কবিও ভাগবত-অনুবাদে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

৪.৫.১ কবি পরিচয়-মালাধর বসু

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে সংস্কৃত ভাগবত পুরাণ বাংলায় অনুদিত হতে শুরু হয়। মালাধর বসু প্রথম অনুবাদক ছিলেন। তিনি ভাগবতের কিছু অংশ অনুবাদ করে বাংলার জনগণকে ভাগবত পুরাণ সম্পর্কে পরিচিত করিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলে যাননি। ফলে কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। সেই যৎসামান্য তথ্য থেকে জানা যায়, মালাধর বসু বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম এক সময় চৈতন্যসংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতা ইন্দুমতী। তাঁর পুত্রের নাম সত্যরাজ খাঁ। কবির পৌত্র রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কয়েক বছর আগে মালাধর বসু ভাগবতের দুটি স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। অতএব তিনি প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি ছিলেন। তাঁর অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে বিখ্যাত।

৪.৫.২ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'

মালাধর বসু ভাগবত পুরাণের শুধু দশম ও একাদশ স্কন্ধ গ্রহণ করেন এবং বাংলায় তা অনুবাদ করেন। ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের জন্য এক আকর গ্রন্থ। সেটারই অংশ বিশেষ অনুবাদ করে মালাধর বাংলাদেশে বৈষ্ণব মতের সূচনা করেন। তাই স্বয়ং চৈতন্যদেব স্বচক্ষে না দেখলেও এই কবিকে বিশেষ সম্মান করতেন। মালাধরের ছাপা গ্রন্থে কাব্যের রচনা কাল জ্ঞাপক কয়েক ছত্র রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৩৯৫ শকাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা হতে আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১৪০২ শকাব্দে; অর্থাৎ ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মালাধর বসু ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। এই সন-তারিখ যদি ভুল না হয়, তাহলে সেই সময়ে গৌড়ের সুলতান ছিলেন রুকুদ্দিন বরবক শাহ। খুব সম্ভব এই রুকুদ্দিন বরবক শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। কারণ মালাধর রাজসরকারে উচ্চরাজকর্মচারী ছিলেন বলে শোনা যায়। তাছাড়া এই মুসলমান সুলতানও অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তবে উক্ত সন-তারিখ হাতে লেখা কোনো পুথিতে পাওয়া যায় না। তাই এর প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়। তবে এতটুকু বলা যায়, মালাধর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছিলেন।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কোনো কোনো পুথিতে 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও উল্লিখিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের বিজয়ের অর্থ সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণর গৌরবকাহিনি বা মঙ্গলকথা। এই কাব্যটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলেও বৈষ্ণব সমাজের বাইরে হয়তো এর বিশেষ প্রচার ছিল না। মালাধর ভাগবতের দুটি স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধে যথাক্রমে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত এবং কৃষ্ণের দেহত্যাগ ও যদুবংশ ধ্বংস ইত্যাদি ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেছে। তাছাড়া এতে নানা তত্ত্বকথা কৃষ্ণ ও উদ্ধবের আলোচনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তবে মালাধর তাঁর অনুবাদে কাহিনিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, তত্ত্বাংশ অনেকটা খর্ব করেছেন। খুব সম্ভব সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই তিনি এমনটা করেছেন। কারণ নানা গভীর তত্ত্ব ও তথ্যভারে পরিপূর্ণ সমগ্র ভাগবত জনসাধারণের রুচিকর হবে না ভেবেই তিনি হয়তো বা ভাগবতের দশম ও একাদশের সমস্ত বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ভাবে অনুবাদ করেছেন। মালাধর বসু সহজ সরল ভাষায়, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে ভাগবতের অংশবিশেষের মূল ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এই কাব্যে ভাগবতকে মূলত অনুসরণ করলেও লোকপ্রচলিত কাহিনিকেও সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যটি ভাবানুবাদ পর্যায়ের হয়েছে। এই কাব্যে ঘটনা বর্ণনা ছাড়া বিশেষ আর কোনো গুণ দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— শিল্পবস্তু হিসেবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় তেমন কিছু গুণান্বিত না হলেও বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্যের এটি যে প্রবেশক গ্রন্থ তা স্বীকার করতে হবে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কোনো কোনো জায়গায় বাঙালি জীবনের পরিচয় রয়েছে। বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, প্রথা ও সংস্কার, দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সমস্তই কবি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ উত্তর ভারতের কৃষ্ণকাহিনিকে মালাধর বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির অনুকূলে বর্ণনা করেছেন। তবে ভাগবতের আদর্শেই তিনি মূল চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কন করেছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৫.৩ ষোড়শ শতকের ভাগবতেব অনুবাদক

ষোড়শ শতকে ভাগবত অনুবাদক হিসেবে কয়েকজন কবির আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা হলেন ভাগবতাচার্য, মাধবাচার্য, দুঃখী শ্যামদাস প্রমুখ। এখানে ভাগবতাচার্যের কথা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪.৫.৪ কবি পরিচয়- ভাগবতাচার্য

ভাগবতাচার্য ষোড়শ শতকে ভাগবতের সব স্কন্ধ অনুবাদ করেন। তাঁর কাব্যের নাম 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'। কাব্যটি ভাগবত পুরাণের সারাৎসার এবং আকারে বড়। তাঁর আসল নাম ছিল রঘুনাথ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে রঘুনাথের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, রঘুনাথ চৈতন্যদেবের পার্ষদ গদাধরের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথের ভাগবত পাঠ শুনে খুশি হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন। 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী' কাব্যটি মূল ভাগবত পুরাণের অনুবাদ। কবি এতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে ভাগবতের সার কথাকে তুলে ধরেছেন। ভাগবতের তাত্ত্বিক বর্ণনার পাশাপাশি লৌকিক বর্ণনাও কাব্যে স্থান পেয়েছে। এর রচনারীতি প্রশংসনীয়। কিন্তু মালাধর বসুর মতো জনপ্রিয়তা ভাগবতাচার্য লাভ করতে পারেননি। তবে তাঁর কাব্য মূল ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুবাদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

৪.৫.৫ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ভাগবতের অনুবাদক

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে যে সকল কবি ভাগবত অনুবাদ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সনাতন বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস, দ্বিজ হরিদাস, দুর্লভনন্দন, শঙ্কর কবিচন্দ্র, বলরামদাস, দ্বিজ মাধবেন্দ্র, দ্বিজ রমানাথ প্রমুখ। এই অনুবাদকদের মধ্যে অধিকাংশই ভাগবতের দুই-একটি স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন, নিজের মতো করে কাহিনিকে সাজিয়েছেন, আবার পুরাণ-উপপুরাণ থেকেও কাহিনি সংগ্রহ করেছেন। আবার কোনো কোনো কবি ভাগবতের সম্পূর্ণটা অনুবাদ করেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। তবে এঁদের মধ্যে কেউই পঞ্চদশ শতকের ভাগবত অনুবাদক মালাধর বসুর মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি।

৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলাদেশে অনুবাদ সাহিত্যের ধারা শুরু হয়। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত এই তিনটি ধারায় মধ্যযুগের অনুবাদকর্ম চলতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন, নিজেদের ধর্মের প্রতি হিন্দুর হারানো আস্থা পুনরুদ্ধার, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের ভারতীয় মহাকাব্য-পুরাণের স্বাদ আস্বাদন-

অনুবাদ সাহিত্যের প্রচলনের ফলে বাংলাদেশে এই কয়েকটি ব্যাপার সংঘটিত হয়।



৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- রামায়ণ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার কাব্য 'শ্রীরাম পাঁচালি' নামে বিখ্যাত।
- মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাস সম্পর্কে জানলাম।
- ভাগবত পুরাণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক মালাধর বসুর কাব্যগ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সেই গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হলাম।



৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। পঞ্চদশ শতক থেকে ...এই অনুবাদ সাহিত্যের সূচনার ফলে... স্বল্প শিক্ষিত অশিক্ষিতের দল ...এভাবে উত্তরটি লিখুন।

২। কৃত্তিবাস বাংলায় ...পাঁচালির আদর্শ ...এভাবে গুছিয়ে লিখুন।

৩। মালাধর বসু ভাগবত পুরাণের ...শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের বিজয়ের অর্থ... এভাবে লিখুন।



৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড° দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড° অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রামায়ণ সাহিত্যে অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাসের যে পরিচয় তুলে ধরুন।

২। মহাভারত সাহিত্যে কাশীরাম দাসের অবদান সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৩। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। ভাগবতাচার্যের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তৈরি করুন।

.....

অধ্যায় ৫ : মঙ্গলকাব্য-১

বিন্যাস ক্রম

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৫.২ পরিচিতি

৫.৩ মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫.৪ ঐতিহাসিক পটভূমি ও ক্রমবিকাশ

৫.৫ লৌকিক ও পৌরাণিক সূত্র

৫.৬ মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাজন

৫.৭ মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা

৫.৮ মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পদেবী, সর্পপূজার ইতিহাস ও মনসা-পরিকল্পনা

- ৫.৮.১ মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি ও গঠন (খণ্ড পরিকল্পনা)

৫.৯ মনসামঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়:

- ৫.৯.১ বিজয় গুপ্ত
- ৫.৯.২ নারায়ণ দেব
- ৫.৯.৩ বিপ্রদাস পিপলাই
- ৫.৯.৪ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

৫.১০ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর উৎস

- ৫.১০.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও কাহিনি

৫.১১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়:

- ৫.১১.১ মুকুন্দ চক্রবর্তী
- ৫.১১.২ মাণিক দত্ত
- ৫.১১.৩ দ্বিজ মাধব

৫.১২ অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার পরিচয় ও গঠন

- ৫.১২.১ অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনি

৫.১৩ অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়

- ৫.১৩.১ ভারতচন্দ্র রায়

৫.১৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৫.১৫ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৫.১৬ অতিরিক্ত পঠন

৫.১৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তারও আগে থেকে বাংলাদেশে ছড়া, ব্রতকথা ও পাঁচালির মধ্যে দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি বিজয় গুপ্তের হাতে এই শ্রেণির মৌখিক কাহিনি সংগতিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ লিখিত রূপ লাভ করে। মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শাখা মঙ্গলকাব্য ধারার সূচনার মূল কারণ, উচ্চ-নীচ দুই জাতির পারস্পরিক মেলবন্ধন। আমরা এই অধ্যায়ে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল-এই প্রধান তিন ধারার মঙ্গলকাব্যের সামগ্রিক পরিচয় সম্পর্কে অবগত হব।

৫.২ পরিচিত

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রথম 'মঙ্গলকাব্য' শব্দটির ব্যবহার করেন এবং তিনি মঙ্গলকাব্যের শ্রেণি ও কাব্যশাখার স্বরূপের প্রথম পরিচয় দেন। তবে, বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩)-এ কেতকা দাসের কাব্যকে 'মনসার ভাসান' ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যকে 'চণ্ডীকাব্য' বলেছিলেন।

সংজ্ঞা : মধ্যযুগের যে শ্রেণির কাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের বিভাজনে আখ্যানের মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-সমাজের প্রতিচ্ছবিকে পরিস্ফুট করা হয় এবং বিশেষ অন্ত্যজ দেবতার গুণকীর্তন করা হয়, তাকে মঙ্গলকাব্য বলা যেতে পারে।

৫.৩ মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই শ্রেণির কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলার জন্য কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পণ্ডিতরা ভেবেছেন-

১। এই কাব্যের কাহিনি পালা আকারে গাওয়া হত এবং সেই গানের সূচনা এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে পরের মঙ্গলবারে শেষ হত বলে একে মঙ্গলকাব্য বলা হয়। গানগুলি 'মঙ্গল রাগ'-এ গাওয়ার রীতি ছিল।

২। এই কাব্যে মঙ্গলদেবতার আরাধনা ও মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। দেবখণ্ড ও নরখণ্ড-এই দুই খণ্ডে বিভক্ত।

৩। এই শ্রেণির কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হয় বলেও কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়। 'মঙ্গল' শব্দটি শুভ বা কল্যাণ অর্থেই ব্যবহৃত।

৪। মঙ্গলকাব্য দেবখণ্ড ও নরখণ্ড-দুই খণ্ডে বিভক্ত। এর কাহিনি আখ্যানমূলক। উপভাষার উপর নির্ভর করে এর ভাষারীতি কোথাও কোথাও অশ্লীলতাদোষে পূর্ণ। প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দরীতিতে মূলত পালা আকারে রচিত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৪ ঐতিহাসিক পটভূমি ও ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পাল ও সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ও কৌলিন্য আধিপত্য প্রধান হয়ে উঠেছিল; অপরদিকে আদিতে যে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বাস ছিল তারা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য রূপে পরিগণিত হয়েছিল, যাদের পরিচয় আমরা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত 'চর্যাগান'-এ ডোম, শবর, হো, রূপে পেয়েছিলাম; তারা নগরে নয়, জঙ্গলে পাহাড়ের টিলায় বাস করত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্যের কারণে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ক্রমশ বিপন্ন হচ্ছিল। আবার তুর্কি (১২০২ বা ১২০৩) আক্রমণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ মানুষেরা নিজের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা ও অনার্য লোকবিশ্বাস থেকে নানান লৌকিক দেব-দেবীর কল্পনা ও পূজা করতে শুরু করে। যেমন মনসা, শীতলা, চণ্ডী, দক্ষিণরায়, কালিকা প্রভৃতি। ইসলামি আগ্রাসন প্রতিরোধে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট পালাগানগুলিই হল মঙ্গলকাব্য। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

"বৌদ্ধযুগের বিনাশের দিনে হিন্দুর সমাজ ও শিক্ষার আদর্শ বহুল প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইলে চাতুর্বর্ণকে বাঁচাইবার জন্য স্মৃতি ও পুরাণের অনুশাসন প্রয়োজন হইয়াছিল। বাংলা দেশে মধ্যযুগে যেমন রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির প্রাচীর তুলিয়া মুসলমান-প্রভাবিত হিন্দুসমাজকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনি এ-দেশের মঙ্গলকাব্যগুলি অনেকটা সংস্কৃত পুরাণের ছাঁচে রচিত হইয়াছিল এবং পুরাণের মতো বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও উপধর্মের সহায়ক হিন্দুসমাজকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় খণ্ডে, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৬-৭, পৃ-৪)

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে গ্রামবাংলার দীর্ঘ পাঁচ'শ বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী হিন্দুর নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গঠনের প্রক্রিয়া-ই হল মঙ্গলকাব্য।

৫.৫ মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা-প্রধান ও অপ্রধান

প্রধান মঙ্গলকাব্য : মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল কাব্য।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য : দুর্গামঙ্গল (ভবানীপ্রসাদ, রূপনারায়ণ ও রামচন্দ্র), নদীর দেবী গঙ্গাকে কেন্দ্র করে গঙ্গামঙ্গল কাব্য (মাধব, দ্বিজগৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ), ষষ্ঠীমঙ্গল (কৃষ্ণরাম, রুদ্র রায় ও শংকর), গুটি বসন্তের দেবী শীতলাকে কেন্দ্র করে শীতলামঙ্গল (নিত্যানন্দ ও বল্লভ), কালিকামঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর (ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন ও সাবিরিদ খাঁ), সূর্যমঙ্গল, গোসানিমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, ভনানীমঙ্গল প্রভৃতি।

এখানে কেবলমাত্র লৌকিক দেবতাও নয়, ক্ষেত্রবিশেষে লোকসমাজে জনপ্রিয় পৌরাণিক দেবতারও মাহাত্ম্য প্রচার কাব্যের বিষয় হয়েছে।

৫.৬ লৌকিক ও পৌরাণিক সূত্র

লোকমুখে প্রচলিত ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালি ও কিংবদন্তি থেকে সৃষ্টি হলেও মঙ্গলকাব্যগুলি অনেকাংশে পুরাণপ্রতিম রচনা। মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণের মতোই আখ্যানমূলক রচনা। পুরাণ দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক রচনা; মঙ্গলকাব্যও তুর্কি-আক্রমণ কালে বাঙালি জাতির বিপর্যয় বিহ্বলতায় নবাগত অনার্য দেবদেবীর পায়ে আশ্রয়লাভ ও তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের মাহাত্ম্য বাখ্যান। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা লৌকিক দেবী, সে শিবের কন্যা, আবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী লৌকিক দেবী, সে শিবের ঘরণী; অপরদিকে শিব পৌরাণিক দেবতা, দেবাদিদেব। ফলে বলা যায়, আর্য-অনার্য তথা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মিলনের মধ্যস্থতার প্রয়াস হল মঙ্গলকাব্য।

প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের শুরু মূলত 'বন্দনাংশ' দিয়ে। পুরাণের দেব-দেবীর বন্দনার অনুসরণে-সূর্য, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সরস্বতী ও নির্দিষ্ট মঙ্গলদেবীর বন্দনা করা হয়। এমনকি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পৌরাণিক শ্লোকের ভাব ও ভাষাগত মিল দেখা যায়। যেমন— "গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম! পরমপুরুষ সারাৎসার..." —শ্রীগণেশ পুরাণের 'উপাসনা খণ্ড'-১ অনুসৃতি অন্নদামঙ্গলের 'গণেশ বন্দনা'য় এইভাবে দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের 'দেবখণ্ড' অংশটি মূলত পুরাণ, 'নরখণ্ড' অংশটি কাব্য। 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'বংশ', 'লোকশিক্ষা' প্রভৃতি অংশগুলিও পৌরাণিক সূত্রে রচিত। অপ্রধান কাব্যগুলির উপাস্য দেবতা পৌরাণিক হলেও প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই পৌরাণিক চরিত্রগুলি পৌরাণিক আবহেই রচিত, তাছাড়া লৌকিক চরিত্রগুলিকেও পৌরাণিক মাহাত্ম্যে অঙ্কিত করা হয়েছে।

৫.৭ মঙ্গলকাব্যের যুগবিভাজন

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে লোকমুখে প্রচলিত লোককাহিনিগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয় গুপ্তের হাতে লিখিত রূপ লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের 'নতুন মঙ্গল' রচনা পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত সময়কাল। বহু ধারা-উপধারায় বিভাজিত এই কাব্য শাখার আলোচনায় সময়ের পারম্পর্যে যুগবিভাজন অত্যন্ত প্রয়োজন। মধ্যযুগের বাঙালির প্রবাদপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকে (১৮৮৬-১৫৩৩) মাথায় রেখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গবেষকেরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে যুগবিভাজন করেছেন। একইভাবে মঙ্গলকাব্যকে প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্য রূপে বিভাজন করা হয়। উভয় যুগের মঙ্গলকাব্যের মূল পার্থক্যগুলি হল—

প্রাক্-চৈতন্য মঙ্গলকাব্য	চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্য
পূজা লোলুপতার বর্হিপ্রকাশ	পূজার শোভনীয় কামনা
মঙ্গলদেবতার ক্রূর, আদিম, উগ্র, হিংস্র ও অনমনীয় আচরণ	মঙ্গলদেবতার নমনীয় আচরণ ও ভক্তি প্রভাবে বিনয়ী
বন্দনাংশে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক মঙ্গলদেবতার বন্দনা	চৈতন্যবন্দনা যুক্ত হয়েছে
মনসামঙ্গল কাব্য	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য, অন্নদামঙ্গল কাব্য

৫.৮ মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পদেবী, সর্পপূজার ইতিহাস ও মনসা-পরিকল্পনা

ঋগ্‌বেদে আছে সর্পদেবী মনসার নাম 'অর্হিবুধণ্য'। এছাড়া, বৌদ্ধগ্রন্থ 'বিনয়বস্তু' ও 'সাধনমালা'য় সর্পের দেবী 'জাঙ্গুলী'র প্রসঙ্গ আছে। একাদশ শতক থেকেই বঙ্গদেশে সর্পদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল থেকেই উত্তর ও পূর্ব ভারতে নাগপূজার প্রচলন ছিল। চৈতন্য পূর্ববর্তী কালেই মনসার আধিপত্যের পরিচয় পায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে, সেখানে আছে, 'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন'। দক্ষিণ ভারতের সর্পদেবী নাগাম্মা ও মঞ্চাম্মা এবং লৌকিক জাঙ্গুলীর মিশ্রণেই মনসার সৃষ্টি; যে বিষহরি ও পদ্মা নামেই গ্রামবাংলায় অধিক জনপ্রিয় ছিল।

পূর্ববঙ্গে একাধিক কবি রচিত মনসার পূজা ও ভাসান গান প্রচলিত ছিল। বাইশ জন কবির রচিত গানের সংকলন 'বাইশা' অত্যধিক জনপ্রিয় ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের অনার্য লৌকিক দেবী মনসা 'পদ্মা', 'কেতকা', 'বিষহরি' নামে পরিচিত। পূর্বেই চর্যাগানে যে ডোম, শবর, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষের পরিচয় পেয়েছি, তারা জঙ্গলে সর্পসঙ্কুল পরিবেশে বাস করত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যে এই অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ মানুষদের ধর্মাচরণে নানান বিধিনিষেধ ছিল। তাই, সাপের কামড়ে মৃত্যুর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক নির্ভরশীলতার বাসনা থেকে সাপের দেবী মনসার উত্থান ঘটেছিল লোকজীবনে।

৫.৮.১ মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি ও গঠন (খণ্ড পরিকল্পনা)

মনসামঙ্গল কাব্য দুটি খণ্ডে বিভক্ত-দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। প্রায় সব লেখকদের কাহিনি মূলত একই; অঞ্চলভেদে সামান্য রূপভেদ দেখা যায় মাত্র।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি মূলত মনসা ও চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্বের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। লৌকিক দেবী মনসা মর্ত্যে নিজ প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচলনের জন্য চম্পক নগরের চাঁদ বণিকের কাছে আনুগত্য চায়। অভিজাত, ব্যক্তিত্ববান চাঁদ ছিল বাণিজ্য ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং ধর্মপ্রাণ শৈব। মনসার পূজা দিতে সে অস্বীকার করলে, হিংস্র ক্রূর মনসা কুপিত হয়ে সর্বতো ভাবে তার ক্ষতিসাধন করে। ছয় পুত্র হত্যা, বাণিজ্য সামগ্রীসহ সপ্ততরী কালিদহে ডুবিয়ে দেওয়া, বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝাকে হত্যা করা ইত্যাদি ঘটনা মনসার প্রতিশোধ স্পৃহার প্রমাণ। এমনকি সে চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরকে বাসররাতে কাল নাগিনীর দংশনে হত্যা করে। পুত্রবধূ বেহুলা স্বামীকে কলার ভেলায় নিয়ে স্বর্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, স্বামী লখিন্দরকে জীবিত ফিরিয়ে আনার ইচ্ছায়। নানান জাগতিক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীতের দ্বারা সকল দেবতাদের সন্তুষ্ট করে স্বামীসহ শ্বশুর চাঁদ সওদাগরের ছয় সন্তান, সপ্ততরী ও সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে আনে। একমাত্র শর্ত থাকে চাঁদের দ্বারা মনসার পূজা দেওয়া। ছলে বলে কৌশলে মনসা যা পারেনি, বাৎসল্যের বশবর্তী হয়ে শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত চাঁদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঁ হাতে বেলফুল দিয়ে মনসার পূজা দেয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৯ মনসামঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিরা হলেন-বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, নারায়ণ দেব ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কাব্যরচনার কালজ্ঞাপক পরিচয় বিচারে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি বিজয় গুপ্ত। বিজয়গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের 'স্বপ্নাধ্যায়' অংশে বলেছেন-

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।।
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
ঘোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।"

তবে, হরি দত্তের কাব্যের কোনো পুথি এযাবৎ গবেষকরা পাননি। অনুমান করা যায়, বিজয় গুপ্ত হরি দত্তের কাব্যের পুথি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি ছিলেন। হরি দত্ত ছাড়াও অন্যান্য অপ্রধান কবিরা হলেন-রসিক মিশ্র, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, দ্বিজ বংশীদাস, ষষ্ঠীবর ও জীবন মৈত্র।

৫.৯.১ বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্ত বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত বরিশাল জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে, বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী। তিনি মনসার উপাসক ছিলেন এবং আঠাশটি পালায় বিন্যস্ত তাঁর কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। কাব্য রচনার কালজ্ঞাপক শ্লোক-"ঋতুশশী বেদ শশী পরিমিত শক"-থেকে জানা যায়, ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটির রচনা হয়েছিল। সংস্কৃত ও পৌরাণিক সাহিত্যে কবির গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। মনসার উৎপত্তি বিষয়ক অংশটি তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক।

পূর্ববঙ্গে রচিত হলেও সমগ্র বাংলায় বিজয় গুপ্তের জনপ্রিয়তার কারণগুলি হল-

১। বিজয়গুপ্ত ভাবপ্রধান অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ কবি ছিলেন। বাংলার ধুলিমলিন গ্রামজীবনে তার কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে, দেব চরিত্রগুলি তৎকালীন সমাজের মানবচরিত্র হিসেবে পরিণত হয়েছে।

২। চরিত্র নির্মাণে বিজয় গুপ্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চাঁদ চরিত্র দুর্জয় পুরুষকার ব্যক্তিত্ব, মনসার বিরুদ্ধে অনমনীয় দৃঢ়তার প্রতীক। কিন্তু পুত্রবধুর প্রতি স্নেহে বাঁ হাতে অনিচ্ছাসহ মনসার পূজা দিয়েছে। সনকা, বেহুলা ও মনসা-নারী চরিত্রগুলি অত্যন্ত যত্ন সহকারে রচিত, তারা বাঙালির পারিবারিক জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

৩। হাস্যরস ও করুণরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্ত সফল। তবে মানবরস, মানবতার জয়গান গেয়েছেন কাব্যে। দেবীশক্তির চক্রান্তে মানুষের পরাজয়ে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। দেবী মনসা তার কাছে হয়ে উঠেছেন, পাপিষ্ঠা, 'পাষাণ তার হিয়া'।

৪। সর্বজনগ্রাহ্য লোকজ ভাষার ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার করেছেন। স্বরবৃত্তের ঝোঁক শ্রুতিমধুরতা এনেছে। যেমন—

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকলে মাথায় ধরে নারী।
সভে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।"

৫.৯.২ বিপ্রদাস পিপলাই

সুকুমার সেনের মতে বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল কাব্যধারার সবচেয়ে প্রাচীন কবি। বিপ্রদাস পিপলাই চব্বিশ পরগণার বাদুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। 'মনসাচরিত' বা 'মনসামঙ্গল' নামেও তাঁর পুথি পাওয়া গিয়েছে। কবির পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত। তাঁর মূল পুথি বিলুপ্ত, প্রধান অনুলিপি দুটি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিশ্বভারতী পুথিশালায় রক্ষিত আছে। বিপ্রদাসের কাব্যরচনার কালজ্ঞাপক শ্লোক থেকে বোঝা যায় ১৪৯৪ খিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। শ্লোকটি হল-

"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।।
হেনকালে রচিলা পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া দ্রবিদ লোক পরম-পীরিত।।"

বিপ্রদাসের কাব্যের প্রধান গুণগুলি হল—

১। অন্যান্য মনসামঙ্গলের তুলনায় বিপ্রদাসের পালাগুলি সুপরিকল্পিত। 'হাসন-হুসেন পালা' সুলিখিত ও ঐতিহাসিক-সামাজিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিপ্রদাসের কাব্য সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "মনসাবিজয়' কাহিনিটি ঘটনা-বিস্তৃতি স্বচ্ছ, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ এবং বর্ণনা ভঙ্গিমা উৎকট আতিশয্য-বর্জিত।' কবির ভাষাভঙ্গি পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত।

২। মনসার চরিত্র নির্মম ও কঠোর। আবার তার মধ্যে করুণা ও স্নেহ সঞ্চার কবির অন্যতম কৃতিত্ব। বেহুলার বেদনা, সনকার বিলাপ ও চাঁদের দুর্গতি অত্যন্ত সংগত ভাবে চিত্রিত করেছেন কবি।

৫.৯.৩ নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেবের পূর্বপুরুষ রাঢ় বাংলা ত্যাগ করেছিলেন ('রাঢ় ত্যাজিয়া মোর বোরগ্রাম বসতি') এবং কবির জন্ম ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামে। পিতার নাম নবসিংহ, মাতা রুক্মিণী। কবিরা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কবির মনসামঙ্গল আসাম, শ্রীহট্ট এলাকায় এতই জনপ্রিয় ছিল যে, তারা নারায়ণ দেবকে তাদের কবি বলে দাবি জানায়। তাঁকে মনসামঙ্গল কাব্যের 'সুকবি বল্লভ' বলা হয়। অনেক পণ্ডিত তাঁকে বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক বললেও সুকুমার সেন নারায়ণ দেবকে ষোড়শ শতকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নারায়ণ দেবের কবিপ্রতিভা এবং 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের জনপ্রিয়তার জন্য যে কারণগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি—

১। নারায়ণ দেবের কাব্য অন্যান্য কবিদের তুলনায় দীর্ঘ এবং দেবখণ্ডের তুলনায় নরখণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। কবি ছিলেন সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যে অভিজ্ঞ। মহাভারত, শৈবপুরাণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাবে দেবখণ্ডকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর 'রতিবিলাপ' অংশটুকু কবিতা হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসনীয়-

"পতি শোকে রতি কান্দে লোটাইয়া ধরণী।
কেন হেন কর্ম কৈল দেব শূলপাণি।।"

২। নারায়ণ দেব শক্তিমঙ্গল কাব্য লিখলেও, তিনি ধর্মমতে ছিলেন বৈষ্ণব। তাই কাব্যের নানা স্থানে বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রভাব দেখা যায়।

৩। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে চাঁদ ও বেহুলা চরিত্রের গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। অন্যান্য কবিদের তুলনায় চাঁদের ব্যক্তিত্ব অনেক বলিষ্ঠ ভাবে ফুটে উঠেছে।

৪। নারায়ণ দেবের কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদান আছে প্রচুর। যেমন, চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা, নানা দেশ ও নদনদীর বিবরণ, সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতি প্রভৃতি বাংলাদেশের লৌকিক ও বাস্তব জীবনচিত্রের পরিচয়ে তাঁর কাব্য এক সামাজিক দলিল।

জনপ্রিয়তার কারণে লিপিকরদের হস্তক্ষেপে বারবার অনুলিপি হয়েছে নারায়ণ দেবের পুথি। বহু অর্বাচীন শব্দ ও উপাদান যুক্ত হয়েছে তাতে। পরবর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অগ্রজ কবি নারায়ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে লিখেছিলেন-

"... ... ... দৈব নারায়ণ তুমি।
তোমারে সেবিয়া ধর্ম হইলাম আমি।।"

৫.৯.৪ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস সপ্তদশ শতকের কবি। ক্ষেমানন্দ কবির নাম, পদবী মণ্ডল। মনসার দাস অর্থাৎ 'কেতকাদাস' হল কবির উপাধি। তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, কবি বর্ধমানের উত্তরে পানাগড়ের কাঁথরা বা কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবিরা ছিলেন কায়স্থ। পিতা শঙ্কর স্থানীয় ফৌজদার বারা খাঁর অধীনে চাকরি করতেন। মনসার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন-

"ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গ্যায়া বোল।"

ক্ষেমানন্দের কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদান যেমন, বারা খাঁ, ভারামল্ল ও কেশমল্লের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে (১৬৭৫-৮০) কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গলের' যথেষ্ট প্রভাব আছে। ক্ষেমানন্দের 'মনসাবিজয়' কাব্যের গুরুত্বের দিকগুলি হল-

১। ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের কাহিনিটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারে বলেছেন, এটাই তাঁর কাব্যের বড় গুণ। নরখণ্ডের শুরুতেই চাঁদের পূজা না পাওয়ায় মনসার ক্ষোভের কথা এসেছে। এরপর বিভিন্ন পালার মধ্যে দিয়ে মূল কাহিনিটি সমাপ্ত করেছেন।

২। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে ক্ষেমানন্দের কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বেহুলা চরিত্র একেবারে কোমল, সুন্দরী অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বেহুলার দুঃখ, মনসার ঈর্ষাকাতর রূপ কবি বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছেন।

৩। ক্ষেমানন্দের কাব্যে ভৌগোলিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে গঞ্জ, নগর ও বন্দরের নামের মধ্যে। অন্যান্য কবিরা যেখানে স্বর্গের বন্দরের নাম ব্যবহার করেছেন, সেখানে ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন বন্দরকে বেছে নিয়েছেন। বেহুলার যাত্রাপথেও গোবিন্দপুর, কাটোয়া, বর্ধমান, নারকেলগ্রাম, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া যায়।

৪। ক্ষেমানন্দের কাব্যের মূল রস করুণ রস। তাঁর 'মনসাবিজয়' দুখের নকশি কাঁথা।

৫। পূর্ববর্তী কবিদের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষেমানন্দ নতুনত্ব দেখিয়েছেন। পদ্ম পাতায় নয়, কেয়া পাতায় মনসার জন্ম বৃত্তান্ত, যা তিনিই প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া, পৌরাণিক আখ্যান প্রীতি না দেখিয়ে তিনি উত্তর ভারতের লোকমুখে প্রচলিত কাহিনিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

'মনসা বিজয়' চৈতন্য পরবর্তী রচনা হওয়ায় আগের কবিদের মতো মনসা নৌকা ডোবানো বা চাঁদের অনিষ্ট করার পর ক্রূর হাসছেন না, করছেন আক্ষেপ। এই পরিবর্তন বৈষ্ণব প্রভাবেই এসেছে, ফলে বৈষ্ণব সমাজেও এই কাব্যের জনপ্রিয়তা ছিল। মধ্যযুগের যে কাব্যটি সর্বপ্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল সেটি ক্ষেমানন্দের 'মনসাবিজয়'; আর তার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তার জনপ্রিয়তা সহজ হয়েছিল।

৫.১০ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর উৎস

'চণ্ডী' শব্দটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডিকা দেবীর উল্লেখ আছে। 'চণ্ড' নামক দানবকে বিনষ্ট করেছেন বলে দেবী 'চণ্ডী'। এই চণ্ডী দেবী দুর্গার রূপবিশেষ। আবার দ্রাবিড় ওঁরাওদের শিকারের দেবীও চণ্ডী। কালকেতুর কাহিনি থেকে জানা যায় চণ্ডী ব্যাধদের দেবী ছিলেন। তবে পুরাণ, দ্রাবিড় বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির নারীদেবীর সংমিশ্রণে বাংলার লোকসমাজে মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীর গঠন বলা যেতে পারে। গ্রামবাংলার ব্রতকথায় চণ্ডীর উল্লেখ সুপ্রাচীন কাল থেকেই আছে-শুভ চণ্ডী বা সুবচনী, ওলাই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। কৃষি ও অরণ্য-উভয় সভ্যতার প্রেক্ষিতে চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলময়ী, মূলত অভয়া। দেবী অনার্য ব্যাধ সমাজে প্রথম, তারপর বণিক সমাজে নারীদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন। বিবিধ সাংস্কৃতিক সমন্বয় অর্থাৎ পুরাণ ও লোকপুরাণ, ব্রাহ্মণ্য ও অ-ব্রাহ্মণ্য উপকরণে এই কাব্যের চণ্ডী গঠিত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকেই যে মাতৃকা শক্তির পুজোর প্রচলন, তারই পরিচয় দুর্গা ও চণ্ডীর অভিন্ন পরিচয়ে দেখা যায়।

৫.১০.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও কাহিনি

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত-'দেবখণ্ড' ও 'নরখণ্ড'। নরখণ্ডে আছে কালকেতুর গল্প নিয়ে 'আখেটিক খণ্ড' আর ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প নিয়ে 'বণিক খণ্ড'। চণ্ডীমঙ্গলের

দেবখণ্ডে হরপার্বতীর দাম্পত্য জীবনের কথা বর্ণিত। চণ্ডীর কৌশলে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে আগমন, কালকেতুরূপে ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ। নীলাম্বর-পত্নী ছায়ার ফুল্লরা রূপে ব্যাধ-সঞ্জয় কেতুর গৃহে জন্মলাভ, পরবর্তীকালে উভয়ের বিবাহ, সুখের নীড় রচনা, অকস্মাৎ দেবী চণ্ডীর সতীনরূপে সুখী দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি করা, পরিশেষে দেবীর আত্মপরিচয়দান এবং কালকাতুর প্রতি সন্তুষ্টি ও আশীর্বাদ দিয়ে নরখণ্ডের অন্যতম ভাগ আখেটিক খণ্ড শেষ হয়েছে। নরখণ্ডের অপর ভাগ বণিক খণ্ডে উজানি নগরের সওদাগর শৈব ধনপতির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ফুল্লরা, লহনা ও শ্রীমন্তকেন্দ্রিক এই কাহিনিটিতে সওদাগর ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক দুর্বিপাকে পড়ে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়ে যে ভাবে সমস্যা থেকে উদ্ধার পেল, তার দীর্ঘ আখ্যান আছে।

৫.১১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয় কাব্যশাখা হল চণ্ডীমঙ্গল। লৌকিক দেবী স্বরূপ চণ্ডীকে নিয়ে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনির লিখিত রূপদান করেছেন বহু কবি। তবে, তাদের মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্য, রচনারীতি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রেখেছেন। নিম্নে এই কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৫.১১.১ মুকুন্দ চক্রবর্তী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবির আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির জন্ম এবং তাঁর পিতা ছিলেন হৃদয় মিশ্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয় তাঁর পরিবার এবং কবিকে ভিটেছাড়া হতে হয়। বাঁকুড়ার রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দেন। তার পুত্র রঘুনাথ রায়ের প্রেরণায় এবং দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' রচনা করেন। কবি প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, কাব্যটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হল—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।"

এই তথ্য অনুসারে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে 'অভয়ামঙ্গল' রচিত বলে মত দিয়েছেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় ড. ভট্টাচার্যের মত সমর্থন করেছেন। যদিও সুকুমার সেন মনে করেন ১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

কেবল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নয় মধ্যযুগের বাংলা কবিদের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় এবং কবিত্বগুণে মহৎ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে অন্যান্য কবিরা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্বের কারণগুলি হল—

১। মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন, তা 'অভয়ামঙ্গল'কে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এই অংশটিতে

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

২। মূলত মাণিক দত্তের থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও, কবির মৌলিক প্রতিভায় প্রচলিত কাহিনিটি চিত্তাকর্ষক ও সাহিত্যগুণে মণ্ডিত হয়েছে। কাহিনি হয়েছে বাংলাদেশের সমাজঘনিষ্ট, দেবতা চরিত্রগুলি মানবিক হয়ে উঠেছে। তিনি মধ্যযুগের বাস্তববাদী কবি। তাই কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহ, পশুদের ক্রন্দন, গুজরাট নগর পত্তন, ভাড়ু দত্তের শঠতা-প্রভৃতি অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তীর বাস্তব দৃষ্টি ও জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে।

৩। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভাড়ু দত্ত, মুরারী শীল বা দুর্শলা দাসী চিরকালীন টাইপ চরিত্রের নিদর্শন হয়ে আছে। খুল্লনা লহনা ফুল্লরা প্রভৃতি নারী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কবির পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র নির্মাণে এখানেই কবির আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। মধ্যযুগীয় বাতাবরণে পশুদের ক্রন্দনে আসলে অভয়ামঙ্গলের অসহায় নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। অন্ন সংস্থানের জন্য ভিক্ষাযাত্রা সমকালীন বাঙালির অর্থনৈতিক পরিচয়কেই ফুটিয়েছে। কবি দুঃখ রসের কবি হলেও হাস্যরস সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। ফলে দুঃখ বেদনায় তাঁর কাব্য ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী কবি কৃতিত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.১১.২ মাণিক দত্ত

মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি ছিলেন, তাঁর কাব্যের নাম 'ভবানীমঙ্গল' বা 'দুর্গামঙ্গল'। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মালদার মানুষ ছিলেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

"মাণিক দত্তেরে আমি করিয়া বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।"

তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি খঞ্জ ও বধির ছিলেন এবং দেবী চণ্ডীর কৃপায় স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। তিনি বিজয় গুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কাব্যের আখ্যান নির্মাণ করেছিলেন। কেবল মনসার পরিবর্তে শক্তিদেবী চণ্ডীর মহিমা এখানে বন্দনা কীর্তিত করেছেন।

৫.১১.৩ দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধবের জন্মস্থান নবদ্বীপ, মতান্তরে সপ্তগ্রাম। আবার কবির সব পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিল নিশ্চিত ভাবে বলা অসম্ভব। আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য 'সারদামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত' রচিত হয়েছিল। দেবখণ্ড, আখেটিক ও বণিক খণ্ড-এই তিন ভাগেই তাঁর কাব্যটি বিন্যস্ত, আসলে তিনি মাণিক দত্তের অনুসরণেই কাব্যরচনা করেছিলেন। তাঁর আখেটিক ও বণিক খণ্ড পরিমিত রচনা।

দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন ও দ্বিজ হরিনাম প্রমুখ কবিরা হলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার অপ্রধান কবি। এদের সকলের প্রতিভা ও কবিকৃতিত্ব মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

৫.১২ দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার পরিচয় ও গঠন

অন্নদা বা অন্নপূর্ণা কৃষিভিত্তিক সমাজে খাদ্য ও পুষ্টির দেবী, সমৃদ্ধির প্রতীক। অন্নপূর্ণা হচ্ছেন শক্তির অপর রূপ, তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া অর্থাৎ পার্বতী। দেবী পার্বতী ভিক্ষারত শিবকে অন্নদান করে এই আখ্যায় ভূষিত হন। কবি ভারতচন্দ্র অন্নদার মাহাত্ম্য রচনার সময় কাশীখণ্ড উপপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, বিলহনের চৌরপঞ্চাশিকা, ক্ষিতীবংশাবলীচরিতম্ ও লোক প্রচলিত অন্নদার কাহিনিসূত্র অবলম্বন করেছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত-অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য, বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল ও মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিন খণ্ডে বিন্যস্ত হলেও 'অন্নদামঙ্গল' অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের কাহিনি মঙ্গলকাব্য অনুসারী। পরবর্তী দুটি খণ্ড-বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ মঙ্গলকাব্য ধারার বিচ্ছিন্ন কাহিনি বলা যায়।

৫.১২.১ অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনি

অন্নদামঙ্গল কাব্যের শুরুতে গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা বন্দনা করা হয়েছে। তারপর 'গ্রন্থ সূচনা' ও 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা'র পর গীতারম্ভ অংশ থেকে মূল কাব্যের কাহিনি শুরু হয়েছে এবং 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' দিয়ে অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত হয়েছে।

কবির আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার কীভাবে অন্নপূর্ণার কৃপা লাভ করে রাজত্ব লাভ করেছিলেন, তা বর্ণনা করাই এ কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। বাংলার শাসক আলিবর্দির সময়কালে মুঘল সেনাবাহিনী ভুবনেশ্বর আক্রমণ করে মন্দির ধ্বংস করলে মহাদেব ক্রুদ্ধ হন এবং বর্গী ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলাদেশের মুসলমানদের লুণ্ঠন করে শাস্তির আদেশ দেন। এরপর রাজাকৃষ্ণচন্দ্র খাজনা দিতে না পারায় আলিবর্দির কাছে বন্দী হয়, এবং দেবী অন্নদার শরণ নিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পান। এরপর শিব-পার্বতীর পৌরাণিক অনুষঙ্গ এবং ব্যাসদেবের কাশী নির্মাণে ব্যর্থতা ও দুর্গতির কাহিনি এসেছে। অপরদিকে হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপা বর্ণিত হয়েছে।

৫.১৩ অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়

কাব্যশৈলীর পরিচয়ে মধ্যে যুগের সবথেকে আকর্ষণীয় রচনা হল 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক অনুসরণ নয়; আধুনিক মানসিকতার কবি পালক রাজার নির্দেশ রক্ষার স্বার্থে রচনা করলেন 'নতুন মঙ্গল' কাব্য। বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য, রাজসভার কবি সুলভ হাস্যরস ও আদিরসের ব্যবহারে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে যুগসন্ধির কাব্য রচনা করে বিরল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নে অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল।

৫.১৩.১ ভারতচন্দ্র রায়

মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগের (অষ্টাদশ শতক) কবি ভারতচন্দ্র। হাওড়া ও হুগলি জেলার অন্তর্গত পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জমিদার বংশে কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। পরিবারের সঙ্কটের কারণে মাতুলালয় নওয়াপাড়ায় বাল্যশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন এবং সংস্কৃত ও ফারসি শেখেন। ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণে বর্ধমান রাজের খাজনা না দিতে পেরে কারারুদ্ধ হন এবং কটক, নীলাচল হয়ে চন্দননগরের ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অনুকম্পায় নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে রাজসভায় স্থান দেয়। মূলাজোড় গ্রামের ইজারা এবং মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা শুরু করেন-

"নতুন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।"

১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে কবি 'অন্নদামঙ্গল কাব্যটি রচনা করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের থেকে 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতচন্দ্রের কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেছেন— "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" কবি ভারতচন্দ্র নিজে এই কাব্যটিকে 'নতুন মঙ্গল' আখ্যা দিয়েছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্যটির প্রসঙ্গে বলেছেন— "ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়— অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়াও অন্যান্য রচনাগুলি হল- 'সত্যপীরের কথা', 'রসমঞ্জরী', 'নাগাষ্টক' প্রভৃতি। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়সীমাকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ধরা হয়। তাঁর কাব্যের গুরুত্বের দিকগুলি হল—

১। ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির কবি এবং তাঁর কাব্য যুগসন্ধির কাব্য। কারণ, মধ্যযুগের শেষ কাহিনিকাব্য অন্নদামঙ্গল হলেও এর মধ্যে আছে প্রচুর আধুনিক যুগের লক্ষ্মণ। এখানে পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের মতো ভক্তির উচ্ছ্বাস নেই বরং কবির আত্মসচেতনতার পরিচয় আছে অনেক। মঙ্গলকাব্যের কাঠামো অনুসরণ করেও গঠনশৈলীতে নানান নতুনত্ব এনেছেন ভারতচন্দ্র। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম ভুজঙ্গ প্রয়াত ও তূণক-এর মতো সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। পালক রাজার পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্যকীর্তন এখানে প্রধান হয়েছে, দেবীর মাহাত্ম্য নয়। তথাপি, সমকালীন অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক ডামাডোল ও দূরবস্থার নিখুঁত চিত্রাঙ্কন করেছেন কবি।

২। নতুন মঙ্গল অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের ধরাবাধা ছাঁচ নয়, গতানুগতিক আখ্যান নয়, কাহিনি ধারা ও গঠন কৌশল উভয় ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র নিজ ইচ্ছায় নতুনত্ব এনেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সভাকবির পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, রুচি, হাস্যরস-বোধ, ভাষা, ছন্দ ও

অলঙ্করের শিল্পিত নান্দনিক ও অভিনব প্রয়োগ সত্যিই তাঁর কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' করে তুলেছে।

৩। ভারতচন্দ্রের হড়িহোড়, ঈশ্বরী পাটনি চরিত্র অমর সৃষ্টি। শিব, ব্যাস, অন্নদার চরিত্রচিত্রণ আধুনিক আখ্যানের কথা মনে করিয়ে দেয়। চরিত্রের মনস্তত্ত্বের উন্মোচন তাঁর কাব্যেই দেখা যায়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' বহু বাক্য আজও প্রবাদ প্রবচনের চিরন্তনতা পেয়েছে। যেমন- 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?" তাঁর কাব্যে অসাম্প্রদায়িক উদার চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়-

"হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন আছে সেই ভক্ত ধীর।।"

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কাব্য হিসেবে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের গুরুত্ব অপরিসীম; যুগসন্ধির কবিই কেবল নয়, মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র।



৫.১৪ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

মঙ্গলকাব্যগুলি দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে। তাই আমাদের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের যে তথ্য এতে পাওয়া যায় তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। কালক্রমে মঙ্গলকাব্য রচনার একটা প্রায় সু-নির্দিষ্ট প্রণালী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সব মঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু এবং রচনারীতি প্রায় একই ধরনের। সব মঙ্গলকাব্যের কবিরাই দেবতাদের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁদের মহিমা প্রচারে ব্রতী হয়ে নিজেদের লেখনী ধারণ করেছেন। সব নায়ক নায়িকাই শাপভ্রষ্ট অমর্ত্যলোকবাসী। নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সকলের দুর্গতি মোচন হয় দেব-দেবীর অনুগ্রহে। পূজা প্রচার শেষে তাঁরা ইহ জীবন ত্যাগ করে আবার দেবলোকে ফিরে যান। সেই সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মাণ, হনুমান কর্তৃক বিক্রম প্রদর্শন ও মল্লযুদ্ধ শিক্ষাদান; ভীম কর্তৃক দুরূহ কাজ সম্পাদনা, নায়ক-নায়িকার অলংকার শাস্ত্রানুমোদিত রূপ বর্ণনা, কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ, কুল-কামিনীর পতিনিন্দা, বিরহিণীর বারমাস্যা, রন্ধন বিবরণ, দেবমহিমা সূচক চৌত্রিশা স্তব ইত্যাদি রচনা পদ্ধতি প্রায় এই রকম বৈচিত্র্যহীন।



৫.১৫ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

ক) মধ্যযুগের যে শ্রেণির কাব্যে দেবখণ্ড ...এভাবে গড়ে তুলুন।

খ) মনসামঙ্গল কাব্য দুটি খণ্ডে ...মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি মূলত ...এভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন।

গ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার ...মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভাড়ুদত্ত ...এভাবে লিখুন।



৫.১৬ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড° দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড° অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



১.১৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

মঙ্গলকাব্য

১। মঙ্গলকাব্যের কাব্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। মঙ্গলকাব্য রচিত হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করুন।

৩। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিন।

৪। মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের পরিচয় দিন।

৫। চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক পরিচয় দিন।

মনসামঙ্গল কাব্য

১। দেবী মনসার উৎপত্তির কারণ ও নামকরণের পরিচয় বিষয়ে লিখুন।

২। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিটি সংক্ষেপে লিখুন।

৩। মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বিজয় গুপ্তের কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

৪। মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে নারায়ণ দেবের মূল্যায়ন করুন।

৫। মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৬। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জনপ্রিয়তার কারণগুলি আলোচনা করুন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গঠন পরিকল্পনা ও কাহিনি বিন্যাসের পরিচয় দিন।

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'চণ্ডী'র উৎস আলোচনা করুন।

৩। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

৪। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল'-এর বিশেষত্বের কারণগুলি আলোচনা করুন।

৫। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার দু'জন অপ্রধান কবির কাব্যের পরিচয় দিন।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

১। অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্নদার পরিচয় দিয়ে এই কাব্যের গঠনশৈলীর আলোচনা করুন।

২। অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

৩। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যকে 'নতুন মঙ্গল' কেন বলা হয়?

৪। ভারতচন্দ্রকে যুগসন্ধির কবি বলার তাৎপর্য বিচার করুন।

.....

অধ্যায় ৬ : মঙ্গলকাব্য-২

অধ্যায় বিন্যাস

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্ম ঠাকুরের উৎস
৬.৪ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি
৬.৫ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়
    ৬.৫.১ ময়ূরভট্ট
    ৬.৫.২ খেলারাম চক্রবর্তী
    ৬.৫.৩ রূপরাম চক্রবর্তী
    ৬.৫.৪ রামদাস আদক
    ৬.৫.৫ ঘনরাম চক্রবর্তী
    ৬.৫.৬ মাণিকরাম গাঙ্গুলি
৬.৬ শিবায়ন কাব্য ও শিবের উৎস
৬.৭ শিবায়নের কাহিনি
৬.৮ শিবায়ন কাব্যের কবি পরিচয়
    ৬.৮.১ শঙ্কর কবিচন্দ্র
    ৬.৮.২ রামকৃষ্ণ রায়
    ৬.৮.৩ রামেশ্বের ভট্টাচার্য
৬.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৬.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৬.১১ অতিরিক্ত পঠন
৬.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্টি ধারা হিসাবে ধর্ম মঙ্গলকাব্যের কাহিনি জানতে পারবেন।
- ধর্ম ঠাকুরের সম্যক পরিচয় পাবেন।
- শিবায়ন কাব্যের ধারা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

৬.২ পরিচিতি

সাহিত্যের প্রধান দুই অবধারক- দেশ আর কাল। আর এই দুয়ের ফলশ্রুতিতে বাংলায় যেমন মঙ্গল দেবতার উদ্ভব ঠিক তেমনি সাহিত্যে তার সার্থক রূপায়ণ। বাংলার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন অন্যতম। আলোচ্য অধ্যায়ে এই দুই মঙ্গলকাব্য ধারা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো।

৬.৩ ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্ম ঠাকুরের উৎস

লাল শালু কাপড় দিয়ে ঢাকা কূর্মাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি একখণ্ড পাথর ধর্ম ঠাকুরের বিগ্রহ হিসেবে পুজো করা হয়। এই ধর্ম ঠাকুর ধর্মরায়, কালুরায় বা যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে পূজিত হয়। 'রায়' শব্দের দ্বারা 'রাজ' বা রাজত্বকে ইঙ্গিত করে। নিম্নবর্গের, বিশেষত 'ডোম' জাতির লোকেরা পূজারী হন, তাদের 'দেয়াশী' বলা হয়। গ্রাম বাংলায় কোথাও প্রতিদিন বা কোথাও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাৎসরিক পুজোর রীতি আছে। রাঢ় অঞ্চল, বর্তমানে হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের পুজো আজো প্রচলিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্ম ঠাকুরের কথা প্রথম আলোচনা করেছিলেন; তাঁর মতে এই দেবতা 'ধর্ম' আসলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্ম ঠাকুরকে কূর্ম দেবতা বলেছেন। সুকুমার সেন থেকে গোপাল হালদার-অনেক পণ্ডিতই ধর্মকে সূর্যদেবতা রূপে দেখেছেন। তবে এ কথা বলা যায় যে, অনার্য দেবতা 'ধর্ম' যুগের প্রভাবে বিবর্তিত হয়ে আর্যীকরণের শিকার হয়েছেন। ধর্মঠাকুরকে শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জন' বলা হয়েছে। কৃষিজীবী সমাজে তার ব্যাপক প্রভাব থাকায় ধর্মমঙ্গলের শিব কৃষিজীবী হয়েছে। ধর্মঠাকুরের ভক্তের বিশ্বাস এই দেবতা কুষ্ঠরোগের নিরাময় করেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। ধর্মঠাকুরের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। (৮০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি

ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই ধর্মমঙ্গল কাব্য দেবখণ্ড ও নরখণ্ড-এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। ধর্মমঙ্গলের নরখণ্ডের মূলত দুটি কাহিনি-রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি ও লাউসেনের কাহিনি। প্রথম কাহিনি অংশটি আদি, পুরাতন দ্বিতীয় কাহিনিটি পরবর্তীকালের সংযোজন হলেও সমান জনপ্রিয়। কেবল যদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' ও ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ'-এ লাউসেনের কাহিনি নেই। যাই হোক ধর্মমঙ্গলের প্রথম কাহিনিটি হল-নিঃসন্তান হরিশ্চন্দ্র ও স্ত্রী মদনা ধর্মঠাকুরের পুজো করে সন্তান লাভ করে; কেবল একটি শর্ত থাকে যে পুত্রকে যথাসময়ে ধর্মের কাছে বলি দিতে হবে। একসময় ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের সাজে এসে পুত্র লুইচন্দ্রের মাংস খেতে চাইলেন। পূর্ব-প্রতিজ্ঞা মতো রাজা ও রানি পুত্রকে বলি দিয়ে ব্রাহ্মণের আহার প্রস্তুত করলেন, ধর্মের মায়ায় বাস্তবিক লুইচন্দ্রের বলি হয় না, ধর্ম রাজা-রানির ধর্ম-

প্রীতিতে খুশি হয়ে সন্তানকে ফিরিয়ে দেন। এরপর মহা সমারোহে গোটা রাজ্যে ধর্মঠাকুরের পুজো করা হয়।

ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনিটি লাউসেনের গল্প। গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজা কর্ণসেন। দুর্জন ইছাই ঘোষের আক্রমণে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা যায়। গৌড়েশ্বর তার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দিলে শ্যালক মহামদ রুষ্ট হয়। ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতী পুত্র লাভ করে, তার নাম লাউসেন। মাহমদ বা মাহুদ্যা শিশু লাউসেনকে বিনাস করার নানান চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ধর্মের কৃপায় বীর লাউসেন গৌড়েশ্বরকে খুশি করে, এমনকি পশ্চিম আকাশ সূর্যোদয় ঘটায়। মাহুদ্যার কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি দিয়ে বিপুল গৌরব অর্জন ক'রে লাউসেন পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য দিয়ে স্বর্গযাত্রা করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কাহিনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৫ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি পরিচয়

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকেই অনার্য দেবতা ধর্মকে নিয়ে রাঢ় বাংলায় অন্ত্যজ শ্রেণির লোকমুখে ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালি ও গল্প প্রচলিত ছিল। সেগুলিই পরবর্তীকালে বহু কবির লেখনীতে সংকলিত রূপে উঠে আসে। রামাই পণ্ডিত নামে কোনো একজন ব্যক্তি প্রথম ধর্ম পুজো করেছিলেন বলে মনে করা হয়। রামাইয়ের ভণিতাযুক্ত ধর্ম দেবতার প্রসঙ্গ নিয়ে দুটি পুথি পাওয়া যায়। 'শূন্যপুরাণ' বা আগম পুরাণ, আর 'অনাদ্যের পুথি'। ধর্মের গাজনে যে সব গান ও ছড়া গাওয়া হয়, সৃষ্টিতত্ত্বে ধর্ম কতৃক বিশ্বসৃষ্টি, পুজোবিধি এবং হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনি শূন্যপুরাণেও পাওয়া যায়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'।

কাহিনির দিক থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় হলেও রূপরাম ও ঘনরাম চক্রবর্তী ব্যতীত প্রতিভাধর কবির অভাব থেকে গেছে। আসলে অনার্য দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় পৌরাণিক গ্রন্থাদির ব্যবহারের সুযোগ কম থাকায় মধ্যযুগের কাব্যরচনার পরিমণ্ডলে কবি প্রতিভার তেমন স্ফূরণ ঘটেনি। পুরুষ দেবতার মাহাত্ম্য ও বীররসের কাব্য রচনার উপযুক্ত প্রতিভার অভাব থেকে গেছে। এই কাব্যধারার আদি কবি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন- রূপরাম চক্রবর্তী, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি হলেন-ঘনরাম চক্রবর্তী। নিম্নে ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার গুরুত্বপূর্ণ কবিদের পরিচয় দেওয়া হল—

৬.৫.১ ময়ূরভট্ট

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ'-এর পুথি সম্পাদনা করে বলেন ময়ূরভট্ট-ই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি। একই নামের ব্যক্তি সংস্কৃত সূর্যশতক

রচনা করেছিলেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ময়ূরভট্ট নামটি প্রকৃত বাঙালির নাম নয়। যদিও ধর্মমঙ্গলের প্রায় সব কবিদের কাব্যে ময়ূরভট্টের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

৬.৫.২ খেলারাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় খেলারাম চক্রবর্তী নামে এক কবির উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি 'গৌড়কাব্য' নামে ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন আনুমানিক ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। সে হিসেবে খেলারামের কাব্যই প্রথম ধর্মমঙ্গল। যদিও খেলারামের কোনও পূর্ণ কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। হারাধন দত্ত ১৩০২ সনে 'জন্মভূমি পত্রিকায় একটি রচনায় খেলারামের প্রথম পরিচয় দেন। সুকুমার সেন থেকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই এ বিষয়ে সংশয় জানিয়েছেন।

৬.৫.৩ রূপরাম চক্রবর্তী

সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী প্রথম কাব্য রচনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই শতাব্দীর যে চারজন কবির কথা জানা যায়, তারা হল-রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস ও যদুনাথ রায়। এঁদের মধ্যে রূপরামের কাব্য প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়। তার কাব্যের নাম 'অনাদ্যমঙ্গল'। এখানে ধর্মঠাকুরকে অনাদ্য, অনাদি বা নিরঞ্জন বলা হয়েছে। সুকুমার সেন ১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' নামে কাব্যের একটি অংশ সম্পাদনা করেন। তার কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হল-

"পাঁকে শীমে জড় হইল যত শক হয়।
তিন বাণ চারযুগ বেদে যত রয়।।
রসের উপরে রস তারে রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেকা কর্য়া নেহ।।"

এই শ্লোক অনুসারে কাব্যটি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে লেখা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপরাম চক্রবর্তীকেই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলেছেন। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুরে রূপরামের জন্ম এবং পিতা ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, নাম অভিরাম চক্রবর্তী। বিদ্যার্জনের জন্য কবির নবদ্বীপ যাত্রার সময় ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশে দর্শন দিয়ে ('আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম') কবিকে গান অর্থাৎ কাব্য রচনার আদেশ দিয়েছিলেন।

হরিশচন্দ্র ও লাউসেন উভয় কাহিনির গল্পরস পরিবেশনে রূপরাম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বীররস, হাস্য ও করুণ রসের স্বাভাবিক ব্যবহার দেখি। চরিত্র সৃষ্টিতে কবি সপ্তদশ শতকের অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের কবিদের তুলনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বালক লাউসেনের বিদ্যার্জনের কুশলতার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে-

"ক খ আদি পড়িল অক্ষর যথোচিত।
চৌতিশ অক্ষইরাগে পড়িল তুরিত।
পড়িল আঠর ফলে হইয়া সাবধান।
আঙ্ক আস্ক পড়ে আর সিদ্ধি বানান।।

... ...

যার তার সনে করে টীকার বাখান।
পড়িল নিগম ভারথ পুরাণ।।
জ্যোতিষ পড়িল কিছু রাজার কোঙার।
লাউসেন পড়ে আর কর্পূর পাটর।।"

রূপরাম চক্রবর্তীর সমগ্র কাব্য প্রকাশিত হয়নি, তাই তার কাব্যপ্রতিভার সামগ্রিকতা বিচারও খণ্ডিত থেকে যায়।

৬.৫.৪ রামদাস আদক

রামদাস আদকের কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'। বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রথম এই কাব্য প্রকাশ করেন, তবে তাঁর সম্পাদিত কাব্যের মূল কোনো পুথি নয়, লোকমুখে শোনা ধর্মঠাকুরের গান। হুগলি জেলার আরামবাগে এক কৈবর্ত পরিবারে কবির জন্ম। কাব্যে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় কবির কাব্যটি ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে রচিত। কাব্যকাহিনি গতানুগতিক হলেও ভাষা ব্যবহার, শব্দ, অলংকার ব্যবহার ও রুচিশীল প্রকাশে রামদাস পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন।

সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী। আর এই সময়ের অন্যান্য অপ্রধান কবিরা হলেন-সীতারাম দাস, যদুনাথ, শ্যামপণ্ডিত প্রমুখ।

৬.৫.৫ ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের নাম 'অনাদি মঙ্গল', কাব্যটি আয়তনে বৃহৎ, ধর্মমঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ রচনা। সুকুমার সেন ও দীনেশচন্দ্র সেন ঘনরাম চক্রবর্তীকে অষ্টাদশ শতকের কবি বলেছেন। বর্ধমান জেলার বাঁকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম। পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্তী ও মাতা সীতাদেবী। কবির কাব্যে নানা স্থানে রাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ থাকায় গবেষকরা মনে করেন কবি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কবি রামভক্ত ছিলেন- 'আশীর্বাদ কর যেন রাঘবে রয় মতি' বা 'ঘনরাম ভণে যার নাম রঘুপতি'-র মত ভণিতা তার প্রমাণ। লাউসেনের সঙ্গে রামচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। এমনকি শ্রীচৈতন্যের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রাজা কীর্তিচন্দ্র বা গুরু সম্ভবত তাকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন—

"নিজ গুণে করি যত্ন নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা আধার।

কবি কাব্য সমাপ্তির সন তারিখ এইভাবে উল্লেখ করেছেন—

"সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।।
শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকাব্দ অংশে হংস ভার্গব বাসর।।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।।"

এই উল্লেখ থেকে ঘনরামের কাব্য ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রামায়ণ, মহাভারত, নানান পুরাণ-উপপুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ ক'রে, কয়েকশ বছর ধরে লোকসমাজে হরিশ্চন্দ্র ও লাউসেনের যে লোককাহিনি প্রচলিত ছিল তাকে মহাকাব্যিক বিস্তার দিয়েছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিদের মতো ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পুজো প্রচার অপেক্ষা, রঞ্জাবতীর কৃচ্ছসাধন এবং লাউসেনের বীরত্বের প্রসঙ্গ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। রঞ্জাবতীর বাৎসল্য, লাউসেনের বীরত্ব, মাহমদের হিংসা, গৌড়েশ্বরের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, ধর্মের কৃপা-প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি বর্ণনার গুণে কাব্যরসে উত্তীর্ণ হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যের প্রেক্ষিতে নারীর বীরত্বের পরিচয়ে ঘনরামের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। লাউসেনের বীর্যের সঙ্গে চারিত্রিক সংযম, চরিত্রটিকে নায়কোচিত মর্যাদা দিয়েছে। হাস্যরস, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবিকে উত্তীর্ণ করেছেন ঘনরাম চক্রবর্তী।

৬.৫.৬ মাণিকরাম গাঙ্গুলি

মাণিকরাম গাঙ্গুলির পিতা গদাধর এবং মা কাত্যায়নী। ১৩১২ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মাণিকরাম গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল' প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। সেখানে রচনাকালের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। তার কাব্যের অপর নাম 'বার্মাতি'। কবির সময়কাল ও কাব্যরচনার কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ, ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ বা ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ-এরকম ভিন্ন ভিন্ন সময়কালকে পণ্ডিতেরা কবির কাব্য রচনার সময় মনে করেন। তার কাব্যের ভাষা আধুনিক হওয়ায় ষোড়শ বা সপ্তদশ শতক নয় অষ্টাদশ শতকের কবি বলেই গ্রহণ করা হয়। পূর্ববর্তী কবিদের কাহিনি অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন কবি। প্রথাগত কাব্য কাঠামোতে রাঢ়ের ধর্ম পুজোর খুঁটিনাটি রীতিনীতির উল্লেখ আছে মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে। তিনি ধর্ম ঠাকুরকে পৌরাণিক মহিমা দিতে চেয়েছেন, কারণ অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ কবি নীচ জাতির দেবতা ধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান লিখছেন, তাই তার সমাজ থেকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন অপ্রধান কবির আগমন হয়েছিল। তাঁদের কাব্যগুলি হল— দ্বিজ রামচন্দ্রের 'ধর্মমঙ্গল', সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণ', হৃদয়রাম সাউ-এর 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি।

৬.৬ শিবায়ন কাব্য ও শিবের উৎস

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা মঙ্গলকাব্যের এক ব্যতিক্রমী সাহিত্য নিদর্শন হল 'শিবায়ন'। লৌকিক দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে কৃষিসমাজে মধ্যযুগে যে আখ্যানকাব্য গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের ধরনে তাকে শিবায়ন বলছি। মঙ্গলকাব্যের মতো দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের বিভাজন এখানে নেই।

বৈদিক দেবতা রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা আর পৌরাণিক শিব পরিকল্পনায় আর্যেতর সংস্কৃতি মিশ্রণে লৌকিক শিব ঠাকুরের উৎপত্তি হয়েছে। বাংলার শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির ছাপ দেখা যায়। প্রজনন কামনায় লিঙ্গোপাসনা প্রাচীন রীতি, ভারত ছাড়াও বহু দেশে আজো এই রীতির প্রচলন দেখা যায়। বাংলার গ্রামীণ সমাজে শিবায়নের শিবের প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্বে বলেছেন-

"শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যে শিবের যে লোকচিত্তরঞ্জক বর্ণনা আছে, তাহা হইতে মনে হয়, এ-দেশে আর্যাচার ও পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আর্যেতর জনসমাজে কৃষি দেবতারূপে কোনো ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক দেবতাই কাব্যে, ব্রতকথায়, গ্রাম্য বৃক্ষমূলে, 'বাবার থানে', গাজন উৎসবে এবং ক্ষেত্রকর্মে এখনও জীবিত আছেন। অস্ট্রিক-অধ্যুষিত কৃষি সভ্যতার কৃষি দেবতার উদ্ভাবন একটি সাধারণ স্বাভাবিক সমাজ-ঐতিহ্য।"

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে লৌকিক কৃষিদেবতা শিবকে কেন্দ্র করে শিবায়ন কাব্য লিখিত হয়েছে। এই শিব মঙ্গলকাব্যের শিবের সঙ্গে মিল প্রচুর হলেও অমিলও আছে। এভাবে পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি শিববিষয়ক রচনায় (শিবগীতি, শৈবসর্বস্ব, গঙ্গাবাক্যাবলী) শিবের যে পরিচয় পাই, তাই-ই বাংলার শিবায়নের শিব চরিত্র গঠনে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিবায়নকে ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন, "বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই" (লোকসাহিত্য)।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। শিবায়ন কাব্যের শিবের উৎস ও প্রকৃতির পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৭ শিবায়নের কাহিনি

শিবায়ন কাব্যের প্রত্যেক কবির কাব্যের শুরুতে পৌরাণিক শিবের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় অংশে কৃষক শিবের চিত্তাকর্ষক বিচিত্র গল্পকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় অংশের লৌকিক জীবনের কাহিনিটি নানা দিক থেকে আকর্ষণীয়। হর-পার্বতীর সংসারের দারিদ্রজনিত নানান অসংগতি, কলহ, গালাগালি হাস্যরসের আধার হয়ে উঠেছে। শিবের চাষের কাজ, ভৃত্য ভীমের সঙ্গে জমি প্রস্তুত, বীজ বপন, ধান চারার পরিচর্যা গ্রামবাংলার কৃষিজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আধার এখানে উঠে এসেছে। শিব বিরহে দুর্গার বিরহ মধ্যযুগে নারীজীবনের ছবি হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ শিবের বাগদিনী নারীর প্রতি আসক্তি স্থূল চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে; দেবীর ছলনা ও পিতৃগৃহে যাত্রা, শিব কর্তৃক দুর্গার অভিমান ভাঙানো ও কৈলাসে ফিরে যাওয়া-প্রভৃতি ঘটনায় কৃষিদেবতা শিবের মাহাত্ম্য উপস্থাপন করা হয়েছে। শিবায়নে পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলি হল— দক্ষযজ্ঞ, গৌরীর

জন্ম ও মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ, রুক্মিণীহরণ, হরিহরের যুদ্ধ, তারকাসুরের আখ্যান, অন্ধক আখ্যান, পরশুরাম ও বাণরাজার গল্প প্রভৃতি। আর লৌকিক কাহিনির অনুষঙ্গগুলি হল- হরগৌরীর বিবাহ, শিবের ঘরগৃহস্থালির বর্ণনা, শিব-গৌরীর কলহ, জীবিকার জন্য শিবের কৃষিকাজ, বাগদিনী যুবতী রূপে দেবীর ছলনা ও শিবের কামবাসনা, শঙ্খ পরিধানের আখ্যান প্রভৃতি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। 'শিবায়ন' কাব্যের কাহিনিটি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৮ শিবায়ন কাব্যের কবি পরিচয়

সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবায়ন কাব্যের মোট দুজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। তারা হলেন- শঙ্কর কবিচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ রায়। অষ্টাদশ শতকেও শিবায়নের কবি সংখ্যা খুবই কম, তাদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য-ই প্রতিভাধর কবি ছিলেন বলা যায়। নিম্নে এই কাব্যধারার কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

৬.৮.১ শঙ্কর কবিচন্দ্র

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিবায়ন কাব্য ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এছাড়াও কবি ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শীতলামঙ্গল রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে শঙ্করের শিবায়ন কাব্যের কোনো পুথি পাওয়া যায়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত 'মর্চ্ছধারা পালা' নামক পুথিতে শঙ্করের রচনার (পুথি সংখ্যা ৪১২) পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বিখ্যাত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য শঙ্করের কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৬.৮.২ রামকৃষ্ণ রায়

শিবায়ন কাব্যের কবি রামচন্দ্র রায়ের উপাধি ছিল 'রায়', পূর্ব উপাধি 'দেব'। কাব্যে 'কবিচন্দ' উপাধির পরিচয়ও আছে। তিনি ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ রায় সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে বলেছেন, "শিবায়ন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীর্ঘদিন বিস্মৃতির অন্তরালে নির্বাসন যাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়ের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনুকূল্যে এই বিশিষ্ট শিবকাহিনী বিষয়ক কাব্য প্রকাশিত হইবার ফলে প্রাচীন সাহিত্যামোদী পাঠক-পাঠিকা কবি রামকৃষ্ণের কবি-প্রতিভা যাচাই করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইবেন।" রামকৃষ্ণের মোট দুটি শিবায়নের

পুথি পাওয়া যায়। কবি তাঁর কাব্যকে 'শিবমঙ্গল' আখ্যা দিয়েছিলেন। কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব-প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে শিবের অনুষঙ্গ নিয়ে তিনি শিববন্দনা মূলক কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে লৌকিক শিবের কাহিনি মাত্র একটি পালায় (২২ নং) বর্ণনা করেছেন। কাহিনি ও উপকাহিনির ঘনপিনদ্ধ রচনা নৈপুণ্য, চরিত্রের পৌরাণিক মহিমা, মার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা ও অলঙ্কারের ব্যবহারে তাঁর কাব্য প্রশংসা লাভ করেছে।

৬.৮.৩ রামেশ্বের ভট্টাচার্য

শিবায়ন কাব্যধারায় সবথেকে জনপ্রিয় কবি হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বর ভট্টাচার্য। মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম। কবির পিতা লক্ষণ ভট্টাচার্য ও মাতা রূপবতী। কবির পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী রাজা যশোমন্ত সিংহের আগ্রহে কবি শিবায়ন কাব্য রচনা করেছিলেন। রামেশ্বরের ভণিতায় মোট চারটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল-শিবসংকীর্তন বা শিবায়ন, সত্যপীরের ব্রতকথা, শীতলামঙ্গল বা মগপূজা পালা ও সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা আখেটী পালা। এই 'শিবসংকীর্তন' কাব্যের জন্য রামেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর কাহিনি মৌলিক না হলেও রচনারীতি ও চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। মোট আটটি পালায় পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কাব্যের প্রথম তিনটি পালা পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে, পরের পালাগুলিতে লৌকিক শিবকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রাঢ় বাংলার কৃষিকাজ, ধান-চাল, জীবনযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কবি কৃষিজীবী শিবের জীবনযাত্রার আখ্যান বর্ণনা করেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের মতোই তাঁর কাব্যের বহু পঙ্‌ক্তি প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যা কবির জনপ্রিয়তা ও জীবনদর্শনের গভীরতাকে প্রমাণ করে। যেমন-'দিনে হও ব্রহ্মচারী, রাত্রে গলাকাটা', 'নামের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে' প্রভৃতি। কৌতুক রসের বর্ণনা তাঁর সহজাত, যেখানে অনুপ্রাসের পরিচয় ফুটে ওঠে—

"ঠুস ঠাস ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়্যা যায় দুই চারি মরে।।"

শিব-দুর্গার দৈব মহিমা এবং মানবরসের পরিচয়ে চরিত্রসৃষ্টিতে কবি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ তো আছেই কাব্যে উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মমতের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তী বা ভারতচন্দ্রের মতো সুযোগ, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও, লৌকিক কাহিনির অভিনবত্ব না থাকা ও শিথিল গ্রাম্য সংস্কারের কারণে মহৎ সাহিত্য রামেশ্বরের হাতে আমরা পায়নি।



জেনে রাখা ভালো

উপরে বর্ণিত মঙ্গল কাব্যেরও অতিরিক্ত বরদামঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও কপিলামঙ্গল কাব্যে বা পাঁচালীতে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানেরা পীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পুথি লিখেছেন। এগুলিকে পীরমঙ্গল বলা হয়। যেমন বয়নুদ্দীন রচিত বনবিবির জহুরনামা, মুহম্মদ খাতেরের বনবিবির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি পুথি আছে। মানিক পীর, পীর গোরাচাঁদ, একদিল শাহ, মোবারক গাজী এবং গাজী ও কালুর পুথি প্রচলিত ছিল ও আছে।

মৃগলুব্ধ

চট্টগ্রাম থেকে শিববিষয়ক কিছু পুথি পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সাহিত্যবিষারদ আব্দুল করিম মহাশয় দুজন কবির 'মৃগলুব্ধ' উদ্ধার করেছেন। এর কাহিনি মূলত একজন ব্যাধের জীবনকথা। কীভাবে এক মৃগলুব্ধ অর্থাৎ ব্যাধ শিবের কৃপায় বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, এবং রাজা মুচকুন্দ ও তার রানি শিব চতুর্দশীর ব্রত পালন ও শিবমাহাত্ম্য শুনে সশরীরে স্বর্গে গেল- এই কাব্যে সেই কাহিনিই লিপিবদ্ধ আছে। এই 'মৃগলুব্ধ' কাব্যধারার দুজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন- রাম রাজা ও রতিদেব, উভয়েই চট্টগ্রামের কবি। এরা মূলত সপ্তদশ শতাব্দীতে কাব্যরচনা করেছিলেন। এই কাব্যধারাকে আমরা শিবায়নেরই শাখা বলে গ্রহণ করতে পারি।



৬.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- শিবায়ন কাব্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ধারণা গড়ে উঠল।
- শিবায়ন কাব্যের ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের সাধন প্রণালী সম্পর্কে জানা সম্ভব হল।



৬.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। লাল শালু কাপড় দিয়ে ঢাকা কূর্মাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি একখণ্ড পাথর ধর্ম ঠাকুরের বিগ্রহ ...ধর্ম ঠাকুর ধর্মরায়, কালুরায় বা যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে পূজিত হয়। (দ্রষ্টব্য ৬.৩.০ অংশ)

২। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই ধর্মমঙ্গল কাব্য দেবখণ্ড ও নরখণ্ড-এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। এভাবে উত্তর গড়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৪.০ অংশ)

৩। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা মঙ্গলকাব্যের এক ব্যতিক্রমী সাহিত্য নিদর্শন হল শিবায়ন'। লৌকিক দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে কৃষিসমাজে মধ্যযুগে যে আখ্যানকাব্য গড়ে উঠেছে ...এই ধারায় উত্তর নির্মাণ করুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৬.০ অংশ)

৪। শিবায়ন কাব্যের প্রত্যেক কবির কাব্যের শুরুতে পৌরাণিক শিবের বর্ণনা আছে। ...শিবের চাষের কাজ, ভৃত্য ভীমের সঙ্গে জমি প্রস্তুত, বীজ বপন, ধান চারার পরিচর্যা গ্রামবাংলার কৃষিজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আধার এখানে উঠে এসেছে। ...এভাবে উত্তর নির্মাণ করুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৭.০ অংশ)



৬.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড° দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড° অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ



৬.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনির পরিচয় দিন।

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় সপ্তদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

৪। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

৫। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপ্রধান কবিদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬। শিবায়ন কাব্যে শিবের উৎস ও প্রকৃতির পরিচয় দিন।

৭। শিবায়ন কাব্যের কাহিনিটি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন।

৮। শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ৭ : পদাবলি সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ পরিচিতি
৭.৩ বিদ্যাপতির কবিত্ব
    ৭.৩.১ ভাবসম্মিলনের কবি বিদ্যাপতি
    ৭.৩.২ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণ কি কি?
৭.৪ জ্ঞানদাসের কবিত্ব
৭.৫ গোবিন্দদাস কবিত্ব
৭.৬ চণ্ডীদাসের কবিত্ব
৭.৭ শাক্ত পদাবলির বিষয়বস্তু
৭.৮ রামপ্রসাদ সেন
৭.৯ সাধক কমলাকান্ত
৭.১০ দাশরথি রায়
৭.১১ অধ্যায় সংক্ষেপ
৭.১২ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.১৩ অতিরিক্ত পঠন
৭.১৪ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৭.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদাবলিকারদের সম্পর্কে নানান তথ্য এবং তাঁদের পদের বিষয়ে জানতে পারবেন।
- শাক্ত সাধনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- শাক্ত পদাবলি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- আগমনী পর্যায়ের বিষয়ে জানতে পারবেন।
- বিজয়া পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন।

৭.২ পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলি গৌরবের স্থান দখল করে আছে। বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসকে গতানুগতিকতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব সাহিত্য উচ্চতর মাত্রা লাভ করেছে। মধ্যযুগের শেষলগ্নে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তার পরবর্তীকালে রচিত শাক্ত পদাবলি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ সম্পদ। বৈষ্ণব পদাবলির ন্যায় শৃঙ্গার রস এর উপজীব্য নয়, বরং তার পরিবর্তে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বাৎসল্য রস। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি মূলক বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলায় প্রভাব বিস্তার করলেও, অষ্টাদশ শতক থেকে তা জাতীয় জীবনে গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। সেইসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে মাতৃতান্ত্রিক পূজার্চনা। মাতৃ পাগল বাঙালির মাতৃ আরাধনার স্বরূপ শাক্ত পদাবলিতে কাব্যরূপ লাভ করেছে। শাক্ত সাধকগণ শক্তিরূপা জগজ্জননীকে কখনো ঘরের মেয়ে আবার কখনো মাতৃরূপে ভজনা করেছেন। তাই বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তেমনি শাক্ত পদাবলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে উমা, পার্বতী চণ্ডী ও কালিকাকে কেন্দ্র করে।

৭.৩ বিদ্যাপতির কবিত্ব

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী হলেও বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেবের প্রিয় ছিল— এ তথ্য দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলি মিথিলা অপেক্ষা বাংলাদেশেই বেশি জনপ্রিয়। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলিতে নানা ভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে চিহ্নিত করা হয়। বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতেও বিদ্যাপতির বহু পদাবলির স্থান হয়েছে।

জীবনী : বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। বিদ্যাপতি পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। বহুভাষাবিদ কবির প্রকীর্ণ পদগুচ্ছ ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থ আছে। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' কীর্তিসিংহের আমলেই রচিত হয়। কীর্তিসিংহের রাজত্বকাল চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে হওয়া সম্ভব। এর পূর্বে কবিকে দেখা যায় কীর্তিসিংহের পিতৃব্যপুত্র দেবসিংহের রাজসভায়। সেখানে তিনি তাঁর ভূগোলের বই 'ভূ-পরিক্রমা' রচনা করেন। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শিবসিংহের রাজসভায় থাকাকালীন তিনি তাঁর পদাবলি রচনা করে যশস্বী হন। ড° সুকুমার সেনের মতে ভাগবতের অনুলিপি প্রস্তুত করেন বিদ্যাপতি ১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে দ্রোণবারের অধিপতি পুরাদিত্যের আশ্রয়ে লেখা হয়েছে 'লিখনাবলি' পুস্তকটি। ১৪৩০-৪০ খ্রিস্ট্রাব্দের মধ্যে পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর নামে একটি পদ রচিত হয় শৈবসর্বস্বহার ও গঙ্গাবাক্যাবলী ১৪৪০-৬০ এর মধ্যে লেখা হয় বিভাগসার, প্রেমভক্তি তরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থ।

মিথিলা থেকে মূল মৈথিল ভাষায় লেখা বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিস্কারকর্তা ছিলেন ড° গ্রীয়ার্সন। বাংলাদেশে সংগৃহীত পদগুলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। বাংলা মৈথিল অবহট্ঠ মিশ্রিত এই ভাষাকে বলা যেতে পারে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।

ব্রজবুলি ভাষা : বিদ্যাপতির লেখা ব্রজবুলি পদ শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয় উড়িষ্যা ও আসামে প্রচলিত হয়। পূর্ব থেকেই একটা নির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে না উঠলে এ ভাষার সর্বজনীনতা লাভ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। ড° সুকুমার সেনের মতে— 'মোরাঙ নেপালের রাজসভার আওতাতেই বাংলা মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে এবং অবহ্ট্ঠের ধাচে ব্রজবুলি উৎপত্তি।'

বিদ্যাপতির রাধা বয়ঃসন্ধির পদ : আলংকারিক পরিভাষানুযায়ী বিদ্যাপতি 'সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি'। সে রসের বর্ণনায় তিনি জয়দেব গোস্বামীর অনুগামী। বিদ্যাপতি বিলাস কলাকুতূহলের কবি। তাই তাঁর অপর নাম 'অভিনব জয়দেব'। উজ্জ্বলরসাশ্রিত প্রণয়োচ্ছ্বাসই বিদ্যাপতির কাব্যবীণায় ঝঙ্কৃত। বিদ্যাপতির পদাবলির নায়িকা রাধা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয়, এবং চারিদিকে যৌবনের কল্প হিল্লোলিত হইয়া উঠে।' রাধার যৌবনের প্রথম অস্ফুট প্রকাশ দেখা যায় বয়সন্ধির পদে:

"খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ।।
খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস।।"

বয়ঃসন্ধির রাধার চোখে চাঞ্চল্যই বেশি। সে রাধা সর্বদা ক্রীড়াশীল তাঁর পায়ের গতি কমে তা চোখে আশ্রয় পেয়েছে। যেখানে প্রেমরসের কথা হয় রাধা বালিকা হলেও কান ভরে সেই প্রেমের কথা শোনেন। কিশোরী রাধা নিজের শরীরের অঙ্গগুলি দেখে সদাই বিভোর। বিদ্যাপতি রাধা বয়ঃসন্ধির সময় বিদগ্ধ ও বিহ্বলা নাগরিকা নারী পার্থিব কামনায় ভরপুর তাঁর তনু।

রাধা বলেছেন কৃষ্ণ তাঁর 'দেহক সরবস গেহক সার'। রাধার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেন শ্রীরাধা- তাই পদটির পরবর্তী অংশে রাধা বলেন-

"পাখিক পাখ মীনক পাণি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।।"

—এ অনুভর চিরকালের প্রেমিকার অপূর্ব ভাবনা। পাখী যেমন পাখা ছাড়া সীমাহীন আকাশে উড়তে পারে না, মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না তেমনি কৃষ্ণকে ছাড়া রাধার অস্তিত্বই বিপন্ন।

আক্ষেপানুরাগে (বিদ্যাপতি) বাঁশীর শব্দে রাধার মন বিষের জ্বালায় জর্জরিত। বিদ্যাপতি আক্ষেপানুরাগের কবি নন একথা স্বীকার্য। অভিসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি জয়দেব, কালিদাস ও অমরুর অনুগামী। প্রেমের বীর্যে বিদ্যাপতির রাধা দুর্জয় সাহসিকা নারী। পূর্ণিমা রাতে অভিসারিণী শ্রীমতী কেমন সাজসজ্জা করবেন তার উপদেশ দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ:

"জৈসন রজনি উজোরল চন্দ।
ঐসন বেস ভূসন করু বন্ধ।।"

জয়দেবের গীতগোবিন্দে সখী শ্রীরাধাকে অভিসার যাত্রায় পাঠাতে দূরপ্রতিজ্ঞ: 'চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম' গীতায় আছে 'যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে সে সেই ভাবেই আমাকে লাভ করে।' বিদ্যাপতির অভিসারক পদে শ্রীরাধা রসের গভীর দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতার কথা আধ্যাত্ব রসে পূর্ণ।

বিরহ অর্থাৎ মাথুরের পদে বিদ্যাপতির রাধার নিদারুণ বিরহজ্বালা বর্ণিত—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।

সখিকে রাধা বলছেন তার দুঃখ অসীম। এই ভরা, বৃষ্টির দিনে যখন বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে তখনই শ্রীমতী ব্যাকুল। ভাদ্র মাসে রাধিকার ঘর শূন্য। এছাড়া রাধা কৃষ্ণ বিহনে নিরানন্দ—

"হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল জৈসে মালতিমালা।।"



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতি ঠাকুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৩.১ ভাবসম্মিলনের কবি বিদ্যাপতি

কৃষ্ণ ফিরে আসেননি বৃন্দাবনে তিনি মথুরায় কংস নিধনে ব্যস্ত। তাঁর অব্যর্থ প্রকাশের বাণী মানব প্রাণই চিনে নেয়:

"সখিহে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু রাগ বাখানিএ
তিলে তিলে নতুন হোয়।।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা, দুঃখই না তাহা আনন্দরূপমমৃতং।"

এমনই একটি পদ:

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরনন্দ।।"

জীবনযৌবন রাধার সফল কারণ তাঁর হৃদয়ে রয়েছেন কৃষ্ণ একান্ত আপন রূপে।

বিদ্যাপতি ভারতের কবি সার্বভৌম। ভাষায় ছন্দে, চিত্রকল্প যোজনায় বৈষ্ণবপদাবলিকারদের শ্রেষ্ঠ পূর্বসূরি। কাব্যের কলানৈপুণ্যে, রসের মিলনে, সৃষ্টির আগুন জ্বালা বিরহে বিদ্যাপতির কবিকীর্তিই শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কালের সরণি বেয়ে আজও অম্লান।

৭.৩.২ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণ কি কি ?

১। বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যের নায়ক নায়িকা রাজসভার পরিবেশে চটুল নাগরিক প্রেমের আধার। বয়ঃসন্ধির পদ বিদ্যাপতির নিজস্ব সংযোজন। রূপানুরাগের পদে বিদ্যাপতির যে সৌন্দর্যচেতনা সেই সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা প্রভাবিত জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

২। বিদ্যাপতির রাধা নাগরিকা হলেও কামকলানিপুণ। পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলিতে বৈষ্ণবপদাবলিকার জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সেই রাধার কামমিশ্রিত প্রেমকে platonic love এ পরিণত করেছেন।

৩। বিদ্যাপতির ভণিতাংশে রাজার নাম থাকলেও, মিলন ও সখীশিক্ষার পদে তিনি অনন্যা। সেই মিলন রোমান্টিক মিলন রূপান্তরিত জ্ঞানদাসের পদে।

৪। মান পর্যায় বহুচারী পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার ছবি বিদ্যাপতির কাব্যে আছে। রাজসভার জন্যই পুরুষ কৃষ্ণ বহুজনবল্লভ। বৈষ্ণবপদাবলিতেও আমরা গোপীজনবল্লভ 'প্রেম লম্পট' বহুচারী কৃষ্ণকেই নায়ক হিসেবে পাই।

৫। বিদ্যাপতি সুচয়িত অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন রাজাদের পরিতুষ্ট করার জন্য। অনুপ্রাস, যমক উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবক্তি, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলঙ্কার গোবিন্দদাসও ব্যবহার করেছেন তাই চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলিকার গোবিন্দদাস দ্বিতীয় বিদ্যাপতি রূপে পরিগণিত।

৬। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে 'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে' (চৈ চ ৩/১/৬১) বিদ্যাপতিও কৃষ্ণকে বৃন্দাবন বিহারী করে গড়েছেন

"বিদ্যাপতি কহ কর অবধান
কৌতুকে ছাপিত তাঁহি বহু কান।।"

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ রাধাকে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নিয়ে গেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শেষে জীবনে এই ভাবের মূর্ত প্রকাশ দেখা যায়। বিরহ সৃষ্টির আগুন জ্বালা বিরহ তাই বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ চলে যাওয়ায় সমস্ত বৃন্দাবন শূন্য ব্রজগোপী ও রাধার বিরহ বৈষ্ণবপদাবলিকারদের পদাবলিতে মূর্ত।

৭। এক সময় মিথিলায় বাংলা থেকে অনেকে পড়তে যেতেন তাঁরা বিদ্যাপতির পদ বয়ে নিয়ে আসে এভাবে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হন।

৭.৪ পদাবলির চণ্ডীদাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত বিতর্কের অন্ত নেই। সেইসব বিতর্কে প্রবেশ না করেও আমরা বলতে পারি, শব্দবন্ধের আতসবাজি, অর্থদীপ্তির চোখ-ঝলসানো

সমারোহ না থাকলেও মহত্তম আবেগের সহজতম প্রকাশে যাঁর পদ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে তিনি-ই বৈষ্ণবপদকর্তা চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস কবি। ভাবমগ্ন, আত্মবিস্মৃত, উদাসীন কবি আপন একতারায় তান দিয়ে তিনি সুর সাধনা করেছেন। পদাবলির চণ্ডীদাসের প্রামাণ্য জীবনী পাওয়া যায় না। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষভাগে নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভূর আবির্ভাবের আগে যে পদরচয়িতা চণ্ডীদাসকে পাওয়া গেছে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।

চণ্ডীদাস সহজতম ভাষায় প্রেমের গভীরতম আনন্দবেদনার স্থপতি। চৈতন্য পূর্ববর্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বিস্তৃত কৃষ্ণলীলায় পরিশীলিত নাগরিকতার সন্ধান পাওয়া যায় তা চণ্ডীদাসে নেই। চণ্ডীদাস গ্রামের কবি। তাঁর 'গোরোচনা গোরী' রাধা বাংলাদেশেরই। লোকলাঞ্ছনায় ভীতা গৃহবধূ। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম অসাধারণ। চণ্ডীদাসের পদাবলির সমস্ত পর্যায়েই ছড়িয়ে আছে এই কৃষ্ণপ্রেমেরই জন্য রাধার হৃদয়ের ব্যাকুলতা। চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলিতে ব্যাপ্ত রাধার অপার বিরহ বেদনা। তাই পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত প্রেমের পবিত্র শুভ্রতা আর বিষণ্ণতার স্রোতে চণ্ডীদাসের পদাবলি এক অমর প্রেমের জয়গাথা।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের রূপদর্শনে বিভোর। কৃষ্ণকে দেখে রাধা মুগ্ধা চকিতা ও চমকিতা। বিদ্যাপতির রাধার বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য কৈশোর (বয়ঃসন্ধি), ও নবযৌবনে পূর্বরাগ, অভিসার, মান ও রসোদ্‌গারের লীলাবিষয়ে দর্শককে প্রতি মুহূর্তে চমকিত করে দেয়। অপরদিকে চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগেই যোগিনী:

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যাথা।
বসিয়া বিরলে
থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।
সদাই ধেয়ানে
চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে
রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।।"

রসতন্ময়ে রাধা নাম শুনেই প্রেমাকুল:

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

অভিসার বর্ণনায় চণ্ডীদাস— শ্রীরূপগোস্বামীর পূর্ববর্তী কালেও এদেশের কাব্যসাধনায় আলঙ্কারিকদের প্রাধান্য ছিল। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলীতেও বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের

প্রভাব যথেষ্ট। জীবনকে অনির্বচনীয় উপলব্ধির মধ্যে দেখেছেন কবি:

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।
সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ।।
নহি স্বতন্তর গুরুজন ডর
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ।।"

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস। ইহার মধ্যে শৃঙ্খলাটি কোথায়? সে শৃঙ্খলা পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না, তাহা কতখানি। যাহা বলা হইল না, পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গভঙ্গ- এই উত্থান-পতন কত অল্পকথায়, কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ—চণ্ডীদাস বৈষ্ণব রসপর্যায়ে আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি। যে পিরীতিতে 'দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া', সেই প্রেমবৈচিত্র্য আক্ষেপানুরাগে এসে রূপান্তরিত হয়েছে বেদনার অন্তর্লীন সমুদ্রে। রাধার আক্ষেপ বাঁশির প্রতি, সর্বনাশা পিরীতির প্রতি ও আপনার প্রতি। সখীদের ও কৃষ্ণকে ডেকে দূতী সম্বোধনে, স্বগত কথনে গাঢ় অনুরাগ মিশ্রিত আক্ষেপ শুনিয়েছেন। ব্যাকুল প্রকাশনের মাধ্যমে অনুরাগের রঙ গাঢ়তম হয়েছে:

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
....
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।

কৃষ্ণকে সামনে রেখে প্রাণত্যাগ করবেন— প্রেমের ক্ষেত্রে এর থেকে আর বড় বলিদান রাধা আর কি কল্পনা করতে পারেন।

৭.৪.১ চণ্ডীদাস বাংলা কবিভাষার জনক

বৈষ্ণব পদাবলিতে চণ্ডীদাসের ভাষা অনবদ্য। ভাষা, শব্দসম্পদে বাংলার স্বকীয় স্নেহ-অনুরাগ, সৌন্দর্যের ধারাস্নান, সুখ-দুঃখ নিঙড়ানো প্রেমের আর্তি, লোকচেতনার বিভিন্ন প্রকাশে চণ্ডীদাসের পদাবলির একটি নিজস্ব প্রকাশ রীতি আছে। কালিয়া বঁধু, পরাণপুতলী, বিনোদ বঁধুয়া, কুলের খাঁখার, কালিয়া ফাঁদ প্রভৃতি অসংখ্য স্নেহের অনুযোগ মিশ্র কৃষ্ণ সম্বোধনের শব্দ ব্যবহারে কবির আশ মিটতে চায় না। রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনাতেও কবি অনেক আবেগাকুল শব্দাবলির ব্যবহার করেছেন যেমন: হসিত বদন, জলদ বরণ কানু, এবার দোলনি গলার মালা, কুচযুগ গিরি কনক গাগরি, আউলাইয়া বেণী, চূড়ার টালনি এমন অসংখ্য শব্দবিশেষণে কবি অঙ্কিত করেছেন তাঁর ধ্যানের রাধা-কৃষ্ণকে।

কালিয়া বঁধুকে কত শত নামে ডেকেছেন শ্রীরাধা নাগর বিনোদ রায়, নন্দের নন্দন, গোকুলের কান, মদন সোনা। সমাজ ও পরিবার চেতনা বিভিন্ন পদে সুপরিচিত শব্দে প্রকাশ করেছেন চণ্ডীদাস পরিবার ও সমাজচেতনা: কুলবতী নারী, কুলকলঙ্কিনী, অবলা-হখলা, কলঙ্কের ডালি, পতি গুরুজন, কুলের বৈরী, সতী কুলবতী, ননদী দারুণ, ননদি কাঁটা, ঘরে গুরুজন, কানুকলঙ্কিনী রাধা, হাটে মাঠে বাটে কুলটা খেয়াতি, কুলের রমনী। বাঙালি প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে সমাজ শাসনের প্রতিবন্ধকতা হৃদয়দ্রাবী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন পদাবলির চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের পদে ধ্বনি তরঙ্গের ঐশ্বর্য কম; ছন্দের তরঙ্গভঙ্গের দিকে তাঁর সচেতন দৃষ্টিই ছিল না একথা বলা যায়।

৭.৫ জ্ঞানদাসের কবিত্ব

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য ধারা বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করে। এই যুগে ভক্তিরসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরী প্রেম, রূপমাধুর্য এবং গভীর মানবিক আবেগও কাব্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। এই ধারার এক বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মী কবি হলেন জ্ঞানদাস, যিনি প্রেম, রূপ, শরীর ও চেতনার এমন এক সম্মিলিত রূপ কাব্যে উপস্থাপন করেন, যা তাঁকে কেবল চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য নয়, বরং এক স্বতন্ত্র রোমান্টিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়।

রচনার বিষয়বস্তু ও রসচর্চা

জ্ঞানদাস প্রেম ও ভক্তির মেলবন্ধনে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুর্য, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদাবলি। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'রূপানুরাগ'- সংক্রান্ত পদাবলি, যেখানে তিনি রাধার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্যাম তথা কৃষ্ণের রূপমাধুর্য বর্ণনা করেছেন। এই পদগুলোতে তিনি এমন এক রস ও কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা বাংলা রোমান্টিক গীতি কাব্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে। তাঁর পদাবলিতে আমরা এক চিত্রকর কবির পরিচয়, যেমন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।।"

এই শীর্ষক পদটি জ্ঞানদাসের কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানে রাধা কৃষ্ণের রূপে এতটাই মোহিত যে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। কবি যেন এক চিত্রকর; তাঁর তুলির টানে পাঠকের চোখের সামনে রাধার অভ্যন্তরীণ রসাত্মক জগৎ ফুটে ওঠে।

চরণ 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে' শুধু রাধার শরীর নয়, তাঁর হৃদয়ের আকুলতাও ব্যক্ত করে। এটি কেবল কামনার প্রকাশ নয়, এক গভীর আত্মনিবেদনের স্বীকারোক্তি। এখানে শরীর ও মনের যুগলবন্দি দেখা যায়।

চণ্ডীদাস যেখানে শরীরকে গৌণ করে মনের প্রাধান্য দেন, সেখানে জ্ঞানদাসে শরীর ও মন— উভয়ের একত্র নিবেদন দেখা যায়। এটাই তাঁর কাব্যধর্মে মৌলিকতা এনে দেয়। রূপদর্শনে আত্মবিস্মৃতি জ্ঞানদাসের বহু পদে দেখা যায় যেমন-

"আলো মুই জানি না
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ।।"

এই পদের মাধ্যমে কবি ইন্দ্রিয়াতীত এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। রাধার চোখ কৃষ্ণরূপের সমুদ্রে ডুবে যায়। তাঁর মন যৌবনের বনে পথ হারিয়ে ফেলে। এই কাব্যে রাধা যেন শুধু প্রেমিকাই নন, তিনি এক রূপভিক্ষু, যিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রেমে বিলীন। ইন্দ্রিয়ের সীমানা ছাড়িয়ে জ্ঞানদাস যে প্রেমানুভবের কথা বলেন, তা বৈষ্ণব সাহিত্যে তুলনাহীন।

কৃষ্ণ-রাধার রক্ত-মাংসের রূপায়ণ

জ্ঞানদাস তাঁর কবিতায় কৃষ্ণ ও রাধাকে দেব-দেবীর আসনে বসিয়ে কেবল পূজা করেননি। বরং তিনি তাঁদের রক্ত-মাংসের বাস্তব মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এতে রাধা হয় প্রেমিকার রূপে, আর কৃষ্ণ হয়ে ওঠেন কাম্য পুরুষ। প্রেম এখানে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে মানবিক অনুভবেই স্থিত।

অন্যান্য কাব্যবিষয় ও কাব্যপ্রবণতা

পূর্বরাগের পদ: জ্ঞানদাস এই রসে দারুণ সিদ্ধহস্ত। প্রেমের প্রথম উত্তাপ, আকুলতা, অস্থিরতা তাঁর পদে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অভিসার রসে দুর্বলতা: প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের অভিযানে বা পথচলায় তিনি তেমন সার্থক হননি।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলি: এই ক্ষেত্রে তাঁর কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে পূর্ণমাত্রায়। যেমন: 'কি মোহন নন্দকিশোর' পদে গৌরাঙ্গের রূপ এতই মনোহর যে স্বয়ং মদনদেব আকৃষ্ট হন।

ভাষা ও শৈলীতে বৈচিত্র্য

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই ছিলেন পারদর্শী। কাব্যভাষায় তিনি ছিলেন সাবলীল, সুললিত, এবং প্রাঞ্জল। তাঁর কাব্যে চিত্রকল্প, উপমা ও রূপকের ব্যবহারে এক অভিনবতা দেখা যায়, যা তাঁকে রোমান্টিক ধারার কবি হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচিতি দেয়।

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা

জ্ঞানদাস কাব্যজীবনের শুরুতে বিদ্যাপতি, বসু রামানন্দ ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে রচনা করলেও, পরিণত বয়সে তিনি মূলত চণ্ডীদাসের ভাব, ভাষা ও নির্মাণপদ্ধতিকে অনুসরণ করেন। এজন্য তাঁকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়। কিন্তু কাব্যে রূপপ্রেম, দেহমুগ্ধতা, চিত্রধর্মিতা এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের মাধ্যমে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। জ্ঞানদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের এক অনন্য রোমান্টিক কবি। চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হলেও তিনি কেবল অনুকরণে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তাঁর কাব্যে প্রেম, রূপ, কামনা ও আত্মনিবেদন একত্রে প্রকাশ পেয়েছে। শরীর ও মনের সংমিশ্রণে গড়া তাঁর রাধা-কৃষ্ণ এক বাস্তব মানব-মানবী। তিনি কাব্যভাষার দিক থেকেও ছিলেন অত্যন্ত সাবলীল ও কল্পনাশীল। এই কারণেই বাংলা রোমান্টিক গীতি সাহিত্যে জ্ঞানদাস এক স্মরণীয় নাম হয়ে আছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। রূপানুরাডোর পদে জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৬ গোবিন্দদাস কবিত্ব

পদকর্তা গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও সপ্তদশ শতাব্দীর দুদশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গোবিন্দদাস মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদ সাহিত্যের এক বিরল ও উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন কবি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় দর্শনানুযায়ী তাঁর পদের বিষয়বস্তু ও ভাব। মণ্ডন কলানৈপুণ্যে, ছন্দঝঙ্কারে ও শব্দব্যবহারের সুমিত কৌশলে তিনি বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী।

জীবন : 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' এ দুটি মহান্তচরিতকাব্য থেকেই গোবিন্দদাসের জীবন সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়। 'সঙ্গীত দামোদর' রচয়িতা দামোদর সেন গোবিন্দদাসের মাতামহ তিনি শাক্ত। কিন্তু গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব। প্রথম জীবনে পিতৃ বিয়োগের পর মাতামহের প্রভাবে এসে তিনি শাক্ত মতের পরিবারে জীবন কাটান। উত্তরযৌবনে (অন্তত ৪০ বৎসর বয়সে) শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব

পদগুলি থেকে কবি ভক্ত ও মঞ্জরী ভাবের সাধক বলে মনে হয়। তাঁর অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ ও কনিষ্ঠ গোবিন্দদাস বৈষ্ণবভক্ত ও কবি। গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ ও পৌত্র ঘনশ্যামদাস এঁরাও বৈষ্ণবপদকর্তা ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাঁর জন্ম সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন। তেলিয়া-বুধরী গ্রামে তাঁর বাস ছিল জীবনের প্রথম দিকে।

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ : কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাবমূর্তিই গোবিন্দদাস কবিরাজের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে রসমূর্তির ছবি। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বৈষ্ণবশাস্ত্রের তাত্ত্বিক ধারণা গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকায় মেলে। প্রাণরসে প্রাণবন্ত তাঁর কবিতা। 'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে'— চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক মূর্তি। 'নীরদ' অর্থাৎ মেঘরূপী কৃষ্ণ মহাপ্রভুর 'নয়নে' লেগে আছে। যেই বিরহে নীল নীরদ 'মেঘ' থেকে অবিরত প্রেমবারি সিঞ্চিত করছে চৈতন্যরূপ কদম্বপুষ্পকে। সেই প্রেমের পাবনী ধারায় গৌরাঙ্গ পুলক-কণ্টকিত। তার পর স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব কদম্ব'। স্বেদ বৈষ্ণবদের অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের একটি অংশ। ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর দেহ বেয়ে পড়ছে সুগন্ধী ঘর্ম। নিত্যবৃন্দাবনে মহাভাব স্বরূপিনী রাধার প্রেমের প্রকাশ কদমবৃক্ষের তলে। রাধাভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেই একই অবস্থা। অতঃপর কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর, বাহ্য অর্থ সহজ কিন্তু গৌরকিশোরের কৈশোরত্ব বৃন্দাবনের চিরকিশোর কৃষ্ণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তারপর:

"অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।"

বৈষ্ণব দর্শনে তিনি:

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করণয়াবতীর্ণঃ কলো।'

—অনর্পিত বস্তু যিনি দান করেন তিনি অভিনব কল্পতরু।

'চঞ্চল-চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।'

কীর্তনরক্ত ভক্তপরিবেষ্টিত চৈতন্যের তথা গৌরাঙ্গের বাস্তব ছবি। 'চঞ্চল চরণ কমল' গৌরাঙ্গর, কারণ ভারতের সর্বত্র তিনি প্রেমরত্ব বিলিয়েছেন মানুষকে নির্বিচারে। বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী শ্রীচৈতন্য যুগধর্মপালক ও কলিকলুস অপহরণকারী। তাই তাঁর প্রেমের 'পরিমলে সুরাসুর ধাবই' দেবতা ও অসুর সবাই তাঁর প্রেমপ্রার্থী। সবশেষে হৃদয়বিদীর্ণকারী পদকর্তার দীর্ঘনিশ্বাস যে গৌরাঙ্গ দেব পূরণ করেন 'অখিল মনোরথ' অর্থাৎ জগতের বিশ্বপ্রেমলাভের আকাঙ্ক্ষা সেই পুরুষোত্তম গৌরচন্দ্রকে গৌবিন্দদাস চোখে দেখার সুযোগ পাননি। শ্রীচৈতন্য তিরোধানের বহু পরে গোবিন্দদাসের জন্ম তাই তাঁর অসামান্য ভণিতায় বলেন:, 'তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত-গোবিন্দদাস বহু দূর'।

অভিসার, রূপানুরাগ ও ভাবোল্লাসের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস:

অভিসারের পদে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়। রূপানুরাগের পদেও ভক্তিস্পন্দন ও আর্টিস্টসূলভ তন্ময়তা আছে। যেমন:

রূপানুরাগ :

"নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীতবসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা।।"

অন্যদিকে—

"নন্দনন্দন চন্দচন্দন
গন্ধনিন্দিতঅঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বু কন্দর
নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ।।"

এ পদটিতে ভাষাগত চাতুর্য থাকলেও রূপানুরাগের পদে কবি গোবিন্দদাস তন্নিষ্ঠ। বিদ্যাপতির অনুসরণে তাঁর পূর্বরাগের পদও অনেকটা রূপানুরাগের পর্যায়ভুক্ত:

পূর্বরাগ:

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি।।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।।

—পদটিতে কাব্যসৌন্দর্যের যে মাধুরী আছে তা পদটিতে অনন্য। রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমকে 'যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ' বলেছেন রাধার পূর্বরাগে সেই সংরক্ত আবেগ প্রকাশিত গোবিন্দদাসের পদে। রাধা করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের স্তুতি গান করেন:

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ।।

অভিসার:

অভিসার কেবল বৈষ্ণব পদাবলিরই বিশেষ পর্যায় নয় সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে কালিদাস, জয়দেব ও অমরুর অভিসারও সৌন্দর্য তন্ময়। গোবিন্দদাসের রাধা 'কুঞ্চিত কেশিনী', 'নিরূপম-বেশিনী' ও 'রসআবেশিনী'। তিনি শ্যামের 'হৃদয়বিহারিণী'। দুর্গম পথে অভিসার যাত্রায় রাধা দুর্জয় সাহসিকা। এই অভিসারের পদগুলিতে গোবিন্দদাস চিত্র ও ধ্বনি ও নাটকীয়তার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পৌষের শীতার্ত রাত্রিতে উত্তুরে হাওয়ায় যখন প্রবল শীত তখন ব্রজরমণীগণের মুকুটমণি রাধা অভিসারে যান। উষ্ণ শয্যা ত্যাগ করে শুভ্রবস্ত্রে শরীর ঢেকে রাধা চলেছেন কুড়ে দয়িত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশায়। গ্রীষ্মকালে আতপ্ত সূর্যের বহ্নিস্পর্শে রাধার কোমল চরণদুটি

দগ্ধ হয় তবু সেই তপ্ত বালিতে পা রেখে রাধা চলে যান বুদ্ধে অভিসারের সঙ্কেতকুড়ে। বর্ষা রজনীতে অভিসারিকা শ্রীরাধা পায়ের নুপূর বেঁধে পা টিপে টিপে চলা অভ্যাস করেন। পথে সর্পভয় হই সর্প বশীকরণ বিদ্যা রাধা আয়ত্ত করেন। নিজের হাতের কঙ্কণ মূল্য স্বরূপ দান করেন সাপুড়ে বা সর্পগুরুকে। তাই জয়দেবের সখী রাধাকে বলেন:

'চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্।'

গোবিন্দদাস কুঞ্জগামিনীকে যথার্থ দুঃখসহনকারিণী অভিসারিণীতে রূপান্তরিত করেছেন। এ যেন গীতার অভ্যাসযোগ রাধার অভিসারে ধরা পড়েছে। অভিসারের পদের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা অভিনব। মন আশঙ্কায় দোলায়িত তাই সখি বলেন:

"সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।।"

এরপর ঘনবর্ষণ-বজ্রপাত ও বিদ্যুৎচমক। দুর্যোগ আসুক তবু রাধা ছুটে চলেন কুলমর্যাদা, স্বীয়মর্যাদা হারিয়ে তাঁর প্রিয়তমের সন্ধানে:

অম্বরে ডম্বর তরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির ন হেরি নিজ দেহ।।
অন্তরে ঔয়ল শ্যামর ইন্দু।
ঔছলল মনহি মনোভব সিন্ধু ।।

গোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতা লাভ করেছে। তিনি শ্রীচৈতন্যকে শুধু একজন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, বরং এক দিব্য মূর্তি, প্রেমময় কৃষ্ণতত্ত্বের আধার হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর পদে রস, ছন্দ, অলঙ্কার ও নাট্যধর্মিতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিদ্যাপতির ভাবধারা অনুসরণ করেও গোবিন্দদাস নিজস্ব কাব্যভাষা ও চৈতন্য-ভক্তির উন্মাদনায় বৈষ্ণব পদাবলিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাই গোবিন্দদাসের কাব্য শুধু সাহিত্যিক উৎকর্ষের নিদর্শন নয়, বরং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এক জীবন্ত ও চিরস্থায়ী প্রকাশ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৭ শাক্ত পদাবলির বিষয়বস্তু

শাক্ত বিষয়ক ধর্ম চেতনার প্রাচীনতম পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে। যদিও শক্তিপূজার প্রধান উৎস হল অথর্ব বেদ। তবে মনে রাখার বিষয় শক্তিতত্ত্বে শক্তি হলেন তন্ত্রের উপাস্য। বেদে দর্শনে পুরাণে শক্তিতত্ত্বের আভাস থাকলেও তন্ত্রের মাতৃশক্তিই শাক্তদের আরাধ্য। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র তাই শক্তি দেবীই 'আদ্যা', 'অদ্বিতীয়া', 'অক্ষরা', 'পুরাণী'। 'দেবীপুরাণ' অনুসারে

রাধা, বরেন্দ্র কামরূপ, কামাক্ষ্যা, ভট্টদেশ (তিব্বত) প্রভৃতি স্থানে দেবী বামাচারী রূপে পুজা পান যা পরবর্তীতে শক্ত সাধকদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং দেবীপুরাণ অনুসারে বাংলা তথা আমাদের দেশে শাক্ত পূজার অবির্ভাব খ্রিঃপূ ৭-৮ এর মধ্যেই কিংবা তার কিছুকাল পূর্বে। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু জানিয়েছেন, 'অনার্য জাতির প্রভাবেই হোক বা আর্য ধর্মবিশ্বাসের নিজস্ব প্রেরণাতেই হোক, শক্তি উপাসনা প্রত্ন ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা গৃহীত হয়ে সমগ্র ভারতে কালক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তন্ত্রের সহায়তায় একটি বিশিষ্ট ধর্মপন্থায় পরিণত হয়েছিল।' তন্ত্র সাধকরা মনে করেন বিশ্বভুবনে এক মহা শক্তির লীলা চলছে। সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস থেকে বিশ্বের যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির লীলা। আসলে শাক্ত মতে শিব ও শক্তির মিলিত রূপেই এই জগৎ। এক মহাশক্তিই বিভিন্ন ভাবে অপ্রাকৃত ও প্রকৃত সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হচ্ছেন ইনিই পরাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী। ইনিই আবার 'আদ্যা' শক্তি। তন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রাণীমাত্রকে সংহার করেন বলে যিনি মহাকাল তাকে যিনি সংহার করেন তিনিই আদ্যা, পরা, কালিকা, তিনি কালকে গ্রাস করেন বলেই তিনি কালী। শাক্ত সাধকগণ মাটির মূর্তিতে তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অন্যের কাছে যা মৃন্ময়ী সাধকগণের কাছে তাই চিন্ময়ী। আর এই চিন্ময়ীকে উপলব্ধির জন্য উপাসনার দরকার। দিব্যজীবনে অধিষ্ঠিত হওয়াই শাক্ত সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ক্রিয়ামূলক এই সাধনার প্রথম স্তর ভাব ও ভক্তি। এরপর আসে দীক্ষা। পূর্ণ দীক্ষা হলেই সাধকগণ দিব্য সাধনার উপযোগী হতে পারেন। দীক্ষা গ্রহণের পর মাতৃপূজা। তান্ত্রিকদের মন্ত্রের মাধ্যমে এ পূজা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের দৃষ্টিতে মন্ত্র আর দেবতা অভিন্ন। মহাশক্তির প্রকাশ হয় নাদে। এই নাদের স্থুল প্রকাশ মন্ত্রের ধ্বনি, বর্ণ সেই ধ্বনির প্রতীক। তাই বীজমন্ত্র জপের রীতি আছে। শাক্তদের এরূপ সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তন্ত্র সাধনার দেহ সাধনা ব্যাপারটি। মূলত এই সাধনার মূল লক্ষ্য পরম শান্তি শুদ্ধ, অদ্বৈত শিবজ্ঞানে বা দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

পুরাণ ও তন্ত্রে শক্তি দেবী হলেন ভয়ঙ্করী। তবে তিনি যে কেবল ভয়ঙ্কর নন সাধক ভক্তদের জন্য শুভ মঙ্গল বার্তা বহন করে আনেন তার জন্যেও তিনি মাতৃ স্বরূপা। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন,— 'Kali appears to be divine mother hood' —এই নিগূঢ় অনুভূতির কথাই শাক্তকবিরা তাদের শাক্ত সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শাক্ত কবিরা মূলত বেদ, পুরাণ এবং বিভিন্ন দর্শনে যে শক্তি দেবীর আরাধনা করা হয়েছে, সেই শক্তি তত্ত্বকেই কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তেমনি তারা পেয়েছেন আরাধ্য দেবীর কৃপায় শতদুঃখে বিদীর্ণ পৃথিবীর অপরূপ রহস্যালোকের সন্ধান। একদিকে 'আগমনী-বিজয়া' পর্বে রয়েছে মাতৃরূপা দয়াময়ীর চিত্ররূপ আর অন্যদিকে রয়েছে অসুরবিনাশিনী মায়ের ভয়ঙ্কর প্রতিরূপ।

৭.৮ রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের ঈষৎ পূর্বে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি শাক্ত গীতিকার না হলেও শাক্তমতের কবি ছিলেন এবং দেবী অন্নদার প্রতি তাঁর মনোভাব শাক্ত কবিদের মতোই একনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু শাক্ত পদাবলিকে কবিত্বের উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরে তাতে একপ্রকার সুগভীর

সুর সংযোজনা করে এবং কবিত্বের সঙ্গে সাধনার ধারা সংযোজিত করে সাধককবি রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম কক্ষে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছিলেন।

'কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে' রামপ্রসাদ যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রামপ্রসাদের ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে চেষ্টা করে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ধার করেন। এ পর্যন্ত যাঁরাই রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই ঈশ্বর গুপ্তের তথ্য ব্যবহার করেছেন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ খুব প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্যানুসারে মনে হয়, আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রিস্টাব্দে রামপ্রসাদ হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। রামপ্রসাদ পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। রামপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা- রামদুলাল, রামমোহন, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। কবি কলকাতার কোনো ধন্যাঢ্য জমিদারের বাড়িতে মুহুরিগিরি করতেন। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, কবি জমিদারি সেরেস্তার খাতায় 'আমায় দাও মা তবিলদারী' গানটি লিখে উপরিতন কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু সহৃদয় জমিদার কবিকে কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিশ্চিন্তে সাধন ভজন করবার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন ভূস্বামী নির্লোভ কবিকে জমিজমা ও বৃত্তি দিয়েছিলেন। আপনভোলা কবি অর্থের ব্যাপারে চিরকাল উদাসীন ছিলেন। ফলে তাঁর দারিদ্র্যদশা কোনো দিন ঘোচেনি। তিনি শুধু সাধক ও কবি ছিলেন না, একজন ভালো গায়কও ছিলেন। নিজের গানে তিনি যে সহজ সাদামাঠা সুর দিতেন, তা-ই 'প্রসাদী সুর' নামে প্রচলিত। এখনও সেই প্রাণগলানো সুর পথভিখারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও রামপ্রসাদী গান এখনও পর্যন্ত জনপ্রিয়তা রক্ষা করছে। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গান শোনবার জন্যই কবির গ্রামের নিকটে নিজের কাছাড়ি বাড়িতে অবস্থান করতেন। উপযুক্ত বয়সে সাধক-কবি শ্যামাপূজার বিসর্জনের সায়াহ্নে ভাগীরথীজলে সজ্ঞানে তনুত্যাগ করেন।



আসুন জেনে নেই

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে দু'-এক কথা বলা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে আর একজন শাক্ত কবি ও সাধক রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও অনেক চমৎকার পদ লিখেছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সে-যুগে পূর্ববঙ্গের মাঝিমল্লাদের পরম ভক্তিভরে দ্বিজ রামপ্রসাদের গান গাইতে শুনেছিলেন। এখন রামপ্রসাদের পদাবলী নামে যে সংগীত সংগ্রহ ছাপা হয়ে থাকে, তাতে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ স্থান পেয়েছে তা অবিকল রামপ্রসাদ সেনের গানের মতোই। কাজেই শুধু ভাষা দেখে কোনটি রামপ্রসাদ সেনের আর কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের তা নির্ণয় করা যায় না। অনেক সময় পুথির লিপিকার এবং গায়কেরাও দুই কবির ভণিতা গোলমাল করে ফেলেছেন। রামপ্রসাদ চক্রবর্তী বলে আর একজন আধুনিক কালের

কবিওয়ালাও অনেক পদ লিখেছিলেন এবং শুধু 'রামপ্রসাদ' ভণিতা ব্যবহার করেছিলেন। ফলে এতে গোলমালের কারণ বেড়েই গেছে। যে সমস্ত পদে আধুনিক ধরনের শব্দবিন্যাস আছে সেগুলি যে কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা তাতে সন্দেহ নেই।

আজু গোঁসাই নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত -কবি রামপ্রসাদের গ্রামেই বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদের বেশ কৌতুকাবহ কবিতার লড়াই হত। একজন ছিলেন বৈষ্ণব, আর একজন শাক্ত; সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের মধ্যে কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ বাক্যবিনিময় হত। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণ বাক্য বিনিময় গানের আকারে এখনও প্রচলিত আছে।

রামপ্রসাদ কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন নামে দু-খানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেছিলেন, তার মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের যৎসামান্য পাওয়া গেছে। কিন্তু কালীকীর্তনের পুথি দুর্লভ নয়। এতে তিনি বৈষ্ণব পদাবলির ছাঁদে উমার বাল্য ও গোষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলতেই হবে যে, কালীকীর্তনে রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ পায়নি। উমা কৃষ্ণের মতো মাঠে গিয়ে গোরু চরাচ্ছেন, বাঁশি বাজিয়ে গোরুকে ডাক দিচ্ছেন-এ বর্ণনা অনেক স্থলেই হাস্যকর। এই বিসদৃশ বর্ণনাকে ব্যঙ্গ করে আজু গোঁসাই নামে তাঁর সেই প্রতিবেশী বলেছিলেন— "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" - "না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।" কালীকীর্তনের ওপর রামপ্রসাদের কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাঁর যা কিছু খ্যাতি, তা তাঁর শাক্ত গানের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে মুদ্রিত রামপ্রসাদের পদাবলির সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। এখন তা বেড়ে বেড়ে প্রায় তিনশ'তে দাঁড়িয়েছে। এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটা স্তর লক্ষ্য করা যায়: (১) উমা-বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), (২) সাধন-বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), (৩) দেবীর বিরাট স্বরূপ-বিষয়ক, (৪) তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক। এর মধ্যে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদের সংখ্যাও অল্প, গুণগত উৎকর্ষও অল্প। সাধন-বিষয়ক পদে কবি নানা উপমা রূপকের মধ্য দিয়ে নিজের সাধনার কথা আভাসে ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব ও নীতির বিষয়ে তিনি যে সমস্ত গান লিখেছিলেন, তাতে শুদ্ধ নীতি ও নিষ্করুণ বৈরাগ্য ব্যতীত আর কোনো উচ্চতর অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু আদ্যাশক্তির স্বরূপ এবং তাঁর সঙ্গে কবির বাৎসল্যরসের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। উমার বাল্যলীলাসংক্রান্ত যে-পদটি রামপ্রসাদের ভণিতায় চলে ('গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে'), বৈষ্ণব পদাবলিতেও তার সমকক্ষ বাৎসলারসের পদ দুর্লভ।

রামপ্রসাদের বহু পদ প্রবাদবাক্যের মতো সমগ্র দেশের কণ্ঠে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ নির্বেদ-বৈরাগ্যের গান:

'প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।'

কিংবা

'রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমলমধু মত্ত হলি বিষয়রসে।'

অথবা :

'মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।'

এগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। সংসার-জ্বালায় জর্জরিত কবি কখনও কখনও বিষণ্ণ কণ্ঠে গান ধরেছেন:

'আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দাও মা দুঃখ আর কত চাই।।'
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোনো খানেতে যাই
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।

পরিশেষে দুঃখের বড়াই করে কবি শান্তি লাভ করেছেন:

'প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই।'

কবি অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু 'আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হল।' সমস্ত জীবন বৃথাই কেটে গেল, কবির সেই বার্থ জীবনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস বড় করুণ হয়ে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে:

'মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল।'

রামপ্রসাদের নিরাভরণ প্রাণের বাণী এমনি সাদা কথায় ধরা পড়েছে। শ্যামার সঙ্গে তাঁর মা-ছেলের সম্পর্ক, মান-অভিমানের সম্পর্ক-এমনকি কটুকথার সম্পর্ক। আদ্যাশক্তিকে এমনভাবে মর্ত্য-জননী রূপে খুব কম সাধকই আঁকতে পেরেছেন। কবি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন বটে, কিন্তু সেই দুঃখকে স্বীকৃতি দেননি। দেবী কালিকার গান স্মরণ করে তিনি অনায়াসে ভবার্ণব পার হয়ে গেছেন। তাই তাঁর পদ আশাহীন মানুষের বড় সান্ত্বনাস্থল, বাস্তব দুঃখের একমাত্র প্রতিষেধক। তত্ত্বসাধনার সঙ্গে বাস্তব জীবন ও সুখদুঃখের এমন নিবিড় সংযোগ অন্য কবির খুব অল্প পদেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলির মতো রামপ্রসাদের গান বৈকুণ্ঠের গান নয়, তার সঙ্গে ধুলি ও ধরিত্রীর নিবিড় যোগ আছে বলে আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়েও তার কাব্যরস উপলব্ধি করা যায় যে কাব্যরস বাস্তব-জীবনকে অবধারণ করে আছে। শ্যামার সন্তান রামপ্রসাদ অধ্যাত্মসাধনা, বাস্তবতা ও কাব্যরসের ত্রিবেণী রচনা করে ভক্তির গীতি-সাহিত্যকে নতুন সার্থকতার পথে প্রেরণ করেছেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবি অধুনা নামমাত্রে পর্যবসিত, তাঁদের কাব্যাদি পড়ুয়া ছাত্র ও গবেষকের অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রায় দুশো বছর আগে লোকান্তরিত রামপ্রসাদ সেন এখনও প্রবাদবাক্যের মতো বেঁচে আছেন, তাঁর অলৌকিক জীবন সম্বন্ধে কত গালগল্প গড়ে উঠেছে। তাঁর গানগুলি উদার আকাশের মতো বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায়

মনের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা বিক্ষোভ-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। বাঙালির হৃদয়ে তাঁর আসন চিরদিন অটুট থাকবে।

৭.৯ সাধক কমলাকান্ত

বাংলার শাক্ত পদসাহিত্যের আর একজন কবি ও সাধক প্রায় রামপ্রসাদের মতোই গৌরব লাভ করেছেন, তাঁরই মতো স্মরণীয় হয়েছেন এবং ভক্তিরস, সংগীতরস ও কবিত্বে তিনি রামপ্রসাদের সমকক্ষতা লাভ করেছেন। তিনি বর্ধমান-নিবাসী সাধক ও কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাঁর অলৌকিক জীবন-কথা রামপ্রসাদের মতোই জনপ্রবাদের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কমলাকান্ত প্রথম জীবনে 'সাধক-রঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ বাংলা কবিতায় রচনা করেছিলেন-তার শেষে কবি যে যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বর্ধমান নিবাস কালে তিনি বর্ধমান রাজবাটীর গভীর সংস্পর্শে আসেন, উক্ত রাজারা তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন। লোকান্তর প্রাপ্তির পর বর্ধমান রাজবাটী থেকে তাঁর প্রামাণিক পদসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু কাহিনিও সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা গ্রাম। বাল্যবয়সে তিনি সংস্কৃত টোলে পাঠ করে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হলে তিনি বর্ধমানে (খানা জংশনের নিকট) চামা গ্রামে মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং এখানে প্রতিপালিত হন। তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানরাজেরা তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন, তাঁকে সভা-পণ্ডিতও করেছিলেন। কোনো কোনো রাজকুমার তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুই বিবাহ হয়েছিল। স্থানীয় মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসন বানিয়ে তিনি সাধনভজন করতেন, টোল খুলে সংস্কৃত বিদ্যাদান করতেন এবং অবসর সময়ে শ্যামা-সংগীত রচনা করতেন। তিনি একখানি ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত কাব্য লেখেন, তার নাম 'সাধক-রঞ্জন', সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এটি তন্ত্র-সাধনা-বিষয়ক কাব্য হলেও এতে অনেক স্থলে চমৎকার কবিত্ব লক্ষ করা যায়। তাঁর জীবন-কথা অধ্যাত্ম ঘটনার মোড়কে পরিবেশিত হয়ে এখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিকা নাকি বাগদিনী বেশে তাঁর কাছে এসে মাছ জুগিয়েছিলেন। দস্যুর দল তাঁকে মেরে-ধরে টাকা-কড়ি নিতে এসে তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে শরণ নিয়েছিল। রামপ্রসাদের মতোই তাঁর জীবন নানা অলৌকিক গালগল্পে পূর্ণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবার কথা হয়, তখন মুমূর্ষ কবি ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন যে, গঙ্গা তাঁর জননী দুর্গার সতীন, তাহলে তিনি হলেন কবির সৎ-মা। সৎ-মার তীরে তিনি কেন যাবেন— "কি গরজ? কেন গঙ্গাতীরে যাব? আমি কেনে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব?" এখানে মানবরস ও ভক্তিরস এক হয়ে মিশে গেছে। বাস্তবিক তিনি গঙ্গার তীরে যেতে চাননি। তাঁর জীবনের সন-তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন, শুধু এইটুকু মাত্র জানা যায়।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশো পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার

গানগুলি অতি চমৎকার, রামপ্রসাদের চেয়েও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। মেনকার দুঃখবেদনা কবি অপরূপ কৌশলে ফুটিয়েছেন। মেনকা পাষাণহৃদয় স্বামী হিমালয়ের কাছে অনুযোগ করেন, কেন তিনি কন্যাকে পিত্রালয়ে আনছেন না। অবশেষে গিরিরাজ উমাকে এনে দিলেন মেনকার কাছে

'গিরিরাণী, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবনধন।।'

মা মেনকা তখন কন্যা উমাকে নিয়ে কত আদর-যত্ন করলেন। কিন্তু নবমীর নিশি অবসান হতে না হতেই হর এসে উমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তখন মেনকা আর কি করবেন, শুধু ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন:

'ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।
এইখানে দাঁড়াও উমা
বারেক দাঁড়াও মা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।'

বাঙালি মায়ের কন্যা বিরহের বাস্তব বেদনা গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করেছে এছাড়াও কালিকার স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা-সংক্রান্ত কয়েকটি গান রামপ্রসাদের থেকে কোনো দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়, বরং কবিত্ব বিচারে উৎকৃষ্ট। যেমন:

১। সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি।।

২। তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি। কালী মনোমোহিনী এলোকেশী।।

৩। শুকনো তরু মঞ্জুরে না ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে। তরু পবনতলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে।

৪। মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে। যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে।

এ সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ। বরং রামপ্রসাদের ভাষা কিছু শিথিল ধরনের। কবির মনোভাবও খুব উদার ছিল। শ্যাম ও শ্যামাকে একীভূত করে তিনি গেয়েছেন:

জান না রে মন
পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ কখন কখন পুরুষ হয়।।
করিয়ে ধারণ
হয়ে এলোকেশী
করে লয়ে অসি

দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রহ্মপুরে আসি
বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।।

আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির এরকম সুষ্ঠু সমন্বয় রামপ্রসাদকে ছেড়ে দিলে আর কোনো শাক্তপদকারের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কবি কিছু কিছু বৈষ্ণব পদও লিখেছিলেন, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তার দাম বেশি নয়।

৭.১০ দাশরথি রায়

দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) স্বভাবকবি ও পাঁচালিকার। 'দাশু রায়' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার বাঁধমুড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা এবং পরে মাতুলের প্রচেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিখে দাশরথি স্থানীয় নীলকুঠিতে কিছুকাল কেরানির চাকরি করেন। স্বভাব কবির গুণে তিনি একদিন আত্মীয়বর্গের আপত্তি সত্ত্বেও আকা বাঈর (অক্ষয় কাটানী) কবিয়াল দলে যোগ দেন এবং বিখ্যাত কবিয়াল নিধিরাম শুঁড়ির সঙ্গে কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। এরূপ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত আক্রমণে অপমানিত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কবিগান ছেড়ে দেন এবং ১৮৩৬ সালে আখড়া গঠন করে ছড়া ও পাঁচালি রচনায় মনোনিবেশ করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই দাশরথি খ্যাতনামা পাঁচালিকার হিসেবে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে উচ্চ প্রশংসিত হন। তাঁর বহুল জনপ্রিয় একটি ভক্তের আকুতি পর্যায়ের একটি গান হল-

'দোষ কারো নয় গো মা..
দোষ কারো নয় গো মা
দোষ কারো নয় গো মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা
দোষ কারো নয় গো মা,
দোষ কারো নয় গো মা..
আমার ধর্মাধর্ম হলো কুদণ্ড স্বরূপ
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
ধর্মাধর্ম হলো কুদন্ড স্বরূপ
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেঞ্জলি কাল রূপ জল
কালো মনোরমা, মা..
দোষ কারো নয় গো মা.....'

তিনি নিছক পৌরাণিক কাহিনি আশ্রিত ধর্ম ও ভক্তিরসের পাঁচালিকাব্য রচনা করেননি, বরং অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার যোগে ছড়ার চটুল ছন্দের ঝংকার, সঙ্গীতের সুরেলা মাধুর্য এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গরস যুক্ত করে পাঁচালিকে বিভিন্ন শ্রেণির শ্রোতাদের উপভোগ্য করে তোলেন, যা 'দাশুরায়ের পাঁচালি' নামে খ্যাত। ধর্ম, সমাজ, নীতিশিক্ষা, রঙ্গ-কৌতুক, শ্লীল-অশ্লীল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি গান রচনা করে নিজেই পরিবেশন করতেন। তাঁর গানগুলি রাগসুরে রচিত এবং তাতে টপ্পা অঙ্গের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বর্ধমানের মহারাজা এবং কলকাতার শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব তাঁর গান শুনে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ক ৬৪টি পালাভুক্ত প্রায় ৬৭৫টি গান রচনা করেন। সেগুলি সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৬৪টি পালার এক বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন।

দাশরথি পাঁচালি গীতির যে ধারার প্রবক্তা সেই ধারায় পূর্ববর্তীদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ নস্করের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীদের মধ্যে ঠাকুরদাস দত্ত, রসিক রায়, ব্রজমোহন রায় প্রমুখ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের (১৮৫৭) ২ কার্তিক দাশরথি রায়ের মৃত্যু হয়।

উল্লিখিত রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও দাশরথি রায় ছাড়াও আরও অনেক পদকর্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মধ্যে কিছু কিছু শাক্ত পদ লিখেছিলেন। বিশেষত ভূমিহীন ভূস্বামী ও তাঁদের কর্মচারীদের অনেকেই শ্যামার সেবক ছিলেন এবং বেশ কিছু প্রশংসনীয় শাক্ত পদ লিখেছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন, তাঁর নামে দু'-একটি পদও পাওয়া যায়। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ শাক্ত পদ লিখে খ্যাত হয়েছেন। তাঁর পুত্র শম্ভুচন্দ্রের 'চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?' কুমার নরচন্দ্রের (নবদ্বীপের রাজকুমার) 'যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই' এবং 'মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই' প্রভৃতি গানগুলি এখনও শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা রক্ষা করছে। দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি' নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'কালীপদ আকাশেতে মনঘুড়িখানা উড়তেছিল', এবং রামদুলালের 'শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি' গানগুলির সরল কবিত্ব ও একনিষ্ঠ ভক্তি প্রশংসার যোগ্য। ঊনবিংশ-এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও কেউ কেউ শাক্তগান লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামা-সংগীতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি করতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, শাক্ত পদ বৈষ্ণব পদের মতো কাব্যগুণে ততটা অলংকৃত না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অধঃপতনের দিনে এর ভাব, ভাষা ও ভক্তি শুভ-আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। এক যুগের হতাশ বাঙালির প্রাণে এই গানগুলি যে দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছিল, বিশ্বজননীকে ঘরের মায়ে পরিণত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব পদের মতো এ গানে সূক্ষ্ম কলারূপ না থাকতে পারে, কিন্তু আছে আতপ্ত জীবনের স্পর্শ।

৭.১১ অধ্যায় সংক্ষেপ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলি ও শাক্ত পদাবলি এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলিকার বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বিভিন্ন ধরনের পদ রচনা করেছেন যেমন- অভিসার, মাথুর, পূর্বরাগ, ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ধরনের পদ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে সম্যক পরিচয় ফুটে উঠেছে। এছাড়াও শাক্ত পদাবলিকার রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্তের কবি প্রতীভার বিস্তারিত ধারণা পাওয়া গিয়েছে।



৭.১২ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায়ে মধ্যযুগের একটি অন্যতম দুটি ধারা শাক্ত পদাবলি, বৈষ্ণব পদাবলির নানান রূপ রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা পাওয়া গেল।
- অধ্যায়টিতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক নানান পদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেলাম।
- এছাড়াও অধ্যায়টিতে শাক্ত সাধনতত্ত্ব, আগমনী বিজয়া পদের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হল।



৭.১৩ অতিরিক্ত পঠন

১। আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

২। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা, তুলসী প্রকাশন

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

৪। মুখোপাধ্যায়, শ্রী হরেকৃষ্ণ (সম্পা) (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ); বৈষ্ণব পদাবলী; কলকাতা : সাহিত্য সংসদ

৫। রায়, শ্রী অমরেন্দ্র (সম্পা) (১৯৬০); শাক্ত পদাবলী; কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



৭.১৪ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মিথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী ...এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৩ অংশটি)

২। জ্ঞানদাসের কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন... রূপদর্শনে জ্ঞানদাসের বহুপদে দেখা যায়। এইভাবে উত্তরটি তৈরি করুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৫ অংশটি)

৩। পদকর্তা গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন... অভিসার পদে তাঁর অভিনবত্ব দেখা যায়। এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৬ অংশটি)



৭.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

ক। বৈষ্ণব পদাবলীকার বিদ্যাপতির কবি প্রতিভার বিষয়ে আলোচনা করুন।

খ। চণ্ডীদাসের কবি কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

গ। বৈষ্ণব পদাবলিকার জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার বিষয়ে আলোচনা করুন।

ঘ। গোবিন্দদাসের কবি কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

ঙ। শাক্তপদাবলিকার রামপ্রসাদ সেনের কবি কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

চ। সাধক কমলাকান্তের কবিপ্রতিভার বিষয়ে সম্যক ধারণা দিন।

.....

অধ্যায় ৮ : বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৮.২ পরিচিতি
৮.৩ বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্যের বিষয়
৮.৪ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
৮.৫ উজ্জ্বলনীলমণি
৮.৬ পদকল্পতরু
৮.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
৮.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৮.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৮.১০ অতিরিক্ত পঠন
৮.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে অনন্তের সন্ধান এবং আত্মার পরম সত্যের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা। এই সাধন প্রক্রিয়ায় 'রস' একটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ ও নান্দনিক ভাবধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে এই রস ভক্তির স্বরূপ। বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে ভক্ত ও ভগবানের লীলায় আত্মনিবেদন করে চূড়ান্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এই ভাবধারায় প্রেম, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পঞ্চরসের বিভিন্ন রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা

- বৈষ্ণব রসতত্ত্বের গঠন, শ্রেণিবিন্যাস ও মৌলিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল প্রবক্তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
- সাহিত্যিক পাঠের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ভাষা, রূপক ও রস উপলব্ধি করতে পারবেন।

৮.২ পরিচিতি

ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাগুলো বহুপ্রাচীন। সময়ে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মতাদর্শ, দর্শন ও চিন্তার দ্বারা ভারতীয় আধাত্ম সাধনার ধারাগুলি বৈচিত্র্যময় ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় আধাত্ম সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মবোধ মোক্ষলাভ, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই সাধনার বিভিন্ন ধারা বা পথ প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনার প্রধান মার্গ গুলো হচ্ছে— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, তন্ত্রযোগ

ইত্যাদি। সাধনার এই পথগুলো ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও অনুশীলনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। জ্ঞানের মার্গ বা পথকে শাস্ত্রে শাণিত ক্ষুর ধারের পথ বলা হয়েছে। কারণ এ পথ সাধারণের পথ নয়, যে সাধনার দ্বারা দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, সে সাধনায় খুব কম লোকেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। দ্বিতীয় হচ্ছে কর্মের পথ— বিবিধ কর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম, দান, এই পথের অন্তর্ভুক্ত। এই মার্গ অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য বলে ভারতের সাধারণজন এই পথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই মার্গের যে তত্ত্বাঙ্গ রয়েছে, তার ভিতরে তাঁরা সহজে প্রবেশ করতে পারেনি। কর্ম মার্গ হলো নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করা, সেখানে ব্যক্তিকে তার ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই পথ কঠোর অনুশাসনের দ্বারা সম্পাদন করতে হয়। যা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সাধারণের মনে সংশয় সৃষ্টি করে, কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারে না। প্রাণে তৃপ্তি এনে দিতে পারেনি। তৃতীয় প্রধান মার্গ হচ্ছে ভক্তি মার্গ; ভক্তি মার্গের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম প্রেম ও আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা। এই পথে নিঃস্বার্থ প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন এবং নির্লিপ্ত ভাবে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে পারলে আত্মজ্ঞান বা মুক্তি লাভ করা যায়। জ্ঞানযোগের বেদান্ত, কর্মযোগের মীমাংসা মানব মনের সংশয় দূর করে শান্তি আনতে পারেনি। তাই জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারেনি। প্রাচীন ভারতীয় আধাত্ম সাধনার পথে লোকে ভক্তিতত্ত্বধারায় নিমজ্জিত হয়ে মোক্ষ লাভের পথ সুনিশ্চিত করেছিল। ভক্তি মার্গের যে পরম সত্য, তা কোনো জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না, কোনো ধন-কুল-মান এবং জটিল কর্মকাণ্ডের অপেক্ষা রাখে না। শুধু নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। ভক্তি মার্গ যখন এই শাশ্বত সত্যের সমাচার ঘোষণা করে, তখন জন সমক্ষে যেন ধ্বনিত হয়, হায় এতদিন কিসের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। সকল সংশয়ের সন্ধান পেয়ে ভক্তি মার্গ মানব-মনে শান্তি ও প্রেমের শাশ্বত বাণী প্রচার করে।

এই ভক্তির ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৌরাণিক যুগ অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়ে আসছে। নারদ, ধ্রুব প্রহ্লাদ, শুক, সনাতনের ভিতর দিয়ে দ্বিধারা বৈষ্ণবযুগে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ভক্তি সূত্র-আদি গ্রন্থের যোগেও ক্ষীণ ধারা বৈষ্ণবযুগের সাহিত্যে স্রোতসিনী রূপে বঙ্গভূমিকে প্রবাহিত করে ধন্য করে তুলেছিল। অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। তাঁর এই অদ্বৈত মতের প্রতিক্রিয়া করে দেখা দিয়েছিলেন রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য ও বল্লভ তাঁদের ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্য নিয়ে। এই চারজন বৈষ্ণবাচার্য ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবক ভাব প্রচার করেন। পরবর্তীকালে ভক্তি মার্গের পথ ধরে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণ ভারতের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব বঙ্গদেশকে প্লাবিত করেছিল। বঙ্গদেশে ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তিনি প্রথা সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভালোবাসা ও ভক্তির পথে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের মাঝে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা বলেন। তিনি ঐশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদ 'তত্ত্ব'- এর ভাষ্য তৈরি করেন। তাঁর দর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভিত্তি মূলত ভগবত পুরাণ, যা বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী

রামানুজাচার্যের প্রেমভক্তির পূর্ণাঙ্গ রূপ। কৃষ্ণই পরম সত্য এবং একমাত্র ঈশ্বর। তাঁর এই দর্শনকে আশ্রয় করে তাঁর অনুসারীগণ সংস্কৃত এবং বাংলায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

৮.৩ বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্যের বিষয়

বৈষ্ণব দর্শনকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল অবলম্বন রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণলীলা রসাত্মক পদ রচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি; রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক লৌকিক প্রেমমূলক পদ যা বৈষ্ণব প্রেম ধারার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করেছিলে। যেমন কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্, কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়, সুভাসিত রত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, অমরুশতক, গাথাসপ্তসই, ধ্বন্যালোক ধৃত বিভিন্ন লৌকিক প্রণয়নমূলক পদ উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে ষড়গোস্বামী অর্থাৎ রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনার ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। মূলত শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভে', গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই তিন পণ্ডিতদের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্ব ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৮.৪ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি অনবদ্য সৃষ্টি হচ্ছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামীর এই রচনা একটি আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত। এই গ্রন্থে ভক্তি ও শৃঙ্গারসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর গভীর মণীষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি রসকে অমৃত সমান সিন্ধুর রূপে স্থাপন করেছেন। ভক্তিরসতত্ত্ব বিশ্লেষণে শ্রীরূপ গ্রন্থটি চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই প্রতিটি ভাগ যথাক্রমে চারটি, পাঁচটি, পাঁচটি ও নয়টি লহরী বা উপপরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থটির প্রথম বা পূর্ব বিভাগে সামান্য বা সাধারণ ভক্তি, সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সংজ্ঞা নিরুপণ বৈশিষ্ট্যবলি আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও দক্ষিণ বিভাগে ভক্তি রসের বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব এবং স্থায়ী ভাবের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় অর্থাৎ পশ্চিম বিভাগে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর বা শৃঙ্গার রসের আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে গ্রন্থকার ভক্তিরসকে মুখ্য রস বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। গ্রন্থটির শেষ বা উত্তর বিভাগে হাস, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, মৈত্রবৈর ও রসাভাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও রসতত্ত্বের উপর যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তারই বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তাঁর এই গ্রন্থটি। ১৪৬৩ শকাব্দে বা ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচিত হয়েছে বলে তার পুষ্পিকা থেকে জানা যায়।

'ভক্তিরসামৃত' গ্রন্থে ভক্তি রসের বিবিধ বিভাগ ও উপবিভাগের আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিকে 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্' বলে সংজ্ঞায়িত করে শুদ্ধভক্তিকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যেমন— সাধন ভক্তি (যা অনুশীলনের দ্বারা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়); ভাব ভক্তি (যখন ভক্তির অভ্যাস গভীর আবেগে পরিণত হয়) এবং প্রেম ভক্তি (ভক্তির সর্ব্বোচ্চ স্তর, যেখানে কৃষ্ণের প্রতি অনির্বচনীয় প্রেম অনুভূত হয়)। সাধনভক্তি জন্মালে ভক্তের সমস্ত ক্লেশ দূর হয়ে শুভবোধ উৎপন্ন হয়। ভাবভক্তির উদ্ভবে মোক্ষলাভকে তুচ্ছ মনে হয়। প্রেমভক্তির উদয়ে ঈশ্বর স্বয়ং ভক্তের কাছে উপস্থিত হন। শ্রীরূপ গোস্বামী সাধন ভক্তিকে বৈধ ও রাগানুগা এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে গুরুপদকে আশ্রয় করে সাধন ভক্তির ৬৪ টি পদ আছে, তার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবতসার শ্রবণ, মথুরাবাস, এবং বিগ্রহ সেবা প্রধানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই সাধন ভক্তি লাভের উপায়কে নববিধা ভক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এই নববিধা ভক্তির উপায়গুলো হচ্ছে— কৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় লীন হতে পারলে কৃষ্ণের কৃপায় ও ভক্তের মনে ভবভক্তির উদয় হয়। এই অবস্থায় ক্ষান্তি, অব্যর্থ কালত্ব, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি ও কৃষ্ণতীর্থে প্রীতি প্রভৃতিগুলিকে ভাবোদয়ের বিবিধ লক্ষণ উদয় হয় বলে শ্রীরূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন।

শ্রীরূপ ভক্তিরসের সংজ্ঞা দিয়েছেন, "শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ীভাব 'কৃষ্ণরতি' বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিকভাব— ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা ভক্তিরস হইয়া যায়।" বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি; আলম্বন বিভাবের বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণ; কৃষ্ণভক্ত আধার। উদ্দীপন বিভাব হচ্ছে কৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন হাস্য, বংশী প্রভৃতি। অনুভাব হচ্ছে নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য, জৃম্ভণ প্রভৃতি আটটি সাত্ত্বিক ভাব ও তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব রয়েছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যা আস্বাদনীয় তা-ই রস। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের সমন্বয়ে রস উৎপন্ন হয়। স্থায়ীভাবে আশ্রয় হল আলম্বন ভাব। চিত্তের স্থায়ীভাব উদ্দীপন বিভাবে উদ্দীপিত হয়।

এই গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। শান্ত রস সম্পর্কে বলেছেন, সমস্ত জীবের প্রতি সমান ভাব বিদ্যমান থাকা শান্ত রস বলা হয়েছে, যেখানে সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, মাৎসর্যের স্থান থাকে না। শান্ত ভক্তিরস শম-প্রধান তপস্বীরা আস্বাদন করে থাকেন। তাঁরা ঈশ্বরকে সমস্ত কিছুর আশ্রয় স্বরূপ বলে জানেন। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, পতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজেদের সঙ্গে সংশিষ্ট বলে অনুভব করতে পারেন না। তাঁদের কাছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবৎস্ফূর্তিময় সুখ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বেশ ঘন ও মহৎ হয়। তাঁদের মতে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, হরি বিদ্বেশীর প্রতি দ্বেষহীনতা, জীবমুক্তির প্রতি আদর, নিরপেক্ষতা, নিরহংকারিতা প্রভৃতি অনুভাব পরিলক্ষিত হয়।

দাস্য রসের মূল বিষয় হলেন হরি এবং এই রসের আশ্রয় ও অবলম্বন হরির ভক্তরা বা দাসগণ। তাঁদের কাছে হরিই হলেন একমাত্র ঈশ্বর। তিনি একমাত্র গরীয়ান ও তুলনাহীন। এই

গ্রন্থে দুই প্রকার দাসের উল্লেখ আছে-- অধিকৃত আর আশ্রিত। ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র দেবতাগণ অধিকৃত; তিন প্রকার আশ্রিত আছেন যেমন উদ্ধবাদি পরিষদ এবং ব্রজ ও দ্বারকার অনুগ ভৃত্যগণ হলেন আশ্রিত। দাস্য ভক্তি জন্মালে ক্ষণিকের বিয়োগ সহ্য করা যায় না। এই অবস্থায় উদ্ধবাদি অনুগদের রাগ জন্মে। এই গ্রন্থে চিত্তদ্রবকারী নিবিড় প্রেমকে স্নেহ বলা হয়েছে। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসের প্রেম জন্মে কিন্তু পার্ষদগণে স্নেহের সঞ্চার হয়। দাস ভক্তির উদ্দীপন হল কৃষ্ণের অনুগ্রহ, চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিতে।

শ্রীরূপ গোস্বামী সখ্য রসকে প্রেয়ো রস বলে উল্লেখ করেছেন। জীব গোস্বামী বলেছেন মৈত্রীরস। সখ্য রসের স্থায়ীভাব হল বিস্রম্ভ বা সখ্যরতি। সখ্যে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে সঙ্কোচের লেশমাত্র থাকে না। এই গ্রন্থে প্রায় সমান দুজন সখার মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাসময় যে রতি তাকে সখ্যরতি বলা হয়েছে। এই রতি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে প্রণয়, প্রেম ও রাগে পরিণত হয়। শ্রীরূপ কৃষ্ণের সখাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যেমন — অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীবাসবিপ্র প্রভৃতি পুরাশ্রিত সখা, এবং শ্রীদাম, সুবলাদি গোকুলের সখাগণ। শেষোক্ত সখাদের আবার সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা ভেদে চার ভাগে ভাগ করেছেন। কৃষ্ণের থেকে যারা বয়সে কিছুটা বড় তাঁরা সুহৃদ এবং তাঁরা বাৎসল্যরূপ সখ্যভাব অনুভব করে। যাঁরা বয়সে কিছুটা ছোট এবং যাঁরা দাস্যগন্ধী সখ্য, কামী তাঁরাই সখা। যাঁরা কৃষ্ণের সমান বয়স্ক এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী তাঁরা প্রিয়সখা। কৃষ্ণের প্রেমলীলায় সাহায্যকারীরা হলেন প্রিয়নর্মসখা।

উক্ত গ্রন্থে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পিতা-মাতা ও সন্তানের যে সম্পর্ক থাকে তাকে বাৎসল্য রস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর স্থায়ীভাব বাৎসল্য রতি। আলম্বন ভাব কৃষ্ণ; উদ্দীপন বিভাব কৃষ্ণের কুমার বয়স, রূপ, স্মিতহাস্য, চাপল্য প্রভৃতি। মাতা যেমন সন্তানকে লালন-পালন করেন আবার তাদের ভৎর্সনাও করেন, বাৎসল্য রসে অনুরূপ ভাব বজায় থাকে। বাৎসল্য রসের অনুভাব হচ্ছে অঙ্গমার্জন, আর্শীবাদ, আজ্ঞা করা, উপদেশ দান এবং প্রতিপালন করা প্রভৃতি।

এই গ্রন্থে মধুর রস বা শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। মধুর ভক্তি রসের আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ ও কান্তাগণ; অনুভাব হচ্ছে নৃত্য, গীত, অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি এবং উদ্দীপন বিভাব হচ্ছে গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, স্মিত, বংশী, অর্থ ও সৌরভ ইত্যাদি। ব্যাভিচারী ভাব হচ্ছে নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি ইত্যাদি তেত্রিশ প্রকার। এই সব ভাবের সম্মিলনে মধুরারতির নামে স্থায়ীভাবের রস নিষ্পত্তি ঘটে। মধুর ভক্তিরসকে শ্রীরূপ গোস্বামী দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন-বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ পূর্বরাগ অভিসার মান, প্রবাস ভেদে চার প্রকার। মধুর রতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, যার নাম 'দুর্গম সঙ্গমণি'।

এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি শ্লোকে রাধাকান্ত কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও গুরু সনাতনের বন্দনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য বন্দনায় শ্রীরূপ চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই

গ্রন্থে তিনি প্রেমভক্তি কেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি, তা দেখিছেন। ভক্তিরসকে সমস্ত প্রকার স্থায়ীভাবের মূল বলে কৃষ্ণরতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শ্রীরূপ গোস্বামী বৈষ্ণব ভক্তিকে রসরূপে প্রমাণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থে তিনি ভক্তিরসের যে আলংকারিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও যুক্তিবোধের বিস্ময়কর প্রতীভার স্বাক্ষর মেলে। তাঁর এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৮.৫ উজ্জ্বলনীলমণি

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটি বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত রসতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এর রচনাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী' (১৫৫৪ খ্রিঃ রচিত) গ্রন্থে 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের উল্লেখ থেকে ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৪ খিস্টাব্দের কোনো একটি সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই গ্রন্থে পাঁচটি মুখ্য রসের প্রধানতম রস মধুর বা শৃঙ্গার রসকে উজ্জ্বল রস বলা হয়েছে। উজ্জ্বল রসের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার মাধ্যমে এর গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সম্মত বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উজ্জ্বল রসের স্থায়ী ভাব হল মধুরারতি। কৃষ্ণগোপীর শৃঙ্গার সম্ভোগলীলায় এই রস পূর্ণতা পায়। শৃঙ্গার বা মধুরারতিকে তাই 'ভক্তিরসরাজ' বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে নায়িকাদের সকলকে 'কৃষ্ণবল্লভা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোপীদের মধ্যে বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন রাসরসেশ্বরী শ্রী রাধাঠাকুরাণী অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনীরূপ মহাশক্তি। শ্রীরূপ গোস্বামী মুধুরারতিকে সাতটি পর্যায়ে চিহ্নিত করেছেন যেমন প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব বা মহাভাব।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থকে শ্রীরূপ গোস্বামী মোট পনেরটি প্রকরণে ভাগ করেছেন। প্রকরণগুলো যথাক্রমে নায়ক ভেদ, নায়ক সহায়ভেদ, শ্রীকৃষ্ণবল্লভা, শ্রীরাধা, নায়িকাভেদ, যুথেশ্বরীভেদ, দূতীভেদ, সখীভেদ, শ্রীহরিবল্লভা, উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব, ব্যাভীচারীভাব, স্থায়ীভাব, এবং শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ।

নায়কভেদ প্রকরণে উজ্জ্বল রসের নায়কের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোনো সাধারণ ব্যক্তি উজ্জ্বল রসের নায়ক হতে পারবেন না, এমনকি পরশুরাম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারও উজ্জ্বল রসের নায়ক হতে পারেন না। একমাত্র কৃষ্ণই নায়ক এবং তাঁর বিষায়াবলম্বন হবে। কৃষ্ণ প্রেয়সীরা হবে আশ্রয় আলম্বন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে নায়ককে চারটি শ্রেণিতে যেমন-- ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে নায়কের ৯৬ প্রকার ভাগ দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত চার প্রকার নায়ক প্রত্যেককে ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ ভেদে ভাগ করা হয়েছে। মোট ১২ প্রকার নায়কের প্রত্যেককে পতি ও উপপতি ভেদে মোট ২৪ প্রকার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ২৪ প্রকারের প্রত্যেককে অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে সর্বমোট ৯৬ প্রকার শ্রেণিতে নায়কের ভাগ করা হয়েছে। নায়ক সহায় ভেদে

নায়কের সহায়ককে ভৃত্য, বিট, বিদূষক, সহচর ও প্রিয়নমর্সখা এই পাঁচ প্রকার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে

হরিবল্লভা প্রকরণে শ্রীরূপ গোস্বামী নায়িকাদের স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দুই শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা হলেন দ্বারকায় উপস্থিত ১৬১০৮ মহিষীরা। কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বসত যে রমণীরা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁদের পরকীয়া বলা হয়েছে। এই পরকীয়া নায়িকার মধ্যে কুমারী বা অন্যের বিবাহিতাও রয়েছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে, বয়স্কা ব্রজদেবীরা, শোভা, সদগুণ ও বৈভবে সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ দেবী লক্ষ্মীর থেকেও মহাপ্রেম মাধুর্য ভাবে ভূষিতা হয়ে আছেন। পরকীয়া নায়িকাদের আবার সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা ও দেবী এই তিন ভাগ ভাগ করেছেন। যুথবিশেষের নায়িকারা অন্তর্ভুক্তা ও অযৌথিকাভেদে দুই প্রকার। সাধনসিদ্ধা হচ্ছেন রামচন্দ্রের সৌন্দর্য দেখে দণ্ডকারণ্যের মুনিরা নিজেদের স্ত্রী ভেবে রামচন্দ্রের সেবা করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তাঁরাই সাধনসিদ্ধা, যাঁরা ব্রজধামে গোপিনী রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। হরিবল্লভাদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধারা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। তাঁদের রাধা ও চন্দ্রাবলী হলেন মুখ্যা নায়িকা।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরাধাকে বলা হয়েছে মহাভাব স্বরূপা, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের থেকে উদ্ভূত শক্তিস্বরূপ সার। শ্রীরাধার নামের ঐতিহ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 'গোপালোত্ততাপনী' ঋক পরিশিষ্ট ও পদ্ম পুরাণের উল্লেখ করেছেন। গোপালোত্ততাপণী গ্রন্থে রাধার নামোল্লেখ না থাকলেও গন্ধর্বার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ দুজনকে একরূপে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থে রাধার প্রধান গুণাবলির মধ্যে ২৫টি গুণের কথা বলেছেন, যেমন- (১) মধুরা, (২) নববয়স্কা, (৩) চঞ্চল কটাক্ষবিশিষ্টা, (৪) উজ্জ্বল মৃদুর্মরহাস্যকারিনী, (৫) সৌভাগ্যসূচক রেখাযুক্তা, (৬) গন্ধেমাধবের উন্মাদনাবিধায়িনী, (৭) সঙ্গীতনিপুণা, (৮) রম্যবাক, (৯) নর্মপণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণাপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা, (১৩) চাতুরীযুক্তা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্যাদা, (১৬) ধৈর্যসাধিনী, (১৭) গাম্ভীর্যশালিনী, (১৮) সুবিলাসা, (১৯) মহাভাবের অতিশয় প্রাকট্যে পরম ব্যাগ্রা, (২০) গোকুলপ্রেমবসতি, (২১) ব্রহ্মাণ্ডেসমূহে তাঁর যশ ব্যাপৃত হয়, (২২) তিনি গুরুজনের নিকট মহা স্নেহ লাভ করেন, (২৩) সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা, (২৪) কৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে প্রধানা, এবং (২৫) মাধবের নিত্য অধীনা। নায়িকাভেদ প্রকরণের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রাচীন রীতি অনুসরণ করেছেন। পরকীয়া নায়িকাদের মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগলভা ভেদে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬০টি।

এই গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী সখীগণের ন্যায় যূথেশ্বরীদের ১২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। সখীদের মধ্যে বামা, দক্ষিণা, সমস্নেহা ও অসমস্নেহা এই চারটি শ্রেণি রয়েছে। কৃষ্ণ-রাধার মিলনে এই সখীরা হলেন প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থের উদ্দীপন বিভাগে কৃষ্ণ তার প্রেয়সীগণের গুণাবলি, নাম, চরিত্র, ভূষণ ও প্রসাধনে সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যমুনাতীর, বংশীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, জোৎস্না, মেঘ, সংগীত, সৌরভ, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জামালা, বসন্ত প্রভৃতি বস্তুকে উদ্দীপন সম্বন্ধীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থের অনুভাব প্রকরণে ২০ প্রকারের অলংকারের উল্লেখ করেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী। অনুভাবের প্রকার বর্ণনায় তিনি ৭ প্রকারের উদ্ভাসরের ও ১২ প্রকার বাচিক- এর উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এর আগে কোনো গ্রন্থে উদ্ভাসর বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ উদ্ভাসরের মধ্যে নীতিবন্ধ খুলে যাওয়া উত্তরীয় খুলে যাওয়া, মুক্ত কেশর কথা, হাইতোলা, গা-মোড়া দেওয়া, নাসিকার প্রফুল্লতা, ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, লোকলজ্জা ত্যাগ করা, কান্না প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের স্থায়ীভাব প্রকরণে শৃঙ্গার রসকে মধুরারতি বলা হয়েছে। স্থায়ী ভাব প্রকরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামীর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুরারতির বর্ণনায় রতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন— সাধারণী রতি, সামঞ্জস্যা রতি ও সমর্থা রতি। যে রতিতে সম্ভোগেচ্ছা প্রধান বিষয় তাকে সাধারণী রতি বলা - হয়ছে। সমঞ্জস্যা রতিতে ও 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা' প্রবল থাকে বলে অহং ভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, যার জন্য কৃষ্ণ এই রসে বশীভূত হন না। কৃষ্ণ সম্বন্ধিত শব্দাদি থেকে উৎপন্ন গন্ধ মাত্রা শ্রোতার কুলধর্ম, বেদধর্ম গুলিয়ে দেয়, তাকে সমর্থা রতি বলা হয়েছে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাশূন্য তথা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা উদ্বুদ্ধ এই রতিকে সান্দ্রতমা বলা হয়েছে। একমাত্র এই রতিতেই কৃষ্ণ বশীভূত হন।

শ্রীরূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, রতি থেকে যথাক্রমে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবের বিকাশ হয়। প্রেমের গাঢ়ত্ব অনুসারে পৌঢ়, মধ্য ও মন্দ ভেদে তিন প্রকার। প্রেম যখন মনের আলোকে আলোকিত হয়, তখন হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, এই অবস্থায় স্নেহের রূপ ধারণ করে। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। নায়কের প্রতি নায়িকার সম্ভ্রম প্রকাশকে ঘৃতস্নেহ এবং নায়িকার মনে নায়কের অধিকারবোধকে মধুস্নেহ বলা হয়েছে। মধুস্নেহ কোনো প্রকার ভাবের অপেক্ষা রাখে না, তাই নিজেই নিজের প্রকাশে সক্ষম হয় যেখানে ঘৃতস্নেহ অন্যের ভাবের উপর নির্ভরশীল, সকল প্রকার বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে মধুস্নেহ নিজভাব প্রকাশ করে। যে স্নেহের এই দুই প্রকার রূপকে নতুন মাধুর্য দানে সক্ষম হয় এবং বাইরে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাকে মান বলা হয়েছে। মানের দুই প্রকার-- ললিত ও উদাত্ত। এই দুই প্রকার সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস প্রগাঢ় হলে মান প্রণয়ে পরিণত হয়। বিশ্রম্ভ হচ্ছে প্রণয়ের স্বভাব। বিশ্রম্ভের দুটি ভাগ রয়েছে— মৈত্র ও সখ্য। যেখানে সম্ভ্রম প্রকাশ পায় তা-ই মৈত্র এবং সম্ভ্রমহীন অবস্থাকে সখ্য বলা হয়েছে। রাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রেমের উৎকর্ষের জন্য মনে অতি দুঃখ বেদনাকে পরম সুখ বলে মনে হয়, তখন তাকে রাগ বলা হয়েছে। নীলিমা ও রক্তিমা এই দুই ভেদে রাগ দুপ্রকার। নীলিমা রাগের দুটি প্রকার রয়েছে যেমন - নীলী ও শ্যামা এবং রক্তিমা রাগ কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠ দুই ভেদে বিভক্ত। অনুরাগে নায়ক নায়িকার পরস্পরের মধ্যে বশীভাব, প্রেমবৈচিত্র্য অর্থাৎ প্রিয়জনের নিকটকালেও যে ভাবনা কাজ করে, তা-ই অনুরাগ। অনুরাগের পরবর্তী অবস্থাকে মহাভাব বলা হয়েছে। রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধা। রূঢ়ভাবের ক্ষেত্রে স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কোনো অবস্থাতেও গোপন করা যায় না। রূঢ়মহাভাব অপেক্ষা অধিরূঢ় মহাভাব অধিকতর প্রবল। এই ভাব মোদন ও মাদন ভেদে

দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মোদন মহাভাব থেকে উৎকৃষ্ট মহাভাবকে মাদন মহাভাব বলা হয়েছে। শুধুমাত্র শ্রীরাধার মধ্যে এই মহাভাবের উদয় হতে দেখা যায়। মাদন মহাভাব ললিতা তথা প্রিয়নর্মসখীগণে মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এক্ষেত্রে তিন প্রকার রতির মধ্যে সাধারণী রতির সীমা প্রেম পর্যন্ত; সমঞ্জস্যা রতির সীমা অনুরাগ পর্যন্ত এবং সমর্থা রতিতেই মহাভাব সৃষ্টি হয়। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের শেষ প্রকরণে বিপ্রলম্ব ও সম্ভোগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় উভয়েই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত। বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস ভেদে চার প্রকার এবং সম্ভোগ, সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমৎ এই চার ভাগ বিভক্ত।

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটিতে কৃষ্ণরতি বা মধুরসকে মুখ্যস্থান দিয়ে তার আলোকে রসতত্ত্ব ও অলংকার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থটি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট করেছিল। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ রচনা করেছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। যার নাম দিয়েছিলেন— 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'। শ্রীজীব গোস্বামী সেই গ্রন্থের টীকা রচনা করেছিলেন এবং সেই গ্রন্থের নাম লোচন টীকা। এই গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের প্রয়াণের পর রচিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য এই গ্রন্থ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্য হিসাবে 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৬ পদকল্পতরু

বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে যে গীতিকাব্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার মূল উপজীব্য বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবি জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্য ছিল এই ধারায় প্রথম কাব্য। চতুর্দশ শতকে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আখ্যানধর্মী কাব্য; যেখানে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাবের ৪১৮টি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ পদ রচিত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'-এর পদগুলো আসলে রাগ ও তাল সংশ্লিষ্ট গীতের সমাহার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যটি নাটগীতিরূপে আজও অতুলনীয় সাহিত্য সম্ভার রূপে বিবেচিত হয়। সমসাময়িক কালে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা অবলম্বনে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। মিথিলার কবি বা 'মৈথিল কোকিল' একই সময়কালে একই বিষয়ে পদরচনা করে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট পদকর্তা রূপে আসীন হয়েছিলেন। এই সময় বৈষ্ণব পদ রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন বহু মুসলমান কবিরাও। যাঁরা বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষাকে মাধ্যম করে রাধাকৃষ্ণের লীলার বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করেছিলেন। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তিনশত বছর ধরে রচিত ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলো 'পদ' নামে অভিহিত হয়। প্রেমের বিভিন্ন ভাবকে কেন্দ্র করে ভণিতাযুক্ত পদ রচিত হয়। চৈতন্য পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাবের বৈষ্ণব পদের ভাব ও রসের ক্ষেত্রটি সম্প্রসারিত

হয়ে পড়েছিল। যার ফলে বাৎসল্য ও সখ্য রসের মতো নতুন ভাব সংযুক্ত হয়ে পদ রচিত হয়। এর আগে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে লৌকিক প্রেমের রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। উত্তর চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভাষ্য রচিত হয়। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে ঠিক কতজন কবি পদ রচনা করেছিলেন তা বলা দুষ্কর, কারণ এই সময় রচিত পদগুলো কীর্তন গায়কদের মুখে প্রচারিত হতো এবং শনাক্ত করা ভণিতা থেকে তাদের কবিদের শনাক্ত করা হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কিছু বৈষ্ণব পদ সংকলন প্রাপ্ত হয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি' (১৭০৫), নরহরি সরকারের 'গীতচন্দ্রোদয়', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র', বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' (১৭৬০) প্রভৃতি অন্যতম।

'পদকল্পতরু' বাংলা বৈষ্ণব পদসাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ রূপে পরিচিত। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থটি কবি বৈষ্ণব দাসের সুবৃহৎ বৈষ্ণব পদের সংকলন। গ্রন্থটি আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই বৃহৎ গ্রন্থ সংকলনে ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারের অধিক পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটিকে চারটি প্রধান শাখায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম শাখায় ১১টি পল্লব বা অধ্যায় রয়েছে, দ্বিতীয় শাখায় রয়েছে ২৪ টি পল্লব বা অধ্যায়, তৃতীয় শাখায় ৩১ টি এবং চতুর্থ শাখায় ৩৬ টি অধ্যায় রয়েছে। গ্রন্থটিতে কোনো টীকা পাওয়া যায়নি। পদকল্পতরু গ্রন্থে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবিদের বহু সংখ্যক পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গোবিন্দ দাসের ৪০৬টি পদ, চণ্ডীদাসের (বড়ু চণ্ডীদাসসহ) ১১৮টি পদ, জ্ঞানদাসের ১৮৬ টি পদ, দীনবন্ধু দাসের ৯৯ টি পদ, বিদ্যাপতির ১৬৩টি পদ, রাধামোহনের ১৮২ টি পদ এবং স্বয়ং বৈষ্ণব দাসের ২৬ টি পদ সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থে সর্বমোট পদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০০ এর বেশি।

পদকল্পতরু গ্রন্থটির কবি বৈষ্ণব দাস কৃত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অভিনব সংকলন গ্রন্থ। কবি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া। বিভিন্ন স্থানে তিনি 'পদামৃতসমুদ্র' অবলম্বনে কীর্তন গাইতেন। বৈষ্ণব দাসের আসল নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা বৈদ্যপুর তাঁর নিবাস ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। তাঁর গানের সুর 'টেঞার চুপ' অথবা 'টেঞার চপ' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। বহু স্থানে ঘুরে কঠোর পরিশ্রমে তিনি বহু কবির বিভিন্ন ভাবমূলক পদ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই পদগুলো তিনি 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সংকলন করেন। প্রথমাবস্থায় গ্রন্থটির নাম ছিল 'গীতকল্পতরু'। গ্রন্থের শেষে চার জায়গায় এই গ্রন্থের নাম রূপে 'গীতকল্পতরু'-র ব্যবহার করেছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র রচিত 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' সংকলন গ্রন্থে বৈষ্ণব দাসের ভণিতা ব্যবহারের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি ২৩টি পদের ভণিতায় 'বৈষ্ণবদাস', ২টি পদে 'বৈষ্ণব' এবং ১টি পদে 'বৈষ্ণবচরণ' শব্দের ব্যবহার করেছেন। রচনাশৈলীর মিল দেখে জগদ্বন্ধু ভদ্র বাকী তিনটি পদ বৈষ্ণব দাসের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, কবির একটি পুত্রের নাম ছিল রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুজন কন্যা সন্তান ছিল। কবি বৈষ্ণব দাসের 'রূপমঞ্জরী' নামে আরও একটি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন দুর্গাদাস লাহিড়ী

তাঁর 'বৈষ্ণব পদলহরী' গ্রন্থে। ১৮৯৭ সালে সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু' গ্রন্থটিকে মুদ্রণ ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ সালে পাঁচটি খণ্ড সমেত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বৈষ্ণব ভক্তি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'পদকল্পতরু' যেখানে বাংলা ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি ও মৈথিলি ভাষার পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থের 'পদকল্পতরু' নামটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। যার অর্থ পদাবলীর এক কল্পবৃক্ষ। নামটি প্রতীকী, কারণ এই গ্রন্থ বৈষ্ণব ভাবধারার, চেতনার তথা কীর্তনসংগীতের সম্পদকে সংরক্ষণ করে এক বিশাল বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। টীকা লিখুন- পদকল্পতরু (৮০ শব্দের মধ্যে)

৮.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

বৈষ্ণব ধর্ম ও মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্যই মূলত বৈষ্ণব দর্শন সাহিত্য। ভক্তি রসের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা এই সকল সাহিত্য মূলত বৈষ্ণব আদর্শের গোড়ার কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। বৈষ্ণব সাহিত্যের রসজগৎ সম্বন্ধে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন একটি পরিপূর্ণ রসভাণ্ডার, শুধু পরিপূর্ণই বা বলি কেন, এমন একটি অশেষ রত্নখনি সমগ্র বিশ্বের কি রসসাহিত্যের, কি ধর্ম বা সাধনসাহিত্যের সমস্ত অঙ্গন তন্ন তন্ন করে কর্ষণ করেও দ্বিতীয় আর একটি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রেমই হোক বা ভক্তিই হোক, তার চূড়ান্ত সীমা বাড়তে বাড়তে কতদূর যেতে পারে, কতখানি স্বার্থশূন্য ও নিষ্কলঙ্ক হতে পারে, তা মুগ্ধ বিশ্ববাসীর অনুভবগোচর করিয়েছে বাংলার বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত সাহিত্য।



৮.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায় ভক্তির স্তরভিত্তিক বিশ্লেষণ, আত্মোপলব্ধি ও ঈশ্বরপ্রেম অর্জনের একটি সুসংহত ধারায় পরিচালিত করে, যা আধ্যাত্মিক জীবনের পথকে স্পষ্ট করে তোলে, সে সম্পর্কে অবগত করিয়েছে।
- এই অধ্যায়ের অন্তর্গত রসতত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে ভক্তির অন্তর্গত আবেগ, সম্পর্ক ও চেতনার জগতকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা যে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, তার ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে।
- গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি, যেখানে জীবাত্মা ভগবানের চিরশক্তি বা আশ্রিত শক্তি রূপে চিহ্নিত, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া গিয়েছে।



৮.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটি বৈষ্ণব দর্শন আশ্রিত রসতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত... এই গ্রন্থে পাঁচটি মুখ্য রসের প্রধানতম রস মধুর বা শৃঙ্গার রসকে উজ্জ্বল... এভাবে আলোচনা করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৮.৫ অংশ)

২। বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে যে গীতিকাব্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার মূল উপজীব্য বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা... রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র', বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' (১৭৬০) প্রভৃতি অন্যতম। ...এভাবে উত্তর নির্মাণ করুণ। (দ্রষ্টব্য ৮.৬ অংশ)



৮.১০ অতিরিক্ত পঠন

১। চৌধুরী, ড. মানবেন্দ্রনাথ ও মহারাজ, শ্রীমৎ কনিষ্ক (২০১৬); বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য; কলকাতা : জয়শ্রী প্রকাশন

২। তর্কভূষণ, প্রমথনাথ (১৩৭০ বঙ্গাব্দ); বাংলার বৈষ্ণব দর্শন; কলকাতা : শ্রীগুরু লাইব্রেরী

৩। দাশ, ড. ক্ষুদিরাম (২০১৬); বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

৪। দত্ত, দিলীপ কুমার (১৯৬৩); বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোক; কলকাতা : অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

৫। মণ্ডল, সন্দীপকুমার (২০১৮); বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্য; কলকাতা : একুশ শতক



৮.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে 'নায়কভেদ' ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের নায়ক ভেদের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নায়িকার কত প্রকারের শ্রেণি বিভাগ রয়েছে, আলোচনা করুন।

৫। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে শ্রীরূপ গোস্বামীর স্বকীয়তার পরিচয় দিন।

৬। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দিন।

.....

অধ্যায় ৯ : চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৯.২ পরিচিতি
৯.৩ সংস্কৃত জীবনী সাহিত্য
৯.৪ বাংলা জীবনী সাহিত্য
    ৯.৪.১ গোবিন্দদাসের কড়চা
৯.৫ চৈতন্য ভাগবত / কবি পরিচয়
    ৯.৫.১ গ্রন্থ পরিচয়
    ৯.৫.২ গ্রন্থ রচনাকাল
৯.৬ চৈতন্যচরিতামৃত / কবি পরিচয়
    ৯.৬.১ গ্রন্থ পরিচয়
    ৯.৬.২ গ্রন্থ রচনাকাল
৯.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৯.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৯.১০ অতিরিক্ত পঠন
৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ এই তিনশত বৎসরের বাঙালি সমাজ, বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্যকে যে একজন মহামানবের প্রভাব বহন করে এসেছে, তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। এই দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে তিনি তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিকাশ ও বাঙালি মানসকে নানা দিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন ঐতিহাসিক চরিত্র কিংবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অলৌকিক অবতার, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানে এই জীবনচরিতগুলো রচিত হয়েছিল। এই চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলো শুধু চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন কথা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন রসশাস্ত্রের সঙ্গে সমসাময়িক যুগের ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ। ঐতিহাসিক জীবন গাথা, ধর্ম ও দেশকাল অনুধ্যানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলেই এই বিষয়টি আমাদের এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৯.২ পরিচিতি

যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে মানবের বিচিত্রধারা বয়ে চলেছে। এই ধারায় কখনো কখনো এক একজন অসাধারণ, ক্ষণজন্মা মানবের জন্ম দিয়েছেন। যাঁরা মানবতার সাধক, হৃদয় — ঐশ্বর্যে মহীয়ান, অপরাজেয়, বিপদে নির্ভীক, দৈন্যে উন্নত মস্তক। এই বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করে হয়েছেন আমাদের আকাঙ্খায় প্রতীক এবং উত্তরকালের নতুন আদর্শ। তাঁরাই কালে কালে স্মরণীয় হয়ে আছেন, পূজিত হয়েছেন মহাপুরুষ রূপে। তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে ভক্তির অর্ঘ্য। এই মহাপুরুষদের জীবন কথাকে স্মরণ করে পথ চলার গতি স্থির করেছে। তাঁদের জীবন কাহিনি অবলম্বনে চরিত হয়েছে জীবনচরিত। যে জীবন কাহিনি জীবনকে উদ্দেশ্যময় ও সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করতে পারে। জীবনী গ্রন্থকে সমালোচকেরা দুটি শ্রেনিতে ভাগ করেছেন--- সাধারণ মানুষের জীবনী (Biography) এবং সাধু-সন্তদের জীবনী (Hagiography) ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন যুগে সংস্কৃত তথা প্রাকৃত ভাষায় যে জীবন কাহিনিগুলো রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল অশ্ব ঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'ললিতবিস্তার' প্রভৃতি। এছাড়া শঙ্করাচার্যের জীবন নিয়ে জীবন কাহিনি রচিত হয়েছিল, যার নাম ছিল 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' পৃথিবীর বুকে যে মহাপুরুষ অথবা মনীষীদের জীবন অবলম্বনে জীবন চরিত রচিত হয়েছে, সেগুলি গ্রন্থ মানবতা বৃহৎ আকাশে উত্তীর্ণ করে, মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য,— "যে নাচে তাহার জীবন চরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবনচরিত। কিন্তু যে মাহাত্মা জীবন-যাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক। যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য।"

শ্রী চৈতন্যদেব ছিলেন এমনই এক মাহাত্মা, যাঁর জীবনচরিত, সম্পূর্ণ বঙালি জাতিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের সমকালীন বঙ্গদেশের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল। জাতির অবক্ষয় ও দুর্দিনে বঙ্গদেশে চৈতন্যচন্দ্রোদয় হয়— যা বাঙালি চিরকাল মনে রাখবে। চৈতন্যের আবির্ভাবে ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। তিনি বাঙালি জাতিকে মানব প্রেমে দীক্ষিত করার জন্য প্রচার করেছিলেন জন্ম থেকে মানবের কর্ম বড়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলে গিয়ে মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিলেন, যারা সমাজে ছিল অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' তাই সেদিন শ্রী চৈতন্যের পার্ষদ ও অনুচরেরা তাঁর আলোকে সামান্য জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত করেছিলেন সংস্কৃত, বাংলা এবং ওড়িয়া ভাষায় চৈতন্য জীবনী বা চৈতন্যচরিত বিভিন্ন গ্রন্থ। বঙালির চিত্তলোক মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল শ্রীচৈতন্য ছিলেন তারই ঘনীভূত নির্যাস।

৯.৩ সংস্কৃত চৈতন্যচরিত বা চৈতন্যজীবনী সাহিত্য

মহাপ্রভু চৈতন্যের দেবোপম চরিত্র তাঁর সমসাময়িক কাল ও উত্তরকালের ভক্ত শিষ্যদের মনে যে বিস্ময় পুলোকিত মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে এক নতুন সাহিত্যধারা জন্ম হয়,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ রূপে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যই এর প্রধান পুরুষ; তাঁর বাল্যলীলা, গৌরলীলা, পরিব্রাজক লীলা, নীলাচল লীলার পবিত্র স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে এই চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলোতে। প্রথম চৈতন্য জীবনী সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। সেই সময় মহাপ্রভু জীবিত ছিলেন। চৈতন্য জীবন প্রথমাবস্থায় স্তব, স্তোত্র ও পদসাহিত্যের মধ্যে সীমিত ছিল। নরহরি সরকার ও রঘুনাথ দাসের পদাবলি সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ ছিল মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' যা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' রূপেও জানা যায়। 'কড়চা' শব্দের অর্থ দিনলিপি। শ্রীহট্টের অধিবাসী মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করতেন উভয়ে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের জন্ম থেকে তিরোধান পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনকে তাঁর 'কড়চা'-য় স্থান দিয়েছেন। এই গ্রন্থে মোট ৪টি আক্রম এবং ৭৮টি সর্গ ভাগ রয়েছে। মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ সেন চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিলেন---

১। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, এই কাব্যটি দশটি সর্গে বিভক্ত

২। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, যেখানে শ্রীচৈতন্যের জীবনের সমগ্র ঘটনা স্থান পেয়েছে, এবং

৩। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ।

সংস্কৃতে রচিত চৈতন্য মহিমা অবলম্বনে চরিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নাটকটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এটি ১৪৩টি শ্লোকের একটি স্তোত্রমূলক কাব্য রচনা। এছাড়া স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবন বিশেষ রূপ লাভ করেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। সংস্কৃত চৈতন্যজীবনী সাহিত্য বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪ বাংলা চৈতন্যজীবনী বা চৈতন্যচরিত সাহিত্য

চরিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি প্রাচীনতম এবং সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'চৈতন্যলীলার ব্যাস'। চৈতন্যের আদি ও মধ্য জীবনের প্রামাণ্য ঘটনার সমাবেশ এই গ্রন্থটি। গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা পরবর্তী অংশে করা হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার কিছুকাল পরে জয়ানন্দ মিশ্র তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যটি সর্বপ্রথম ১৩০৪-০৫ সালের সাহিত্য পত্রিকায় এবং ১৬১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জয়ানন্দের কাব্য নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থে শ্লোক সংখ্যা ১৩ হাজার। অনেক সমালোচকের মতে চৈতন্যমঙ্গলটি মঙ্গল কাব্যের রীতিতে রচিত কারণ কাব্যটি গীতের আকারে রচিত ও কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যার বর্ণনা আছে।

বাংলার চৈতন্যজীবনী কাব্যের মধ্যে অন্যতম কাব্য লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষের গৌরনাগর তত্ত্ব, আদর্শ ও সাধনপ্রণালী এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি চারটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত-সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড। প্রায় এগারো হাজার ছত্রে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়েছে। সূত্র খণ্ডে মঙ্গলকাব্যের ধরনে দেব খণ্ডের বর্ণনা এবং চৈতন্য অবতারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আদি খণ্ডে চৈতন্যের জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি, গয়া গমন ও গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। মধ্য খণ্ডে চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা ও উৎকল লীলা স্থান পেয়েছে। শেষ খণ্ডে মহাপ্রভু চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, রায়রামানন্দের সহিত মিলন, সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভ্রমণ এবং পুরীতে প্রত্যাবর্তন, নীলাচলে অবস্থান ও চৈতন্যের অলৌকিক তিরোধান বর্ণনা করা হয়েছে।

চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' ও 'গোবিন্দ বিজয়' গ্রন্থটি বাংলা চৈতন্যজীবনী কাব্যের একটি অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার সেন কতৃক এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'ভুবনমালা' নামেও পরিচিত হয়েছিল। পাঁচালি রীতিতে রচিত গ্রন্থটি লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের অনুরূপ। কাব্যটি অসম্পূর্ণ ছিল। সম্ভবত সপ্তদশ শতকে শেষের দিকে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল। এই গ্রন্থে ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কবি নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অনুপ্রেরণায় এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কবি চূড়ামণি দাস মূলত চৈতন্যের সংসার জীবনের বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্য অনেকাংশে বাস্তব ঘেঁষা।

বাংলা চৈতন্যচরিত কাব্যের অন্যতম ক্রান্তদর্শী কবি মনীষী হলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর কাব্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' জীবনী কাব্য রূপেই নয়, দার্শনিকতত্ত্ব ও কবিত্বের অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ। সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৬০-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থটির বাংলা চৈতন্যজীবনী কাব্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অংশে (৯.৫.২)-এ আছে।

৯.৪.১ গোবিন্দ দাসের কড়চা

গোবিন্দদাস একজন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থকার। তাঁর কবি পরিচয় থেকে জানা যায় কর্মকার শ্রেণিতে গোবিন্দদাসের জন্ম। বর্ধমানের কাঞ্চন নগরে তিনি 'অস্ত্র হাতা বেড়ি' ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদা স্ত্রী শশীমুখীর সঙ্গে কলহ করে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভু চৈতন্যের সেবক হন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন, তখন তাঁর ইচ্ছাক্রমে গোবিন্দদাস চৈতন্যের সঙ্গী হন। মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে গোবিন্দদাস প্রতিদিন পথের বিবরণ লিখে রাখতেন। এই দিনলিপিই হল গোবিন্দদাসের 'কড়চা'। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ হিসাবে এর বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য। নাতি দীর্ঘ এই কাব্যে পরিচ্ছন্ন ও কাব্য গুণান্বীত ভাষায় কবি চৈতন্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণের মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য, তথা মহাপ্রভু কতৃক পাপী-তাপী গণিকা উদ্ধার প্রভৃতি

বিষয়ে গোবিন্দদাস অনেক নতুন কথা ও তথ্য যোগ করেছেন, যার ফলে তাঁর এই 'কড়চা' আধুনিককালের গন্ধ পাওয়া যায়।

৯.৫ চৈতন্য ভাগবত/কবি পরিচয়

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন---

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষে পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত।।"

প্রাচীন কবিরা তাদের গ্রন্থ মধ্যে আত্মবিবরণী অংশ যোগ করতেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস তেমনভাবে কোনো আত্মপরিচয় দেননি। গ্রন্থ মধ্যে তাঁর মাতা নারায়ণী দেবীর উল্লেখ আছে। নারায়ণী ছিলেন চৈতন্যদেবের কৃপাপাত্রী, চৈতন্যভক্ত, পার্ষদ এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। নারায়ণী দেবী ছিলেন বৃন্দাবন দাসের মাতা, তাঁর পিতার নাম পাওয়া যায়নি। বৃন্দাবন দাসের জন্ম পরিচয় অনেকটা রহস্যাচ্ছন্ন। নারায়ণী বাল্যবিধবা মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করেছিলেন বলে কেউ কেউ বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্পর্কে রহস্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু নারায়ণী দেবী যখন চৈতন্যের প্রসাদ পেয়েছিলেন তখন তাঁর মাত্র চার বছর বয়স ছিল। বৃন্দাবন দাস একথা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন--- 'চারি বৎসরে সেই উন্নত চরিত্র।' তাই অপ্রামানিক 'প্রেম বিলাস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে , কুমার হট্টের বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে নারায়ণীর বিবাহ হয়েছিল এবং বৃন্দাবন দাস মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁর পিতৃ বিয়োগ হয়। যদিও এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। বিমানবিহারী মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন-"শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্রী নারায়ণী দেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন একথা মানিয়া লইতে বৈষ্ণব লেখকগণের কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে বৃন্দাবন দাস বৈধ বিবাহের ফলে জাত।"

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়েছিল। ১৫০৭-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সুকুমার সেনের ধারণা। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম। বৈষ্ণবদের অন্যান্য রচনানুসারে জানা যায়, বৃন্দাবন দাস মামার বাড়িতে মায়ের কাছে বড় হয়েছিলেন এবং সংস্কৃত টোলে পড়াশোনা শিখেছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেই তাঁর অধিকার ছিল। অনেকে মনে করেন বৃন্দাবন দাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দেনুর গ্রামে বসে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন কিন্তু বৈষ্ণবীয় প্রথা অনুযায়ী নিজেকে 'দাস' বলেছেন। বৃন্দাবন দাস ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য। গুরু নিত্যানন্দের আদেশে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে এই কথা স্বীকার করে লিখেছিলেন-

"অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বুলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।।"

বৃদ্ধ বয়সে তিনি একবার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। দেনুর গ্রামে তিনি শেষ জীবন কাটান। তিনি খেতুরী উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর একটি প্রাচীন পুথি থেকে জানা যায়, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৫১১ শকে (১৫৮৯); খ্রিঃ দেহ রক্ষা করেন।

৯.৫.১ গ্রন্থ পরিচয়

'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের পূর্ব নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থকে 'ভাগবত' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই নাম পরিবর্তনের যুক্তি ছিল ভাগবতের কৃষ্ণলীলা বর্ণনার মত চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যলীলা বর্ণনায় রয়েছে বহু অলৌকিক ঘটনার পরিবেশন। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে ভাগবতের মতই পূজিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ একথা উল্লেখ করেছেন---

"চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।।"

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি আদি-মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটির মোট অধ্যায় সংখ্যা হচ্ছে ৫১টি। আদি খণ্ডে ১৫টি অধ্যায়, মধ্য খণ্ডে ২৬টি এবং অন্ত্য খণ্ডে ১০ টি অধ্যায় রয়েছে। আদি খণ্ড নিমাইর জন্ম, বাল্যলীলা, নিত্যানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা, নিমাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা, দিগ্বিজয়ী পরাভব, লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ, যবন হরিদাসের মহিমা, পিতার মৃত্যু ও গয়াগমন, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মধ্য খণ্ড অংশের মুখ্য ঘটনাগুলো হল— ভক্তি ব্যাখ্যান্তে টোল বন্ধ করে নগর সংকীর্তন আরম্ভ, নিত্যানন্দের সঙ্গে মিল, ব্যাসপূজা, অদ্বৈত মিলন, জগাই মাধাই উদ্ধার, মুরারি গুপ্তের কাহিনি, কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামকরণ। এই অংশে নবদ্বীপে নিমাইয়ের অনেকগুলো অলৌকিক ভাগবত লীলার বর্ণনা আছে। এছাড়া তিনটি অধ্যায় জুড়ে নিত্যানন্দের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থে প্রথম দুটি খণ্ডের তুলনায় অন্ত্য খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এগারো অধ্যায়ে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের নীলাচল আগমন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের মুখ্য ঘটনাগুলো হল— শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সকলের মিলন, নীলাচল গমনের পথ বর্ণনা, পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ ও মূর্চ্ছা, সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর গৃহে চৈতন্যকে আনয়ন। নীলাচলের নানা বিলাস বর্ণনা, মথুরা গমনোদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের নিকটবর্তী রামকেলিতে আগমন। অদ্বৈত ও অচ্যুতের সাক্ষাৎকার। চৈতন্যের শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, শেষদিকে কয়েকটি অধ্যায়ে নিত্যানন্দলীলা ও কয়েকটিতে অদ্বৈতলীলা বর্ণিত বিষয়বস্তু।

বৃন্দাবন দাসের রচনার একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী কাহিনিবিন্যাসের কৌশল; তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থে তাঁর সংস্কৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার থেকে। মুরারি গুপ্তের 'কড়চা', কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, 'পদ্মপুরাণ', 'বরাহপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করছেন এই গ্রন্থে। আরও অনেক গ্রন্থ থেকে সংস্কৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নীরস দার্শনিক তত্ত্ব ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েনি। কাব্যের সূচনা থেকে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণাবতার রূপে স্বীকৃত। ফলে এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্যলীলাকে রূপায়িত করা হয়েছে। চৈতন্যলীলায় কৃষ্ণলীলার

মতো বহু অলৌকিক ঘটনাও আরোপিত হয়েছে। স্বভাবতই এতে মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রভাব অনস্বীকার্য। সুস্থির বিশ্বাস এবং অবিচলিত নিষ্ঠাই ছিল কবির চালকশক্তি। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও সন্ন্যাস পূর্ণজীবনের বর্ণনায় কল্পনা ও অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি লক্ষণীয়। চৈতন্য তিরোধানের পর যখন গ্রন্থটি লিখেছেন এবং গ্রন্থ রচনার সময় আদর্শ হিসাবে মুরারি গুপ্তের কড়চা ও কবি কর্ণপুরের জীবনকে নিয়েছিলেন, তখন অন্ত্য খণ্ডে চৈতন্যের নীলাচলের লীলা কেন বাদ পড়েছিল, তাই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

'চৈতন্যভাগবত' যে বৈশিষ্ট্যগুণে সেকাল এবং একালের সমাদর লাভ করেছে তা হল গ্রন্থটির অর্থপূর্ণ ঐতিহাসিকতা। অলৌকিক ঘটনা বিস্তারের পাশাপাশি এতে যেসব মূল্যবান তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে তা আধুনিককালের ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যের জন্মকালে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রূপ অঙ্কন করেছেন। ঐতিহাসিক চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপে-

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে মরে মহা দক্ষ।"

সমকালীন ধর্মাচরণের স্বরূপ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও মনোভাব, জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা, অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কার, হিন্দুদের বর্ণভেদ, শাসক-শাসিতের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিপুণভাবে গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। সমকালীন ধর্মাচরণের বিবরণ দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

"ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনো জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে।।"

মুসলমান শাসকদের স্বরূপ অঙ্কনে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

"যে হুসেন শাহের সর্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।।
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত শত করিল প্রমাদ।।"

তাই বলা যায়, ঐতিহাসিক উপাদানের সন্নিবেশে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি মধ্যযুগের ইতিহাসের বহুমূল্য নির্ভরযোগ্য দলিলস্বরূপ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পরিচয় সংক্ষেপে বিধৃত করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৫.২ গ্রন্থ রচনাকাল

'চৈতন্যভাগবত'— এর রচনাকাল সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস গ্রন্থে কোনো উল্লেখ করেননি, ফলে কাব্যটি সঠিক কবে রচিত হয়েছে, তার কোনো তথ্য না থাকায় কাব্যটির রচনাকাল সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। সকলেই আনুমানিককালের কথা বলেছেন, বিভিন্ন তথ্য অবলম্বন করে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন চৈতন্যভাগবত ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মনে করেন চৈতন্যভাগবত ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এই মত বিমানবিহারী মজুমদারও সমর্থন করেন। সুকুমার সেন বলেছেন, চৈতন্যভাগবতের রচনা সমাপ্তিকাল ১৫৩৫-৩৬ এর মধ্যে। তাহলে দেখা যায় চৈতন্য ভাগবত ষোড়শ শতকের কাব্য। ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশকের মধ্যে চৈতন্যভাগবত রচিত হয় তখন চৈতন্য জীবিত ছিলেন না।

চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল নির্ণয়ে বিমানবিহারী মজুমদার ও সুকুমার সেনের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিমানবিহারীর মতে ১৫৪৮ এবং সুকুমার সেনের মতে ১৫৩৫-৩৬ এর দিকে কাব্য রচিত হয়েছে। দুজনের মতের পার্থক্য ১২ থেকে ১৩ বছর। তবে দুজনেরই ইঙ্গিত ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের দিকে। বিমানবিহারীর মতে অন্তত পক্ষে দুটি গ্রন্থের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি মুরারি গুপ্তের কড়চা ও অন্যটি গৌরগনোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস যেহেতু গ্রন্থ মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চার শ্লোকের উল্লেখ করেছিলেন, তাই চৈতন্যভাগবত মুরারি গুপ্তের রচনার পর রচিত বলে মনে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বৃন্দাবন দাসকে বলা হয়েছে 'বেদব্যাসের অবতার'। এ ধরনের মত প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর হয়তো লেগে যেতে পারে। তাই চৈতন্যভাগবত ১৫৪৮ বা তার কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছে বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। সুকুমার সেন তাঁর যুক্তির পক্ষে নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্রলাভ এই বিষয়কে অবলম্বন করেছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্রলাভ বা পারিবারিক কোনো ঘটনার উল্লেখ করেননি। এ গুরুতর ঘটনা। গুরু নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন দাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে নিত্যানন্দের জীবন ও মাহাত্ম্য কথার সুন্দর বর্ণনা থাকলেও নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্রলাভের কথা অনুল্লিখিত। এই সূত্র ধরেই সুকুমার সেন বলেছেন, "গ্রন্থরচনাকালে নিত্যানন্দ দার পরিগ্রহ করেন নাই নয় তখন বীরভদ্রের জন্ম হয় নাই। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে চৈতন্যভাগবতের রচনা সমাপ্তিকাল ১৫৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দ ধরিতে হয়।" তাই চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল সম্পর্কে সুকুমার সেন ও বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান স্বরূপ ১৫৩৫ থেকে ১৫৪৮ এর মধ্যে, তাকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

৯.৬ চৈতন্যচরিতামৃত/ কবি পরিচয়

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের আত্মপরিচয় সম্পর্কে খুব কম কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থ থেকে যেটুকু জানা যায় তা হল, ১৪৫০ শকাব্দ, ইংরেজি ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে এক বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতার

নাম ভগীরথ ও মাতা ছিলেন সুনন্দাদেবী। কবিরাজ ব্যবসার দ্বারা অতিকষ্টে ভগীরথ সংসার নির্বাহ করতেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কবি কৃষ্ণদাসের বয়স যখন মাত্র ছয় ছিল, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। শ্যামদাস নামে তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। স্বামী ভগীরথের মৃত্যুর পর সুনন্দা দেবীর দেহাবসান ঘটে। আত্মীয়-স্বজনের কাছেই কৃষ্ণদাস বড় হয়ে ওঠেন। শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট ও গম্ভীর প্রকৃতির। গ্রন্থের আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস লিখেছেন, একদা কীর্তনীয়া রামদাস তাঁদের গৃহে এসেছিলেন। তিনি জানতে পারেন শ্যামদাস নিত্যানন্দকে বলরাম অবতার বলে মানেন না। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রামদাস বংশী ভেঙ্গে দিয়ে গানের আসর ত্যাগ করে চলে যান। এতে কৃষ্ণদাস ভাইকে ভর্ৎসনা করেন। সেই রাতে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন, কবি লিখেছেন,---

"ভাইকে ভৎর্সিনু মুই-লৈয়া এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন।।
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।।"

আনন্দ বিহ্বল মূর্চ্ছিতপ্রায় কবিকে নিত্যানন্দ অভয় দিলেন, কবি বর্ণনা করেছেন---

"অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস, না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাহা সর্ব লভ্য হয়।"

গুরু নিত্যানন্দের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে যান। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের গোস্বামী রঘুনাথ ভট্টের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের কাছে ভক্তি শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন করেন। কবি আদি লীলার পঞ্চম অধ্যায়ে লিখেছেন,---

"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত।।"

ভক্তির এই সিদ্ধান্ত জেনে ভক্তিরস প্রান্তে পৌঁছে চৈতন্য-নিত্যানন্দের অবতার লীলা উপলব্ধি করলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষে তিনি শ্রীরূপ ও রঘুনাথের উল্লেখ করেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত রচনার অনেক আগেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃতে দুটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, 'গোবিন্দলীলামৃত' এবং 'সারঙ্গরঙ্গদা'। শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুরোধে কৃষ্ণদাস ২৩ টি অধ্যায়ে বিস্তৃত 'গোবিন্দলীলামৃত' রচনা করেন। রঘুনাথের 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাসকে 'কবি ভূপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণদাস তাঁর বছর নব্বইয়ের কাছাকাছি সময়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের কাজ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বেশিদিন ধরাধামে ছিলেন বলে জানা যায়। অর্থাৎ ১৫৩৮ শকাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের কবি পরিচিতি সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৬.১ গ্রন্থ পরিচয়

ভক্তি সিদ্ধান্ত ও রসোপলব্ধি বিষয়ে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের মতবাদ বঙ্গদেশ ও নীলাচলের বৈষ্ণবভক্তদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিণত বয়সে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষড় গোস্বামীদের অনুরোধে বাংলায় চৈতন্যজীবনী লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটিকে মোট ৬২ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে মোট তিনটি খণ্ড বা তিনটি লীলায় বিভক্ত। আদি লীলা ১৭ টি অধ্যায়, মধ্য খণ্ডে ২৫ অধ্যায় এবং অন্ত্য খণ্ডে ২০টি অধ্যায় আছে। আদি খণ্ডে নিমাইয়ের জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বারোটি পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণ, চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ, জন্মের প্রামাণ্য ও মুখ্য কারণ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত্য তত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব আখ্যান, চৈতন্যলীলা বর্ণন, ভক্তি কল্পবৃক্ষের দানীরূপে চৈতন্য বর্ণন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত শাখার বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের মুখবন্ধই বারোটি পরিচ্ছেদে, তারপরের তিনটি পরিচ্ছেদে নিমাইয়ের জন্ম , বাল্য, পৌগন্ড , কৈশর ও যৌবন লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। প্রথম চারটি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে সংক্ষিপ্তভাবে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর দ্বারা প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী কাজীদলন কাহিনির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বৃন্দাবন দাসের কাব্যের তুলনায় বৈষ্ণবীয় স্বভাবাপন্ন। কারণ বৃন্দাবন দাস যে ক্রুদ্ধ নিমাইকে চিত্রিত করেছেন, সেই তুলনায় এই অধ্যায়ে কৃষ্ণদাসের নিমাই নির্ভীক অথচ বিনম্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছেন।

মধ্যলীলার পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবন-মথুরা-কাশী ভ্রমণের শেষে চৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ঘটিনাগুলো হচ্ছে--- সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল গমনের প্রাক্কালে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সকলের সঙ্গে মিলন, নীলাচল গমন, সেখানে গিয়ে বাসুদেব সার্বভৌমকে অদ্বৈতবাদী পথ থেকে দ্বৈতবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের পথে আনয়ন, দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রা, রামানন্দ সংবাদ, --- যেখানে ভক্তির স্বরূপ ও স্তর-পর্যায় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গৌড় পথে বৃন্দাবন যাত্রা এবং অর্ধ পথে নাটশালা থেকে পুনর্বার নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন-মথুরা-কাশী ভ্রমণের অন্তে নীলাচল প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি। মধ্য খণ্ডে বাসুদেব এবং রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের আলোচনা সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিদর্শন বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। রাগানুগা ভক্তিরহস্য, বেদান্তের ভক্তি ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব রস পর্যায় বিশ্লেষণ, মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রভৃতি বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই দিক থেকে এই খণ্ডের ষষ্ঠ, অষ্টম, বিংশ ও চতুর্বিংশ অধ্যায়গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যের জীবনের শেষ বারো বৎসরের দিব্যোন্মত্ত অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এই খণ্ডে। প্রথম পরিচ্ছেদে শিবানন্দ সেনের কুকুরকে কৃষ্ণনাম বলিয়ে মুক্তিদান ও শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে নীলাচলে পুনর্মিলন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ছোট হরিদাসে শিক্ষা ও হরিনামের মাহাত্ম্য, চতুর্থ পরিচ্ছেদে সনাতন প্রসঙ্গ, পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রদ্যুম্ন প্রসঙ্গ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রঘুনাথ দাস প্রসঙ্গ বর্ণনা, পানিহাটিতে চিড়া

মহোৎসব, সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ ভট্টের মিলন, অষ্টম পরিচ্ছেদে রামচন্দ্র পুরীর সঙ্গে প্রভুর মিলন, নবম পরিচ্ছেদে গোপীনাথ পট্টনায়ক উদ্ধার বিবরণ, দশম পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গের ভক্তদের সঙ্গে মিলন, একাদশ পরিচ্ছেদে হরিদাস নির্বাণ প্রসঙ্গ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রসঙ্গ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জগদানন্দ ও রঘুনাথ ভট্টের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। বাকি পরিচ্ছেদগুলোতে চৈতন্যের মহাভাব স্বারূপের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মহাপ্রভুর নিজকৃত শিক্ষাষ্টক পঠন ও ভক্তদের শিক্ষনের ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। মুখ্যত চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার চিত্রাঙ্কনে কৃষ্ণদাস অন্ত্যলীলাকে এত বিস্তৃত করেছেন।

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' একাধারে তত্ত্ব ও প্রেম ভক্তির সার্থক সমন্বয়। যার কাব্যমূল্যের অসাধারণত্ব কাব্যটি চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গোস্বামীদের রচিত তত্ত্ব ও বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থের পাঠ অভিনিবেশে তাঁর কাব্য বিশ্লেষণ শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি ১১৫২৬ টি শ্লোক সমন্বিত, যার মধ্যে মোট চার হাজার সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকগুলোর বঙ্গানুবাদও কৃষ্ণদাস করেছেন, যার ফলে মাঝে মাঝে কবিত্বের মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি বঙ্গদেশে প্রচার লাভের অল্পদিনের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মনীষা কবিত্ব এবং সহজ তত্ত্ব ব্যাখ্যার সমন্বয়ে চৈতন্যচরিতামৃত একটি কালজয়ী গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত।

৯.৬.২ গ্রন্থ রচনাকাল

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থে 'চৈতন্যচরিতামৃত'— এর রচনাকাল সম্পর্কে কোনো তথ্যের উল্লেখ করেননি। সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৫৬০-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের পর কবি কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সম্রাট আকবরে সময়কালে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দির নির্মাণের পর কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থের রচনায় হাত দেন। তাই পণ্ডিতদের ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাব্যটি সমাপ্ত হয়। গ্রন্থের উপসংহার সঙ্গে একটি শ্লোকের থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে কৃষ্ণদাস গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। ড. সুশীলকুমার দে এই তারিখটিকে সঠিক বলে মনে করেছেন। গ্রন্থশেষে কৃষ্ণদাস নিরভিমানভাবে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,—

"আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান।।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মন বুদ্ধি হে মোর স্থির।।"

এই পঙক্তি থেকে বোঝা যায় কবি প্রবীণ বয়সে গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থ শেষ করতে তাঁর সাত বছর সময় (মতান্তরে নয় বছর) লেগেছিল। কৃষ্ণদাস জরা ও বার্ধক্য নিবন্ধন সংকল্পিত কাজ শেষ করে যেতে পারবেন কিনা তারি আশঙ্কা গ্রন্থে বার বার উল্লেখ করেছেন। তাই, মধ্যলীলায়

সূত্রাকারে অন্ত্যলীলার মুখ্য ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন।

ষোড়শ শতকে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ পুষ্টি লাভ করেনি। সেই স্থান থেকে অনেক দূরে বসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহজ-সরল সাবলীল ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। গভীর দার্শনিক তত্ত্বকে কবি প্রাঞ্জলময় ভাষারূপ দান করেছেন, যার ফলে গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক অদ্বিতীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। গদ্যের বিষয়কে কৃষ্ণদাস সুললিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে সংহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপূর্ব ভাষা মাধুর্য, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে এবং বিশিষ্ট কাব্যগুণে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ভারতীয় সাহিত্যে মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যগুলো এক নতুন সৃষ্টি কর্ম রূপে পরিগণিত। কেননা, দেবদেবীর মাহাত্ম কীর্তন ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। সাহিত্য হয়ে উঠেছিল অবতার, ধর্ম ও অলৌকিকতার কথা। কিন্তু মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে মানুষের কথা প্রাধান্য পেয়েছিল। মানুষ নয় তার দেশ এবং সমসাময়িক সময়ও স্থান পেয়েছে। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলো বাংলা সাহিত্যের মানব জীবন রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত। যদিও গ্রন্থগুলোতে অলৌকিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। অলৌকিক অতিরঞ্জিত ঘটনার পাশাপাশি গ্রন্থগুলোতে তৎকালীন বাঙালি সমাজ , হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে উঠেছে।

৯.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

একটি জীবন জীবনী হয়ে ওঠে জীবনের পরিপূর্ণতায়, জীবন মাহাত্ম্যে। আর জীবনীর বীজ উপ্ত হয় জীবনের অসাধারণত্বে। তাই এককথায় জীবনীগ্রন্থ হল মানব জীবনের উজ্জ্বল উদ্ধার। ইংরাজিতে জীবনী সংক্রান্ত দু'টি শব্দ আছে— (১) Hagiography; আর (২) Biography। Hagiography হল তাই- যেখানে কোন মহাপুরুষ কিংবা সন্ত-সাধককে কেন্দ্র করে জীবনী রচিত হয়। আর যে কোন সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত জীবনীই হল Biography। এছাড়াও কোন জীবনীকার যখন নিজের অণুপুঙ্খ জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থ নিজেই প্রণয়ন করেন তখন তাকে Auto-biography বলে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি Hagiography বা মহাপুরুষের জীবনীর অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাই প্রথম চোখে দেখা ব্যক্তি মানুষের জীবন-কথা হল চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি। দেবতা নয়, ধর্ম নয়, তত্ত্ব নয়, সাহিত্যের বিষয় হল এক বিস্ময়কর জীবন। এই জীবন জন্মাবধি অসাধারণ। রূপে, মেধায়, আত্মপ্রত্যয়ে, নেতৃত্বে, বৈবাহিকতায়, সামাজিক কৃত্যে, ব্যবহারে, পাণ্ডিত্যে, ঈশ্বর-ব্যাকুলতায় এককথায় সর্বক্ষেত্রেই অসাধারণ ছিলেন মহামানব চৈতন্যদেব।



৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ ও সমতার যে বানী প্রচারিত হয়েছিল, এই অধ্যায় থেকে আমরা সমর্মিতার ভাব ও মানবিকতার শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি।
- চৈতন্যদেবের জীবন ও কর্ম বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সূচনা করেছিল, যা সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সংস্কৃতির থেকে জন্ম লাভ করা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পেরেছি।
- চৈতন্যদেবের জীবনী আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার সমন্বয়-কে উপস্থাপন করে, যা আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিকাশে সহায়তা করে।



৯.১০.০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। মহাপ্রভু চৈতন্যের দেবোপম চরিত্র তাঁর সমসাময়িক কাল ...শ্রী চৈতন্যই এর প্রধান পুরুষ; তাঁর বাল্যলীলা, গৌরলীলা, পরিব্রাজক লীলা, নীলাচল লীলার পবিত্র স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে এই চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলোতে। (দ্রষ্টব্য ৯.৩.০ অংশ)

২। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের পূর্ব নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থকে 'ভাগবত' আখ্যা দিয়েছিলেন। ...চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যলীলা বর্ণনায় রয়েছে বহু অলৌকিক ঘটনার পরিবেশন। (দ্রষ্টব্য ৯.৫.২ অংশ)

৩। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের আত্মপরিচয় সম্পর্কে খুব কম কথা উল্লেখ করেছেন। ...কাছাকাছি নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে এক বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম হয়। (দ্রষ্টব্য ৯.৬.০ অংশ)



৯.১০ অতিরিক্ত পঠন

১। নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.) (২০১২); কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' ভূমিকা; কলকাতা : সাধনা প্রকাশনী

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.) (১৯৯১); দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'; কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৩। মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী (১৯৫৯); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান; কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। শ্রী চৈতন্যের বাংলা জীবনী গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত? সেই কাব্য ও কবির পরিচয় তুলে ধরুন।

২। বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যে কোনো একজন কবির কাব্যের পরিচয় দিন।

৩। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উপস্থাপিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনা করুন।

৪। সংস্কৃত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বর্ণিত দেশকালের পরিচয় বিস্তৃত আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১০ : নাথ সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ নাথ ধর্মপন্থার সম্যক পরিচয়
১০.৪ নাথ সাহিত্যের ভিন্ন ধারা
    ১০.৪.১ গোরক্ষবিজয়
    ১০.৪.২ সতী ময়না
১০.৫ নাথ সাহিত্য ধারার উল্লেখযোগ্য কবি
১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৮ অতিরিক্ত পঠন
১০.৯ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই উপ বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে এক উপসম্প্রদায় কেন্দ্রিক ধর্মসাধনামূলক একটি গ্রন্থ। শিষ্য কর্তৃক গুরুকে সাধনার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাহিনিই এর বিষয়বস্তু। এদিক থেকে মধ্যযুগীয় ইতিহাসে গ্রন্থটি অভিনব। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে নাথ ধর্ম সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক কথা জেনে নেব। নাথ ধর্ম-দর্শন ও সাধনপন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করব। গুরু মীননাথের তুলনায় শিষ্য গোরক্ষনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় সেই প্রসঙ্গটিও আলোচনা করব। এই কাব্যের মানব-জীবন রস ও সমাজচিত্র প্রসঙ্গটিও বিচার করে দেখব।

১০.২ পরিচিতি

নাথধর্ম নামে একটি উপধর্ম এবং সেই উপধর্মাশ্রিত সাহিত্য বহুকাল ধরে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতে এখনও প্রচলিত। এই ধর্মের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় যে একদা এই নাথধর্ম মতের সাধনা সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিপুল সংখ্যায় এই নাথধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আধ্যাত্মিক যোগাযোগের বড়ো উপাদান এই নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য। লোকগাথা, নাটক, আখ্যানকাব্য, ছড়া-পাঁচালির মাধ্যমে নাথপন্থীরা এই দেহকে মায়া বলে পরিত্যাগ না করে, দেহকে কেন্দ্র করেই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের পন্থা প্রচার করেছিলেন।

নাথধর্ম সম্পর্কে দেখা যায় যে পতঞ্জলির আধিমানসিক চর্যা, যা 'যোগ' নামে পরিচিত,

তাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিচিত্র কায়াবাদী সাধন প্রণালি পরিকল্পিত হয়েছিল। মধ্যযুগের নাথ ধর্মের মূল উৎস বা রহস্য এই যোগশাস্ত্রের মধ্যেই। কেননা, তন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি আধিদৈহিক ও আধিমানসিক ধারাকে গ্রহণ এবং স্বীকার করেই নাথ দর্শন গড়ে উঠেছে। কায়াবাদ বা দেহকে এই ধর্ম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের মোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তি- যাই লাভ হোক না কেন, নিজ দেহের প্রতি আকর্ষণ বা মমত্ববোধ মানুষের জীবসত্তার আদিমতম প্রেরণা। সেইজন্য মানুষ যুগে যুগে এই দেহের মধ্যেই অমৃততত্ত্বের সন্ধান করেছে এবং এইজন্য কত মন্ত্র-তন্ত্রের রসায়ন, কত বিচিত্র ধর্মপ্রণালি ও সাধনার সৃষ্টি হয়েছে। পতঞ্জলির আগেই বৈদিক যুগেও ভারতে এই চেষ্টা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়, তবে পতঞ্জলিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত যোগপন্থাকে একটি নীতি-নিয়মের মধ্যে বেঁধে দিলেন এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগের প্রধান লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়।

যোগ শাস্ত্রকে একপ্রকার সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রও বলা যায়। যোগশাস্ত্র আটটি পন্থার দ্বারা স্থূল দেহকে অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত করে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ ও সমাধি। সমাধির অর্থ, বাহ্যিক জগৎ থেকে সত্তার নির্বাসন, দেশকালহীন অবাধ মুক্তির জগতে মনঃসংযোগ এটিই যোগসাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। পরবর্তীকালে যোগের সঙ্গে নানা প্রকার রহস্যবাদ, তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র মিশে গিয়েছিল। কেউ কেউ যোগশাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদী বলেছেন। ঈশ্বরলাভ একমাত্র বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শনের চর্চার বিষয় নয়। অবশ্য পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বরভক্তি মোক্ষলাভ ও মুক্তিলাভের একটি উপায়। পরবর্তীকালে অবশ্য যোগদর্শনে গুরুর আধিপত্য স্বীকৃত হল, ঈশ্বর প্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলে প্রচারও করা হল। তখন সমাধির অর্থ হল ঈশ্বর-চেতনার মধ্যে জীবচেতনার বিলোপ। এইভাবেই কালে কালে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ, বিন্দুধারণ, উল্টো পদ্ধতি, খেচরীমুদ্রা প্রভৃতি সাধনাকে অবলম্বন করেছেন। তবে এই সব মতের সাধকদেরই নির্বিশেষে যোগী বলা হত। এঁদের মধ্যে শিবকে কেন্দ্র করে যে মোক্ষাভিপ্রায়ী যোগাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তাঁরাই নাথযোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। পরমেশ্বর শিব হলেন এঁদের আদি গুরু বা আদিনাথ। শিব আদিনাথ হলেও গুরু গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। এজন্যই এঁদের গোরক্ষপন্থীও বলা হয়।

১০.৩ নাথ ধর্মপন্থার সম্যক পরিচয়

একসময় ভারতের কোনো কোনো দার্শনিক গোষ্ঠী জড়দেহকে মুক্তির বাধা না বলে সোপান হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা নানা ধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক, রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষ-মুক্তি-নির্বাণ লাভের আকাঙ্খা করতেন। কারণ এঁদের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি পতঞ্জলির যোগদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এঁরা 'কায়াসাধনা' করতেন, অর্থাৎ পিণ্ডদেহ বা ভূতকায়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেউ কেউ মনে করতেন, এই সাধনার দ্বারা ভঙ্গুর জীবনকে "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ" করা যায়।

যোগ ও প্রাণায়ামাদির দ্বারা এঁরা নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। পূরক-কুম্ভক-রেচক শীর্ষক বায়ু বশীভূত করে এঁরা মোক্ষলাভের প্রথম সোপান অতিক্রম করতেন। তারপর তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব অবলম্বনে নিজ দেহমধ্যে শিরঃস্থিত সহস্রদলযুক্ত পদ্মসহস্রারে, শিবশক্তির মিলনসম্ভূত দিব্যানুভূতি লাভ করতেন। এঁরা যতটা আত্মবাদী, ততটা ঈশ্বরবাদী নন। সাধনপ্রক্রিয়ার দ্বারা নিজের মোক্ষ লাভ-এই হল এঁদের সাধনা। শিব এদের আদিগুরু-তিনিই আদিনাথ। তাঁর শিষ্য মীননাথ, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। এই গোরক্ষনাথের পবিত্র জীবন-কাহিনি নিয়ে সারা ভারত অনেক গান-গল্প রচিত হয়েছে। ইনি নিজের গুরু মীননাথকে বুদ্ধিভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করে স্মরণীয় হয়েছেন। শিব আদিনাথ হলেও চরিত্র গৌরবে গোরক্ষনাথ অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন, মানুষ হয়ে মাহাত্ম্য যে দেবতাকে-ও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই নাথপন্থীরা কোনো কোনো প্রদেশে 'গোরক্ষপন্থী' নামেও পরিচিত। নাথ ধর্মে প্রচলিত গুরু পরম্পরায় বিভিন্ন গুরুদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্যতম—

১। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকর'।

২। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'।

৩। 'শূন্যপুরাণ'

৪। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থ,

৫। যবদ্বীপে এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের সুফি সাহিত্যে।

'গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে চৌরাশি সিদ্ধার সঙ্গে নয়জন নাথেরও নাম আছে। 'তন্ত্র মহার্ণব'-এ এঁদের নাম শুধু নয়, বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন-গোরক্ষনাথ, জালন্ধর, নাগার্জুন, দত্তাত্রেয়, দেবদত্ত, জড়ভরত, আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও কাহ্নপা; শিবের আদেশে নারায়ণের অবতার রূপে এই নয়জন নাথের জন্ম হয়। বাংলাদেশের নাথ সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা এরূপ— মীননাথ, জালন্ধরিপা, কানুপা, গোপীচন্দ্র, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে, ও লক্ষ্মণের 'অনিলপুরাণে' নাথ গুরুর নামধামে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে এই নাথযোগী ধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করেছিল। বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে যে সমস্থ নাথ সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার কিছু কিছু সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, নেপালি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও পাওয়া যায়। এই নাথ সাহিত্য মূলত তিনভাগে বিভক্ত:

ক) ধর্মদর্শন ও সাধন-ভজন প্রণালি,

খ) গোরক্ষনাথের কাহিনি,

গ) হাড়িপা-ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনি।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যায়, ধর্মমঙ্গলে, বৈষ্ণব গ্রন্থ ভক্তমালে এমনকি শক্তিশাস্ত্রেও শৈব নাথযোগীদের বিভিন্ন উল্লেখ আছে। তবে বাংলা নাথ সাহিত্যের প্রধান দুটি ভাগ হচ্ছে— (ক) গোরক্ষবিজয় ও (খ) ময়নামতীর গান। গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষনাথ কর্তৃক অধঃপতিত গুরু মীননাথকে উদ্ধারের বৃত্তান্ত এবং ময়নামতীর গানে গোরক্ষনাথের শিষ্য, রানি

ময়নামতীর আগ্রহে তাঁর পুত্র, তরুণ গোবিন্দচন্দ্রের বা গোপীচন্দ্রের জালন্ধরিপা বা হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস অবলম্বনের কাহিনি প্রধান।

১০.৩.১ গোরক্ষনাথ

নাথ সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরায় গোরক্ষনাথ তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও ভারতের সর্বত্র তাঁরই কীর্তি-কাহিনি ও পুণ্যচরিত্র বেশি প্রচলিত। নাথ ধর্মের প্রধান অবলম্বন গোরক্ষনাথের প্রচারিত তত্ত্বদর্শন। এককথায়, শিব ও মীননাথ অপেক্ষা গোরক্ষনাথের জীবনকথার প্রাধান্যই নাথ ধর্ম-সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন গোরক্ষনাথ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। যেমন গ্রিয়ার্সনের মতে, অষ্টম শতাব্দী (Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol-VI), কেউ কেউ বলেন, ১০ম, ১১শ শতাব্দী (The Calcutta Review, August, 924 - Dr. B. C. Sen), কারো মতে, তিনি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন (Gorakhnath and the Kanphata Yogis - G. W. Briggs)।

এইরূপ নানাবিধ পরস্পর বিরোধী মতামত থেকে ও সন তারিখ থেকে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সাধারণত তাঁকে অষ্টম-নবম থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে আবির্ভূত বলে মনে করা হয়। তিনি কোন অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এ বিষয়েও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। পৌরাণিক সংস্কার অনুসারে তিনি সত্য যুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতাযুগে গোরক্ষপুরে, দ্বাপরে দ্বারকায় এবং কলিযুগে কাথিওয়াড়ে আবির্ভূত হন। কেউ কেউ মনে করেন, 'গোর্খা' নামটিও গোরক্ষ থেকে উৎপন্ন। অন্যমতে, তিনি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের অধিবাসী, যেটি বর্তমানেও কানফাটা যোগীদের প্রধান কেন্দ্র। আধুনিককালে নাথপন্থের ঐতিহাসিক ও গবেষক ড. মোহন সিং বলেন যে প্রকৃতপক্ষে গোরক্ষনাথ পেশোয়ার অঞ্চলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইসব উপাদান ও উল্লেখ থেকে মনে হয়, তিনি খুব সম্ভব পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন এবং ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। প্রত্যেক ভক্তরাই তাই তাঁদের গুরুকে নিজ নিজ অঞ্চলের লোক বলে দাবি করেন।

১০.৪ নাথ সাহিত্যের ভিন্ন ধারা

নাথ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১০.৪.১ গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে গুরু মীননাথ অপেক্ষা শিষ্য গোরক্ষনাথের গৌরবই বেশি প্রচারিত হয়েছে। শিষ্য হয়েও গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে নারীর মায়াপাশ থেকে চেতনায় ফিরিয়ে আনেন। এজন্যই এই কাব্যের নাম মীনচেতন-ও বটে। আদি গুরু নিরঞ্জনের মুখ থেকে যোগী রূপে শিব, নাভি থেকে মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা (জালন্ধরিপা), কান থেকে কানিফা

(কানুপা) এবং জটা থেকে গোরক্ষনাথ জন্ম নিলেন। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে গৌরী জন্ম নিলেন এবং শিব তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। একদিন গৌরী শিবকে প্রশ্ন করলেন- 'তুমি কেনে থাক গোসাই আমি কেনে মারি'- তখন মহাজ্ঞান বোঝানোর জন্য ক্ষীরোদ সাগরের জলটুঙ্গি ঘরে শিব গৌরীকে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেবীর নিদ্রার সুযোগে মীননাথ চুরি করে মহাজ্ঞান শুনে নিলেন। মহাদেব এই বঞ্চনা ধরতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দেন যে মীননাথ যা শিখেছেন সব ভুলে যাবেন।

একদিন গৌরী শিবকে বললেন, তোমার শিষ্যরা সংসারী না হলে পৃথিবী কী করে রক্ষা পাবে। শিব বলেন, তাঁর যোগী শিষ্যরা জিতেন্দ্রিয়, কামক্রোধ বর্জিত, তাঁরা কোনো কামনা বাসনাতেই প্রলুব্ধ হন না। তাঁদের পরীক্ষা করার জন্য দেবী চারজন শিষ্যকে আমন্ত্রণ করে অন্ন পরিবেশন করতে লাগলেন । দেবীর অসামান্য রূপ দেখে মীননাথ ভাবলেন, এমন সুন্দরী স্ত্রী পেলে- 'রঙ্গকৌতুক রসে রজনী পোয়াই'। দেবী তখন অভিশাপ দিলেন, কদলী দেশে স্ত্রী রাজ্যে গিয়ে ষোড়শ কদলী নিয়ে বাস করবেন মীননাথ। হাড়িপা ভাবলেন এমন সুন্দরীসহ- 'হাড়িকর্ম করি যদি থাকি তার পাশ'। দেবী তাঁকেও শাপ দিলেন, যাও রানি ময়নামতীর কাছে গিয়ে কোদাল ঝাড়ু নিয়ে হাড়ির কর্মই করো। কানুপা ভাবলেন, এমন স্ত্রী পেলে মৃত্যুতেও আপত্তি নেই। দেবী বলেন, তুমি ডাহুকের দেশে চলে যাও, সেখানে- 'সৎমায়ে ভজিব তুহ্মি দেখিয়া জোয়ান'। সবশেষে যোগীশ্রেষ্ঠ গোরক্ষ দেবীকে দেখে ভাবলেন, দেবী যদি আমার জননী হতেন, যে মা সর্ব ঘৃণা ত্যাগ করে সন্তান পালন করেন, আমি সেই মায়ের স্নেহ লাভ করতে চাইতাম—

'তবে ভাবিলেক মনে গোর্থে করি সার।
এমত জননী যদি থাকএ আমার
তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই
এমত জননী যদি কভু আমি পাই।'

এই চারজন শিষ্যের মধ্যে দেবী গোরক্ষকে জয় করতে পারলেন না। দেবী আরও বিপদজনক পরীক্ষা করতে চাইলেন। যে পথে গোরক্ষনাথের যাতায়াত সে পথে বিবস্ত্রা হয়ে লালসাময়ী রূপে শায়িতা রইলেন। গোরক্ষনাথ বৃক্ষপত্র দিয়ে দেবীকে আবৃত করলেন। এরপরও দেবী মাছি রূপে গোরক্ষর উদরে প্রবেশ করেন। গোরক্ষনাথ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করায় দেবীর প্রাণ যায় যায়, দেবীর কাকুতি মিনতিতে গোরক্ষ দেবীকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু দেবীর রূপ হ'ল রাক্ষসীর মতো, পরে শিবের অনুরোধে গোরক্ষ তাঁর স্বরূপ ফিরেয়ে দিলেন। শিব দেবীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য গর্ভেশ্বর রাজার বালিকা কন্যার সঙ্গে গোরক্ষের বিবাহ দিয়ে তাঁর ব্রহ্মচর্য নষ্ট করতে চাইলেন। কিন্তু গোরক্ষ স্ত্রীকে ত্যাগ করে গেলেন। গোরক্ষনাথের স্ত্রী গোরক্ষের কৌপীন বা কপটা সিক্ত জলপানের ফলে একটি পুত্র লাভ করেন যার নাম কপটীনাথ। পথে গোরক্ষনাথ কানুপার কাছে জানতে পারলেন যে তাঁর গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে মায়ার ছলনায় বদ্ধ হয়ে আছেন।

গোরক্ষনাথ তখন গুরুকে উদ্ধার করে আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করার জন্য কদলীর দেশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, গুরু নারীদের সঙ্গে বাস করে যোগদেহ নষ্ট করে ফেলেছেন, তাঁর একটি সন্তান (বিন্দুনাথ)-ও হয়েছে এবং গুরুর মৃত্যুর আর দেরি নেই। নারীর ছদ্মবেশে মাদলে ঘা দিয়ে গোরক্ষ গুরুকে 'কায়া সাধ কায়া সাধ' বলে সচেতন করে দিতে চাইলেন। এতেও চেতনা আসে না দেখে গোরক্ষ কতকগুলি প্রহেলিকা বা ধাঁধা বলেন-

'পুকুরেতে জল নাই' পার কেনে বাড়ে
বাসার মধ্যে ছায় থুই আড়ি-মুউড়া করে।

এরপর এতেও কাজ হল না দেখে মায়াপাশ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে গোরক্ষ, মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে মেরে ফেললেন। গুরু পুত্রশোকে ব্যাকুল হলে পুত্রকে আবার বাঁচিয়ে দেওয়া হল, এবার- 'স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিয়া'।

মায়াপাশ বদ্ধ মীননাথ শিষ্যের সাহায্যে পুনর্বার যোগীজীবনে ফিরে গেলেন। তাঁর আত্মজ্ঞান ফিরে এল, পুত্র বিন্দুনাথও যোগী সন্ন্যাসী হলেন।

১০.৪.২ গোরক্ষবিজয়ে প্রতিফলিত নাথ ধর্ম, দর্শন ও সাধনপন্থা

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে মানবজীবনের একটি চিরন্তন দুর্বলতার কথা প্রচারের পাশাপাশি নাথ ধর্মের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কীর্তন করা হয়েছে। জীবনবোধের অপূর্ব স্পর্শ এতে থাকা সত্ত্বেও এই আখ্যান মূলত যোগপন্থার উদ্দেশ্যবাহী। গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গোরক্ষপন্থী যোগীদের গুহ্য তত্ত্ব কোথাও খোলাখুলিভাবে, কোথাও বা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। অপক্ক দেহকে কী করে যোগদেহে পরিণত করতে হবে, কেমন করে মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করতে হবে, মরদেহের মধ্যে অমর হতে হবে, সে সমস্ত গুহ্যাতিগুহ্য মহাজ্ঞানের কথা গোরক্ষনাথ নিজ গুরু মীননাথকে শুনিয়ে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন । এই মতের মূল আদর্শ মহারস সংরক্ষণ (বিন্দুধারণ) ও উল্টাসাধন। এই তত্ত্বটি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে ভারতবর্ষীয় সমাজে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে চর্চিত হয়ে আসছে। জড়দেহকে অজড় স্বভাব ও অমর করবার জন্য এই প্রকার সাধনা স্বীকৃত ও ব্যাখ্যা হয়েছে। তাই এইপ্রকার সাধনা কখনও ব্রাহ্মণ্যমত, কখনও বৌদ্ধমত, কখনও সুফিমত, কখনও বা যোগীমতে গৃহীত হয়েছে। বিন্দুধারণের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হতে পারে- যোগে পরবর্তীকালে এই ধরনের হঠযোগ সাধনা প্রবিষ্ট হয়। খেচরী মুদ্রার দ্বারা বিন্দুধারণ সাধক নিজেই করতে পারেন, অথবা বজ্রোলী মুদ্রার দ্বারা নারী সাহচর্যেও তা লাভ করা যায়। এই শেষোক্ত পন্থা পরবর্তীকালের তন্ত্র হঠযোগ, কৌলপন্থা ও সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু গোরক্ষপন্থায় বজ্রোলী পন্থা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কারণ নারীসঙ্গে মহাসাধকও 'মহারস' অবিচলিত রাখতে পারেন না। বোধহয় মীননাথের অধঃপতনের দৃষ্টান্তের দ্বারা গোরক্ষপন্থীরা পুনঃ পুনঃ তারই নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য 'হঠযোগপ্রদীপিকা'র একটি শ্লোকের টীকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ সহজোলী ও বজ্রোলী মুদ্রাকে শ্রদ্ধা করতেন— এরূপ বর্ণনা আছে। মীননাথকে গোরক্ষনাথ কায়াসাধনার যে গূঢ় কথা গানের সাহয্যে বলেছিলেন, তার মূল বক্তব্য হল— যোগশাস্ত্রে, বিশেষত হঠযোগশাস্ত্রে

বিন্দুধারণ বা বিপরীতে বিন্দুসঞ্চরণ মোক্ষের একমাত্র উপায় রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু গুরু সেই অমূল্য সম্পদ নষ্ট করেছেন। তাই গোরক্ষনাথ কৌশলে গুরুকে চারিচন্দ্র সাধনার কথা বললেন-

'গুরু চারিচন্দ্র হয়ে
শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
তাহার সাধিলে পরিত্রাণ'

'উল্টাযোগের' কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন-

'উলটিয়া ধর আপনা
ত্রিবেণীতে দেয় হানা
খালে জল ভরিতে কারণ।'

তবু যোগসাধনায় মীননাথের অনীহা দেখে গোরক্ষনাথ অনেকগুলি প্রহেলিকা আবৃত্তি করে যোগাচার ব্যাখ্যা করলেন; বার বার উল্টাসাধন পদ্ধতি অবলম্বন করতে ও পবনবিজয় করে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন। নাথযোগপন্থার বিশিষ্ট ক্রিয়া-কর্মের প্রাকরণিক নির্দেশই গোরক্ষনাথের জবানিতে রূপক-প্রহেলিকার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। নাথযোগী সম্প্রদায়ের কায়াসাধনতত্ত্ব ও উল্টাসাধনার রহস্য দুর্জেয় ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থের শেষাংশে সাধ্যসাধনার কথা গুরুতর আকার ধারণ করে অনেকটা স্থান দখল করেছে। শিষ্য গুরুকে দুবার যোগসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন প্রায় একই উপমা-রূপক-প্রতীক ব্যবহার করে। ফলে বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটেছে। আজকের পাঠক হয়তো এই কাব্য থেকে আখ্যানরস ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য পেতে পারেন, কিন্তু সে যুগের যোগী সমাজে এর তত্ত্বাংশের মর্যাদাই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। গোরক্ষবিজয়ে প্রতিফলিত নাথ ধর্ম, দর্শন ও সাধনপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন। (অনধিক ২০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৪.৩ সতী ময়না

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষত উত্তরবঙ্গের কৃষকসমাজে রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর মাতা রানী ময়নামতীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনি ছড়া-পাঁচালি আকারে এখনও প্রচলিত আছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের নানা প্রদেশেও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বিষয়ক কাহিনি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে মৌখিক ছড়া-পাঁচালি ছাড়াও দু-একটি পুথিও পাওয়া গেছে। অনেকে এ কাহিনির বাস্তব সত্তা ও ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনেক অনাবশ্যক গবেষণা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশ থেকেই মূল কাহিনিটি বিহার, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে গিয়েছিল। বাংলার কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী হলেন রানী ময়নামতী এবং পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র। এই কাহিনির কেন্দ্র কিন্তু রংপুর। নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচন্দ্র নাটকে' গোপীচন্দ্রকে বঙ্গের রাজা বলা হয়েছে। প্রাচীন কবি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ'ও গোপীচন্দ্র বাংলার রাজা বলে

উল্লিখিত হয়েছেন। গুজরাটি উপাখ্যানে গোপীচন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্রকে (মানিকচন্দ্র নন) বাংলার রাজা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এ কাহিনির উৎপত্তি স্থান হচ্ছে বাংলাদেশে, আর এ-দেশ থেকেই কাহিনিটি অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনিটি নাথ-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এর জড় পূর্বতন কাহিনি 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে নিহিত আছে।

'গোরক্ষবিজয়ে' দেখানো হয়েছে, একমাত্র গোরক্ষনাথ ব্যতীত অন্য নাথ আচার্যেরা দেবী দুর্গাকে দেখে ক্ষণকালের জন্য কামের বশীভূত হয়েছিলেন এবং দেবী তার জন্য তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপাকে তিনি অভিশাপ দিলেন, মেহারকুলের রানী ময়নামতীর কাছে গিয়ে নীচ কর্ম করতে হবে। তাঁর সঙ্গে ময়নামতীর সম্পর্ক গুরুভাই-ভগিনীর মতো, কারণ তাঁরা দুজনেই গোরক্ষনাথের শিষ্য। অভিশাপের ফলে জালন্ধরি বা হাড়িপা ময়নামতীর রাজ্যে গিয়ে নীচ হাড়ীর কর্ম অবলম্বন করলেন। কানুপাকে দেবী অভিশাপ দিয়েছিলেন, বিমাতার প্রতি আকর্ষণের হেতু তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। কানুপা-বিমাতা-সংক্রান্ত কোনো পালা বা পাঁচালি বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। বাংলার বাইরে কানুপার ঐ ধরনের কাহিনি প্রচলিত আছে।

রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে গোপীচন্দ্রের পাঁচালির মূল বিষয়। রানী ময়নামতী অদ্ভুত শক্তি 'মহাজ্ঞানে'র অধিকারিণী ছিলেন। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে দেখলেন যে, তাঁর স্বামী রাজা মানিকচন্দ্রের শীঘ্র মৃত্যু হবে। তাঁকে দীর্ঘায়ু দেবার জন্য রানী স্বামীকে তাঁর কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা করতে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা পৌরুষে ঘা লাগার ভয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' নিতে অস্বীকার করার ফলে তিনি যমদূতের বশীভূত হয়ে মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করলেন। রানী ময়নামতী যমদূতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েও লুপ্ত-আয়ু স্বামীকে বাঁচাতে পারলেন না। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর গোপীচন্দ্র নামে একটি পুত্র হল। গোপীচন্দ্র ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ময়নামতী পুত্রকে অদুনা-পদুনা নাম্নী দুই রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন-এ দুজন কিন্তু পরস্পরের ভগিনী। ময়নামতী যোগবলের দ্বারা দেখলেন, তাঁর সন্তানেরও তাঁর স্বামীর মতো অকালমৃত্যু হবে। হাড়িপার কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে কিছুকাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজক না হলে তাকে কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তরুণ যৌবনে স্ত্রীদের ছেড়ে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, অদুনা-পদুনাও গোপনে শাশুড়ির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। স্ত্রীদের প্ররোচনায় গোপীচন্দ্র মাতৃচরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করতে কুণ্ঠিত হলেন না, হাড়িসিদ্ধা-জালন্ধরিপাদকে জড়িয়ে তিনি প্রকাশ্যেই মায়ের বিরুদ্ধে অসতীত্বের অভিযোগ আনলেন। ময়নামতী নিজেকে নিষ্কলঙ্ক সতী প্রমাণের জন্য বাধ্য হয়ে ছেলের কাছে সুকঠোর পরীক্ষা দিলেন। শেষে গোপীচন্দ্রের অভিযোগ, অসম্মতি ও প্রতিবাদ আর টিকল না। তাঁকে মায়ের নির্দেশ মতো হাড়িসিদ্ধার কাছে মন্ত্র নিয়ে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী সাজতে হল। হাড়িসিদ্ধা তাঁকে হীরানটীর বাড়িতে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। বহু দুঃখকষ্টে গোপীচন্দ্রের দিন কাটতে লাগল। অবশেষে সন্ন্যাসের কাল অবসান হলে হীরানটীর কবল থেকে তাঁকে হাড়িসিদ্ধা উদ্ধার করলেন এবং আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান শেখালেন। পরে সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্র গৃহী হয়ে দুই স্ত্রীকে নিয়ে মহাসুখে রাজত্ব করতে লাগলেন, মায়ের উপদেশে সন্ন্যাস নেবার ফলে তাঁর

আর অকালমৃত্যু হল না। এ কাহিনিটি মূলত লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, লোকমুখে-শ্রুত ছড়া-পাঁচালিই তার প্রমাণ। এতে শিথিল ধরনের আখ্যান জনরুচির অনুরূপ করেই বিবৃত হয়েছে, কাহিনি, চরিত্র ও বর্ণনার ঢঙে অশিক্ষিত মনের ছাপ পড়লেও ধর্মতত্ত্বাদি ব্যাখ্যায় এই সমস্ত বর্ণজ্ঞানহীন লোক-কবিরা বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ে মায়ের ওপর দোষারোপ, মাতৃচরিত্রে সন্দেহ, শাশুড়ির বিরুদ্ধে বধূদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ব্যাপার বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে অদুনা-পদুনার বিলাপের ভাষাটি অমার্জিত হলেও আর্ত হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে করুণ বেদনা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। কেউ কেউ এই সমস্ত কাহিনির উচ্চতর সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ এতে উল্লিখিত সমাজচিত্রগুলিকে মধ্যযুগের বাংলার যথার্থ সমাজকথা বলে এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে খুব আলোচনা করে থাকেন, কেউ-বা গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর স্থান-কাল নিয়েও নানাধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আনন্দবোধ করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অশিক্ষিত কৃষক-কবিদের মুখে মুখে রচিত এই সমস্ত ছড়া-পাঁচালিকে পুথিগত সাহিত্যের সমতুল্য না-ভাবাই উচিত। ত্রিপুরায় মেহারে এখনও এই গানে উল্লিখিত স্থানের নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, কোনো এক সময়ে স্থানীয় কোনো অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনা ঘটুক আর না ঘটুক, স্থানীয় কবিরা কাহিনি রচনার সময় পটভূমিকা হিসেবে নিজ নিজ অঞ্চলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। রাণী ময়নামতী চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (অনধিক ২০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৫ নাথ সাহিত্য ধারার উল্লেখযোগ্য কবি

নাথ সাহিত্যের কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই সময়ই ছিল নাথধর্ম বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে এই সময়ই নাথসাহিত্যেরও অগ্রণী বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সঠিক সময় নিরূপণ করা যথেষ্ট দুরূহ।

গ্রীয়ার্সন সাহেব প্রথম উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় এবং রংপুর থেকে ময়নামতীর গানের পুথি আবিষ্কার করেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত মীনচেতন কাহিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম দেখা যায় ধর্মঠাকুর-ভক্ত সহদেব চক্রবর্তীর ও দ্বিজ লক্ষ্মণের 'অনিল পুরাণ'-এ। পণ্ডিতদের অনুমান এই যে গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গানের যতগুলি পুথি পাওয়া গেছে, সবই অষ্টাদশ শতকে রচিত। গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থের ভণিতায় ভীমসেন রায়, ভীম দাস, শ্যামাদাস সেন, কবীন্দ্র দাস ও ফৈজুল্লার নামে দেখা যায়।

ময়নামতী বিষয়ক প্রাচীনতম বাংলা পুথি ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত। কবি দুর্লভ মল্লিক, অন্যান্য পুঁথির কবি ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ। দুর্লভ মল্লিকের গীতিকায় একটি নতুন চরিত্র পাওয়া যায়-জালন্ধরি-পা-র পুত্র শিশুপা। সাধারণত নাথ-কবিদের রুচি নিম্ন। কিন্তু দুর্লভ মল্লিকের

গ্রন্থে ভদ্ররুচি যথাসম্ভব রক্ষিত হয়েছে। ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কিংবা ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। কাহিনি-গ্রন্থন, চরিত্র-কল্পনা কিংবা জীবন-দৃষ্টির অভিনবত্বের বিশেষ কোন কাব্যিক উৎকর্ষ নাথ-সাহিত্যে আমরা পাই না। তবু দুটি পরিচ্ছন্ন কাহিনির মাধ্যমে সেকালের জনজীবন বেদনা এই কাব্যদ্বয়ের মধ্যে আভাসিত হয়েছে, এটাই নাথ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিত্ব।

১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

গোরক্ষবিজয়ের সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমাদের বক্তব্যকে সংহত করলে আমরা দেখব যে, নাথ ধর্ম ও সাধনা মূলত দেহকেন্দ্রিক, চিত্তবৃত্তিনিরোধই এর প্রধান লক্ষ্য। শিবকে কেন্দ্র করে যে মোক্ষাভিপ্রায়ী যোগাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল তাঁরাই নাথযোগী নামে পরিচিত। শিব তাঁদের আদিগুরু, তবে গোরক্ষনাথ এঁদের প্রধান আচার্য। গোরক্ষবিজয়ের অভিনবত্ব হচ্ছে- এতে গুরু মীননাথ অপেক্ষা শিষ্য গোরক্ষনাথের গৌরবই বেশি প্রচারিত হয়েছে। নীতিভ্রষ্ট গুরুকে গোরক্ষনাথই সাধনার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনেন। যোগশাস্ত্রে বিন্দুধারণ বা বিপরীতে বিন্দুসঞ্চরণ মোক্ষের একমাত্র উপায়। মীননাথ সেই অমূল্য সম্পদ নষ্ট করেছেন। গোরক্ষনাথ প্রহেলিকা আবৃত্তি করে, গুরুর কাছে যোগাচার ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে নাথপন্থার বিশিষ্ট ক্রীয়া-কর্মের প্রাকরণিক নির্দেশই গোরক্ষনাথের মুখে রূপক-প্রহেলিকার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

গোরক্ষনাথ চরিত্রে গুরুর প্রতি অচলা ভক্তির পাশাপাশি অতুলনীয়, অবিচলিত সংযম প্রকাশিত হয়েছে। তবে চরিত্রটিতে আদর্শবাদের প্রবল্যের ফলে চরিত্রটির মানবিক আবেদন অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তুলনায় মীননাথ চরিত্র অধিকতর প্রাণবন্ত ও বহুলাংশে মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। দেবতা চরিত্রগুলিরও এই কাহিনিতে মানবায়ন ঘটেছে। পার্বতী চরিত্রে অবদমিত কামনার অবচেতন প্রকাশ ঘটেছে। গোরক্ষবিজয়ে তৎকালীন সমাজ ও লৌকিক জীবনের ছায়াপাত রয়েছে। কদলীরাজ্যের বর্ণনায় ধরা পড়েছে অনার্যমূল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো। তাছাড়া বিধি-কৃত্য, ক্রীয়া-কর্মের বর্ণনাও গোরক্ষবিজয়ের বহু স্থানে পাওয়া যায়।



১০.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা—

- নাথ ধর্ম-দর্শন ও সাধনপন্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি।
- গুরু মীননাথের তুলনায় শিষ্য গোরক্ষনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় সেই প্রসঙ্গটিও আমাদের গোচরে এসেছে।
- কাব্যের মানব-জীবন রস ও সমাজচিত্র প্রসঙ্গটিও জানতে পেরেছি।



১০.৮ অতিরিক্ত পঠন

১। দাশগুপ্ত, শশীভূষণ (১৪২৫); ভারতীয় সাধনার ঐক্য, ভারতীয় সাধনা; কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

২। ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ (সম্পা.) (২০০৯); গোপীচন্দের গান; কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৩। রায়, মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৩৬৫); গোর্খ বিজয়; কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

৪। রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৫৯); বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

৫। সেন, সুকুমার (১৩৯৮); বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: আনন্দ



১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে মানবজীবনের একটি ...এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (বিশেষ দ্রষ্টব্য... ১০.৪.২ অংশ)

২। উত্তরবঙ্গের কৃষকসমাজে রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর মাতা রানী ময়নামতীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনি ছড়া-পাঁচালি আকারে এখনও প্রচলিত আছে..... এইভাবে উত্তরটি তৈরি করুন। (বিশেষ দ্রষ্টব্য..... ১০.৪.৩ অংশ)



১০.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নাথ ধর্মের স্বরূপ বিবৃত করুন। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে নাথ ধর্ম কতখানি অনুসৃত হয়েছে আলোচনা করুন।

২। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে গুরুবাদ কীরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে, আলোচনা করুন।

৩। 'গোরক্ষবিজয়ে' মানবিক আবেদন কতখানি যে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। কোন গুণে 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যখানি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন তা আলোচনা করুন।

৫। মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে 'গোপীচন্দ্রের গান' এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। 'গোপীচন্দ্রের গান' —এর সমাজ জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

আধ্যায় ১১ : রাজসভার সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১১.২ পরিচিতি
১১.৩ কোচবিহার রাজসভা
১১.৪ ত্রিপুরা রাজসভা
১১.৫ আরাকান রাজসভা
১১.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১১.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১১.৯ অতিরিক্ত পঠন
১১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্যের গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত হবেন।
- কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজসভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রতিটি রাজসভার সাহিত্য আলোচনা শেষে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তর লিখতে পারবেন।

১১.২ পরিচিতি

মূলত রাজসভায় রচিত সাহিত্যকেই রাজসভার সাহিত্য বলা হয়। একটা সময় রাজসভায় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা খুবই অভিজাত বলে মনে করা হত। আসলে রাজাদের সামাজিক জীবনের প্রশস্তি বিধৃত করার জন্য কবিদের সাহায্য লাভ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাই রাজপ্রশস্তির শ্লোক রচনার জন্য রাজারা কবিদের যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন।

অন্যদিকে কবিদের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় যে, রাজ পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনেই রাজ প্রশংসাসূচক কাব্যরচনায় ব্রতী হতেন। মধ্যযুগের বিভিন্ন কবিদের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে রাজসভার নিবিড় সংযোগের কথা জানা যায়। এঁদের অনেকেই তাঁদের বিশেষ বিশেষ রচনার জন্য নানারকম উপাধিতেও ভূষিত হয়েছেন। যেমন কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেছিলেন। তবে একথা উল্লেখ্য যে, রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা কবিদের সাহিত্য রচনায় কিছু সীমাবদ্ধতাও

ছিল। যেমন রাজার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত কবিদের নিজস্ব ভাগ্য। রাজা পরিবর্তিত হলে প্রশস্তিও পরিবর্তিত হত। যাইহোক, এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই আমরা কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজসভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করতে সক্ষম হব।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। রাজসভার সাহিত্য বলতে কী বোঝেন, উদাহরণসহকারে বুঝিয়ে বলুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৩ কোচবিহার রাজসভা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্য আলোচনায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোচবিহার রাজসভা। যদিও সম্ভবত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই কামতা-কোচ রাজসভায় রচিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেরকমভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। কোচবিহার প্রাচীন কালে আসাম-বঙ্গ সীমান্তবর্তী প্রাগজ্যোতিষ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। ভাস্কর বর্মার সময় (আনুমানিক খ্রি: ৫৯৪-৬৫০ অব্দ পর্যন্ত) কামরূপ দেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টীয় ৬৫০ অব্দে ভাস্কর বর্মার মৃত্যুর পর কামরূপ তিব্বত রাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে কামরূপ তিব্বতীয় আক্রমণে পরাস্ত হয়েছে। কামরূপ দেশের পরবর্তী ইতিহাস অনেকটাই অস্পষ্ট। তবে মোটামুটি জানা যায় যে সেন রাজত্বের পতনের পর বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে স্বাধীন কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্ব কাল থেকেই কোচ রাজ দরবারে সাহিত্যচর্চা আরও বিকশিত হয়েছিল। জানা যায়, কবি হেম সরস্বতীর সঙ্গে রাজা দুর্লভ নারায়ণের সখ্যমূলক সম্পর্ক ছিল। হেম সরস্বতীর কবি প্রতীভার অন্যতম স্বাক্ষর 'প্রহ্লাদ চরিত', 'বামন পুরাণ', 'হরগৌরী সংবাদ' ইত্যাদি রচনা। রাজা দুর্লভনারায়ণের সময় আরেকজন বিখ্যাত কবি ছিলেন হরিহর বিপ্র। তিনি জৈমিনী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী। দুর্লভ নারায়ণের সমসাময়িক কবিরত্ন সরস্বতী ও মাধব কন্দলি মূলত ছিলেন বৈষ্ণব ভাবধারার কবি।

বিশ্বসিংহের পুত্র রাজা নরনারায়ণ বারাণসী থেকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর রাজসভার সভাকবি ছিলেন ভূষণ দ্বিজ। রাজসভাটিতে সংস্কৃত ভাষায় কথপোকথন হতো, এমনকি রাজকার্জে অশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ যেখানে বিবাহ করেন সেখান থেকে আগত পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রাজাদেশে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ব্যকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' প্রণয়ন করেন। পরবর্তী কামরূপের পণ্ডিত জীবেশ্বর ও জয়কৃষ্ণ 'প্রয়োগমালার' পৃথক পৃথক টীকা রচনা করেন।

এখানে বলা প্রয়োজন রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ পুরাণ-প্রিয় ছিলেন। প্রধানত তার আগ্রহে ও উৎসাহে কামতা-কামরূপের রাজসভায় পুরাণ অনুবাদ শুরু হয়। শুক্লধ্বজের অনুগ্রহপুষ্ট পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' বলা হয়েছে—

"একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কায।।
....
পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিত বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়।।
এ কারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেশ ভাষাবন্দে রচিয়ো পয়ার।।"

বহুপূর্বে সূচিত এই অনুবাদকর্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছিল। কোচবিহার রাজসভার পুরাণ পাঠক ও কবিদের মধ্য অন্যতম ছিলেন অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ ছিলেন ব্রাহ্মণ; তাঁর পিতা ভীমসেন। ড° সুকুমার সেনের মতে রামসরস্বতী অনিরুদ্ধেরই নামান্তর। কিন্তু 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা আমানতউল্লা আহমেদ অনিরুদ্ধ ও রাম সরস্বতীকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। শুক্লধ্বজের অনুরোধে এই অনিরুদ্ধ 'ভারত পাঁচালী' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে সার্বভৌম ভট্টাচার্য 'ভবিষ্য পুরাণ' অনুবাদ করেন। কলাপ দ্বিজ নামক এক কবি ভাগবত পুরাণের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সর্গের অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। ড° অজয় কুমার চক্রবর্তীর মতে নরনারায়ণের রাজত্ব কালে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের একখানি মহাভারতের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'কৌমুদী' নাম দিয়ে অনেকগুলি স্মৃতি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি 'নল দময়ন্তীর উপাখ্যান', 'ভীম পরিণয়', 'উমা পরিণয়' নামে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। পীতাম্বর সংস্কৃত ভাষা থেকে কাব্য কথাকে বাংলায় অনুবাদ করলেও তার ভাষা কোথাও সংস্কৃত গন্ধী নয়। সহজ, সরল দেশজ ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করে সংস্কৃত অনাভিজ্ঞ মানুষের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেন। রাজা নরনারায়ণের সভাসদ কবি অনন্ত-কন্দলী রচিত মহাভারতের 'রাজসূয়' যোগ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অনন্ত কন্দলী ভাগবতের দশম স্কন্দ, জয়দেবে 'গীতগোবিন্দম্'-এর অনুবাদ করেন।

পরবর্তীতে রাজা নরনারায়ণের আহোম রাজাকে লেখা চিঠিখানিই প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। যাইহোক তাঁর রাজত্বকালে তাঁর সভা কবিরা রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশ অনুবাদের মধ্য দিয়ে পুরাণ চর্চার একটা বিশেষ পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। নরনারায়ণের রাজসভার এই সাহিত্যচর্চার ধারা তাঁর পরবর্তী রাজাদের রাজসভায়ও অনুসৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে লক্ষ্মীনারায়ণ , বীরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ কিংবা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালে কোচ রাজসভায় পৌরাণিক তথা বৈষ্ণবীয় ভাব সম্বলিত সাহিত্যচর্চার যে ব্যাপকতা দেখা যায়, তাতে এই রাজসভার সাহিত্যচর্চার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১১.৪ ত্রিপুরা রাজসভা

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজসভা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজসভা। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে ত্রিপুরার উল্লেখ রয়েছে। ত্রিপুরায় প্রচলিত ত্রিপুরাব্দের সূচনা রাজা ত্রিপুর বা তাঁর পুত্র ত্রিলোচনের সময় আনুমানিক ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ত্রিপুরার রাজারা আগে পিতৃত্ববাচক 'ফা' উপাধি ব্যবহার করতেন। 'ডাঙ্গার ফা'র কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফা গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিনের সাহায্যে ১৩৪৭ খ্রি: থেকে ১৩৫৮ খ্রি: মধ্যে ত্রিপুরার রাজ সিংহাসন অধিকার করে এবং গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'মাণিক্য' উপাধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে রত্নমাণিক্য রাজবংশের ধারা প্রবাহিত হয়েছে।

ত্রিপুরার রাজ পরিবার বরাবরই বাংলা ভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিল। একই সঙ্গে ত্রিপুরার সঙ্গে বঙ্গদেশের নিবিড় সংযোগও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বিষয়। এসব কারণে বাংলা খুব সহজেই ত্রিপুরার রাজ্যভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এদিক থেকে বিচার করলে ত্রিপুরার রাজসভায় বাংলা ভাষায় সাহিত্যের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা একটি খুবই স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে হয়। অন্যান্য রাজসভার মতোই এখানকার রাজসভারও উদ্দেশ্য ছিল সভাকবিদের দিয়ে রাজপ্রশস্তি রচনা করা।

ত্রিপুরার রাজসভায় রচিত রাজন্য চরিত কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে — 'রাজমালা', 'কৃষ্ণমালা', 'শ্রেনীমালা' , 'চম্পকবিজয়' ও 'গাজীনামা'। এরমধ্যে প্রথম তিনটি রাজসভার সাহিত্য ও শেষ দুটি জনসভার সাহিত্য। উক্ত রচনাগুলির মধ্যে 'রাজমালা'য় বিধৃত হয়েছে ত্রিপুরা রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস। পুরোহিত দর্লুভেন্দ্র পণ্ডিত, বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর রাজা ধর্মমাণিক্যের সময় থেকে 'রাজমালা'র রচনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে মহারাজা কিশোরমাণিক্যের আমল পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা 'রাজমালা' রচনা করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতানুসারে বিভিন্ন পর্বে রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থটি মোট ছয়টি লহরে বিভাজিত। তবে বাস্তবে এর চারটি লহরই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থটি। কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনের উত্থান পতন তথা সমসাময়িক সময় ও সমাজের দলিল হিসাবেও গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'শ্রেনীমালা' গ্রন্থটির রচয়িতা দুর্গামণি উজীর। সম্ভবত মহারাজা কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৬-১৮৩০) গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে ত্রিপুরার রাজবংশের বিভিন্ন রাজাদের নামের তালিকা তথা মহারাজা কল্যাণমাণিক্য থেকে মুকুন্দমাণিক্য পর্যন্ত রাজবংশের বিভিন্ন কীর্তি-কাহিনি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'চম্পকবিজয়' কাব্যের রচয়িতা সেক মহদ্দিন। কাব্যটির মূল পাণ্ডুলিপির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে গবেষকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্যের মতে এই গ্রন্থটি 'রাজমালা'র পরিপূরক। 'গাজীনামা' লোকায়ত রীতিতে লেখা ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য। নোয়াখালির খিরিস্তাদার মৌলবী লোতফল খবির সাহেবের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার এক সাধারণ প্রজার সন্তান নিজ বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের জোরে কীভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন, সেটাই গ্রন্থটির অন্যতম বিষয়। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

ত্রিপুরা রাজসভায় বেশ কিছু অনুবাদ সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুদিত 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ'। তাছাড়াও ত্রিপুরায় যেহেতু প্রাক্ চৈতন্য যুগেই বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রভাব ছিল, তাই ত্রিপুরার রাজসভায় কিছু কিছু বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত গীতিকবিতাও রচিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য রচিত হোলি ও ঝুলন উৎসবের গানের সংকলন। সুতরাং সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়, ত্রিপুরার রাজসভার সাহিত্য রাজপ্রশস্তির বাইরেও বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছিল।

১১.৫ আরাকান রাজসভা

চৈতন্য পরবর্তী বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য যখন বৈষ্ণবীয় ভক্তি রসে মগ্ন; তখন বাংলার অদূরবর্তী আরাকান রাজসভায় যে ব্যতিক্রমী সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল, তা আরাকান রাজসভার সাহিত্যকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিল। সুদূর আরাকানে অবাঙালি রাজার অনুগ্রহ লাভ করে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছিলেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি দৌলত কাজী। দৌলত কাজী আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মার রাজসভায় মন্ত্রী আসরফ খাঁর নির্দেশে 'সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী' আখ্যান রচনা করেছিলেন। কাব্যটির সূচনায় আরাকান রাজসভার পরিচয় প্রদান করে কবি লিখেছেন—

"কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্মা রাজা ধর্ম্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।"

কাব্যটি মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত। বীররস ও শৃঙ্গাররসের যুগ্ম সমন্বয়ে গঠিত রাজকীয় রোমান্স কাব্যটির অন্যতম প্রধান বিষয়। বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় মোড়ক পরিত্যাগ করে মানবীয় রসাবেদনে 'সতীময়না' কাব্যটি খুব সহজেই পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিল। তবে কবি পুরো কাব্যটি শেষ করে যেতে পারেননি। অসমাপ্ত কাব্যটি পরবর্তীতে আলাওল শেষ করেছিলেন। দৌলতকাজী ও আলাওলের দ্বৈত সমন্বয়ে আরাকান রাজসভায় যে মানবীয় রোমান্টিক সাহিত্য শাখার সূচনা হয়েছিল, তা বাংলা সাহিত্যকে দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। 'লোরচন্দ্রানী', 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমূলকবদীউজ্জমান', 'সপ্ত পয়কর' প্রভৃতি কাব্য হিন্দি, আরবি, ফারসি ভাষার কাব্য অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যগুলি মানব প্রেমের নতুন আদর্শের জন্ম দিয়েছিল। একই সঙ্গে রাজসভার উপযোগী ভাষা এই রচনাগুলিকে আভিজাত্য প্রদান করেছিল।

আলাওলের প্রথম তথা শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। এটি জায়েসীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। 'পদ্মাবতী' ছাড়া আলাওলের আরও চারটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়— 'সয়ফুলমূলক বদীউজ্জমান', 'হপ্ত পয়কর', 'সেকান্দারনামা' ও 'তোহফা বা তত্ত্বপদেশ'। আলাওলের প্রায় সব রচনাই অনুবাদ হলেও রচনার কৃতিত্বে তা মৌলিকতা ও নতুন সৌন্দর্যে ভূষিত হয়ে উঠেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার যেকোনো একজন বিশিষ্ট কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনটিকে বাদ দিলে মধ্যযুগের বহুকাব্য রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। এমনকি স্বয়ং বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা মনোরঞ্জনের জন্য একসময় সাহিত্যচর্চা করতেন। রাজসভার সাহিত্যে রাজ অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য রাজার মনোরঞ্জনের বিষয়কে সাহিত্য চিন্তার অন্তর্ভুক্ত করতে হত। তবে এ জন্য রাজসভার সাহিত্যকে কখনোই হীন দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। বরং এই সাহিত্যগুলোই মধ্যযুগে প্রথম ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে আসার সাহস জুগিয়েছিল। আসলে এ এক বিচিত্র সাহিত্য প্রচেষ্টা যেখানে একদিকে যেমন ছিল ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বেয়ে নিয়ে যাওয়ার সামাজিক দায়িত্ব ঠিক তেমনি এর বিপরীতে গুরুত্ব পেয়েছিল মানব মন, তার ভালো লাগা মন্দ লাগা। রাজসভার সাহিত্য এই দুই দায়িত্বে সমান নিষ্ঠাবান এবং দিনের শেষে সে মধ্যযুগীয় অনুশাসিত ধর্মীয় বাতাবরণে প্রথম মানব মন ও মানবতার লক্ষণসূত্রও বটে।



১১.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- মধ্যযুগের এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যচর্চার ধারা রাজসভার সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হলাম।
- কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান এই তিনটি রাজসভার ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার মূল বিষয়গুলি ফুটে উঠেছে।
- কোচ রাজসভায় পুরাণচর্চার ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা সম্ভব হলো।
- ত্রিপুরা রাজসভার সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ, অনুবাদ সাহিত্য, গীতি সাহিত্য ইত্যাদির পরিচয় জানা গেল।
- আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের দুজন উল্লেখযোগ্য কবি দৌলতকাজী ও আলাওলের কাব্য রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১১.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। চৈতন্য পরবর্তী বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য যখন ...রাজার মনোরঞ্জনের জন্য যে সাহিত্য ...এভাবে আলোচনা করতে হবে।

২। 'সতীময়না বা লোরচন্দ্রনী' রচনা করেছিলেন ...তাঁর 'সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী'র বিষয়বস্তু তুলে ধরে কাব্য রচনায় তাঁর বিশেষত্বের দিকটি বিশ্লেষণ করতে হবে।

১১.৯ অতিরিক্ত পঠন

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯০); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (২০০৮); রাজসভার কবি ও কাব্য; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

৩। হালদার, গোপাল (১৩৬৩); বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা; ১ম খণ্ড; কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি.

৪। রায়, স্বপনকুমার (২০১১); কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা; কলকাতা : বুকস্ ওয়ে

১১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। কোচবিহার রাজসভায় রচিত বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। ত্রিপুরা রাজসভায় রচিত বাংলা সাহিত্যের মূল স্বরূপ নিজের ভাষায় আলোচনা করুন ।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরাকান রাজসভার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। কোচবিহার রাজসভা সাহিত্যে কবি পীতাম্বরের অবদান আলোচনা করুন।

৫। আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজির কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৬। আলাওলের সাহিত্য চর্চা বিষয়ে নিজের ভাষায় লিখুন।

৭। কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যচর্চা ইতিবৃত্তটি বুঝিয়ে বলুন।

.....

অধ্যায় ১২ : গাথা ও গীতিকা

বিন্যাস ক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা
১২.৪ পালা পরিচয়
১২.৫ সমাজ জীবন
১২.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৮ অতিরিক্ত পঠন
১২.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত
১২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি,—

- লোকসাহিত্যের এক অন্যতম জনপ্রিয় বিষয় গাথা ও গীতিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গীতিকার সমাজ জীবন সম্পর্কে অবহিত হবেন।

১২.২ পরিচিতি

গীতিকা মূলত আখ্যান নির্ভর লোকসঙ্গীত। আখ্যান ও গীতিময়তার সঙ্গে সঙ্গে এতে নাটকীয়তাও পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য 'Ballad'-এর সঙ্গে বাংলা গীতিকাকে এক করে দেখা হলেও 'Ballad'-এর সঙ্গে এর সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। অনেক গবেষকই 'Ballad'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'গাথা'-কে উল্লেখ করেছেন। 'গাথা' অর্থাৎ কাহিনি নির্ভর কবিতা। Ballad —অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত হলেও, গীতিকা কিন্তু বেশিরভাগই দীর্ঘতর হয়। যাই হোক মোটামুটিভাবে বলা যায় মৌখিক ঐতিহ্য নির্ভর লোকজীবনের কাহিনিমূলক সঙ্গীতগুলোকেই আমরা গীতিকা বলতে পারি। গীতিকাগুলির প্রকাশভঙ্গি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাটকীয় হয়। যাই হোক, আলোচ্য অধ্যায়ে আপনারা 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' তথা এর অন্তর্গত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পালাগুলি ও তার সমাজজীবন সম্পর্কে অবহিত হবেন।

কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দের উদ্যোগে মৈমনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকটি গীতিকা প্রকাশিত হলে তা সহজেই সাধারণ পাঠক মহলকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তীতে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলি 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। এই 'ময়মনসিংহ গীতিকা' চার খণ্ডে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'-র প্রথম খণ্ড। তাই প্রথম খণ্ডে মোট দশটি পালা সংকলিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান মদিনা, রূপবতী, দস্যু কেনারামের পালা ও কাজলরেখা।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে মোট চৌদ্দটি পালা সংকলিত হয়েছে। এগুলো হল --- 'ধোপার পাট', 'মইষাল বন্ধু', কাঞ্চনমালা', 'শান্তি', 'নীলা', 'ভেলুয়া', 'কমলারাণীর গান', 'মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'সাঁওতাল হাজামার ছড়া', 'নেজাম ডাকাইতের পালা', 'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদ আলি', 'সুরৎজামাল ও অধুয়া', 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'।

তৃতীয় খণ্ডে মোট সংকলিত পালার সংখ্যা হচ্ছে এগারো। এগুলো হল— 'মাঞ্জুর মা', 'কাফেনচোর', 'ভেলুয়া', 'হাতীখেদা', 'আয়নাবিবি', 'কমলসদাগর শ্যামরাম', 'চৌধুরীর লড়াই', 'গোপিনীকর্তন', সুজাতনয়ার বিলাপ' ও 'বারতীর্থের গান'।

শেষ তথা চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত পালার সংখ্যা মোট উনিশটি। এগুলো হচ্ছে— 'নছর মালুম', 'শীলাদেবী', 'রাজা রঘুর পালা', 'নুরন্নেহা ও করবের কথা', 'মুকুট রায়', 'ভারাইয়া রাজার কাহিনী', 'আন্ধাবন্ধু', 'বগুলার বারমাসী', 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', 'সন্নমালা', 'বীরনারায়ণের পালা', 'রতনঠাকুরের পালা', 'পীরবাতাসী', 'রাজা তিলকবসন্ত', 'মলুয়ার বারমাসী', 'জিরালনী', 'পরীবানুর হাঁহলা', 'সোনারায়ের জন্ম' ও 'সোনাবিবির পালা'।

১২.৩ মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

পূর্ববঙ্গগীতিকা প্রথম খণ্ডটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। এতে মোট দশটি পালা সংকলিত হয়েছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' দুটি গ্রন্থে পালাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন 'Eastern Bengal Ballads – mymansingh' নাম দিয়ে পালাগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাই খুব সহজেই পালাগুলি সর্বস্তরের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও পূর্ববঙ্গগীতিকা' মিলে মোট সংকলিত পালার সংখ্যা হচ্ছে ৫৪ টি। সাধারণ নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ সব কিছুরই জীবন্ত প্রকাশ ঘটেছে গীতিকাগুলিতে। বিশেষ করে নারীর প্রেমের স্বাধীনচেতা রূপ প্রকাশ এই গীতিকাগুলির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রায় সব পালাতেই নায়িকার স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গীকে বেছে নিয়েছে। জাতি-ধর্মের ঊর্ধে উঠে-পালাকারেরা নারীর প্রেম, বিরহ, সামাজিক অবস্থান, ব্যর্থতা, বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। লোকভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে লোকজীবনের বাস্তব রূপ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি অলঙ্কার প্রয়োগের কুশলতায় গীতিকাগুলি অপূর্ব কাব্যগুণ সমন্বিতও হয়ে উঠেছে। যেমন—

'মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি' কিংবা 'দিনে দিনে ফোটে যৌবনের কালি'। প্রকৃতিচেতনার দিক থেকেও পালাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বেশিরভাগ পালারই আখ্যানভাগ তথা পটভূমির ক্ষেত্রে প্রকৃতির একটা বিরাট ভূমিকা দেখা যায়। যেমন মহুয়া পালায় একটা জায়গায় পাই—

"বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে খায়।
মালাম পাথরে দুইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়।।"

বন-জঙ্গল থেকে শুরু করে সূর্য, চাঁদ, নদী, পাহাড়— প্রকৃতির প্রায় সব উপাদানই অন্যতম কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে পালাগুলিতে। সমকালীন সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটেও পালাগুলির গুরুত্ব রয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, খাদ্য প্রণালী সবই আলোচ্য গীতিকাগুলিতে জায়গা করে নিয়েছে খুব সহজেই। সুতরাং সার্বিক বিচারে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব নিয়ে এসেছে একথা বলাই বাহুল্য।

১২.৪ পালা পরিচয়

'মৈমনসিংহগীতিকা'-র অন্যতম জনপ্রিয় পালা হচ্ছে 'মহুয়া'। কাহিনি, চরিত্র ও বর্ণনার অভিনবত্বে পালাটি খুব সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মোট চব্বিশ্‌টি পরিচ্ছেদ পালাটিতে বিভক্ত। পালাটির মূল বিষয় ও নদের চাঁদের প্রেম। বেদের দলের সঙ্গে খেলা দেখতে বামনকান্দা গ্রামে এসে নদের চাঁদের সঙ্গে মহুয়ার প্রথম দর্শনেই প্রেম জাগ্রত হয়। কিন্তু বেদের দলের সর্দার তথা মহুয়ার পালক পিতার এই সম্পর্কে অনীহা থাকায় প্রেমিক যুগলকে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সন্মুখীন হতে হয়। শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহুয়ার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বুদ্ধিমত্তা পালাটির অন্যতম সম্পদ। যেমন — নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করে মহুয়া বলে উঠেছে,—

"পইড়া থাকুক বাপ মা পইড়া থাকুক ঘর।
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশান্তর।।"

আলঙ্কারিক প্রয়োগের দিক থেকেও পালাটি অভিনব। যেমন — মহুয়া যখন নদের চাঁদকে জলে ডুবে মরবার পরামর্শ দিয়েছিল তখন এর উত্তরে নদের চাঁদ বলে উঠেছে,—

"কোথায় পাইবাম কলসী কইন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।।"

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র আরেকটি জনপ্রিয় পালা 'চন্দ্রাবতী'। এই পালাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা। নায়িকা চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রেম যখন বৈবাহিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেসময়ই জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করে বসে। অন্যদিকে চন্দ্রাবতী ভগ্নহৃদয় নিয়ে শিব আরাধনা ও রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করল। এভাবে সে নিজের প্রথম প্রেমকে ভুলবার চেষ্টা করলেও তা খুব সহজসাধ্য ছিল না। অন্যদিকে জয়ানন্দও তার ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে শেষ বারের মতো সাক্ষাৎ করতে চাইল। কিন্তু চন্দ্রাবতী তার বাবার নির্দেশ মেনে জয়ানন্দের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান হয়ে জয়ানন্দ জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

এখানেই পালাটির শেষ। জয়ানন্দের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তার আত্মহত্যা যেন Poetic justice - এরই নামান্তর। অন্যদিকে চন্দ্রাবতীর চারিত্রিক বলিষ্ঠতাও পালাটির অন্যতম সম্পদ। যেমন, জয়ানন্দ মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করার পর সে তার বাবাকে জানিয়ে দেয় যে,---

"পিতা মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।"

বেশিরভাগ পালাই নারী প্রধান হলেও 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটি অনেকটাই ব্যতিক্রমী। এখানে কঙ্ক চরিত্রকে বেশ গুরুত্ব সহকারেই রচনা করেছেন পালাকার। জন্মের ছয়মাসের মধ্যেই সে মা-বাবাকে হারায়। পরে চণ্ডাল দাম্পতির ঘরেই আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু চণ্ডাল দম্পতির স্নেহও বেশিদিন জোটেনি তার। পালক মা-বাবাও অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এরপর গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। গর্গের আশ্রয়ে কঙ্ক বড় হতে লাগল। গর্গের কাছে দীক্ষা লাভ করে সে শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। এদিকে গর্গের কন্যা লীলা ধীরে ধীরে কঙ্কের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠল। অন্যদিকে কঙ্ক পীরের সাক্ষাতে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করে রচনা করল 'সত্যপীরের পাঁচালী'। এদিকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হল যে, সে চণ্ডালের পুত্র ও পীরের দীক্ষিত। একই সঙ্গে এটাও রটনা করা হল যে, শীলার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এসব রটনায় গর্গ বিশ্বাস করে তিনি কঙ্ক ও লীলাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বিষয়টা জানতে পেরে লীলা কঙ্ককে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দিল। কঙ্ক এই পরামর্শে সম্মত হয়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে গর্গ তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে কঙ্ককে আনার জন্য শিষ্য পাঠালেন। কিন্তু কঙ্ক ফিরে আসার আগেই বিরহিনী লীলা মৃত্যুবরণ করে। আর পাঁচটা পালার মতোই নায়ক-নায়িকার বিরহের মধ্য দিয়েই পালাটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে একথা বলতেই হয় যে, অন্যান্য পালার তুলনায় এতে পুরুষ চরিত্র অনেকটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

'দেওয়ান মদিনা' পালার সূচনা অনেকটাই নাটকীয়। এখানে দেখা যায় যে, মৃত্যু পথযাত্রী এক স্ত্রী তার স্বামীর কাছে দ্বিতীয়বার বিয়ে না করার জন্য কাতর অনুরোধ করছে। কারণ সে দুটি সন্তান রেখে যাচ্ছে। তার সন্তানেরা যাতে বিমাতার অত্যাচারের স্বীকার না হয়। সেইজন্যই তার এই কাতর আবেদন। কিন্তু স্ত্রীর এই কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করেই দেওয়ান সোনাফর দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। প্রথমবার স্ত্রীর আশঙ্কা মতোই সোনাফরের দ্বিতীয় স্ত্রী তার সন্তানদের জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সে সবার সামনে সতীন পুত্রদ্বয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে তাদেরকে চিরতরে বিনাশের জন্য জহ্লাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। কিন্তু জহ্লাদ তাদেরকে হত্যা না করে সাধুর ডিঙায় তুলে দেয়। সাধু আলাল ও দুলালকে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। আলাল সেখান থেকে পালিয়ে দেওয়ান সেকান্দারের বাড়িতে আশ্রয় করে। আলাল তার অসাধারণ কর্মপটুতা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে সহজেই সেকেন্দারের মন জয় করে। সে মন দিয়ে কাজ করলেও মাইনে পায় না। পরবর্তীতে প্রতিদান স্বরূপ আলাল সেকেন্দারের কাছে দু'শ সৈনিক ও পাঁচশ শ্রমিক চেয়ে নেয়। এদের সহায়তায় সে বানিয়াচঙ্গের পিতৃ ভিটা পুনরুদ্ধার করে বসতি স্থাপন করল।

অন্যদিকে দুলাল এক কৃষকের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে সেখানে মনে প্রাণে কৃষি কাজ করতে থাকে। ধীরে কৃষকের কন্যা মদিনার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে তারা

দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং তাদের এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয় যার নাম হয় সুরুজ্জামাল। এভাবেই তাদের সুখের সংসার চলছিল। কিন্তু এতে বাধ সাধে বড় ভাই আলাল। আলাল তার ছোটো ভাই দুলালকে খুঁজে বের করে মদিনাকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে দেওয়ান সেকেন্দারের কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। দুলালও ভাইয়ের কথা মতোই মদিনাকে ত্যাগ করে পুনরায় বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। এদিকে দুলালের বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই মদিনার অকাল মৃত্যু ঘটে। অনুশোচনাদগ্ধ দুলাল শেষে মদিনার কাছে ফিরে এলেও মদিনাকে আর ফিরে পায়নি। দুলাল চরিত্রের দুর্বলতার পাশাপাশি মদিনার অপূর্ব পতিপ্রেম পালাটির অন্যতম বিচার্যবিষয়। তার স্বামী দ্বিতীয় বার বিয়ে করা সত্ত্বেও, তার বিরুদ্ধে মদিনা কোনোরূপ অভিযোগ প্রকাশ করেনি। নিজের দুঃখ ভোগ করে নিজের ভাগ্যকে দোষী সাবস্ত করে অচিরেই সে বিদায় নিয়েছে সংসার থেকে।

'কাঞ্চনমালা' পালাটি অনেকটাই রূপকথাধর্মী। পালাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কাঞ্চনমালা অভিশপ্ত হয়ে ভরাই নগরের সাধু সদাগরের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে। নয় বছর অতিক্রান্ত হবার পরও যখন সদাগর কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারলেন না তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যাকেই তিনি সামনে দেখবেন তার সঙ্গেই কাঞ্চনমালার বিয়ে দেবেন। ঘটনাচক্রে অন্ধ শিশু পুত্রের সঙ্গে কাঞ্চনমালার বিয়ে হল। কাঞ্চন মালা তার অন্ধ শিশু স্বামীকে নিয়ে অজানা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। পথে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খেয়ে অন্ধ স্বামীর চোখের আলো ফিরে এলো। তারপর কাঞ্চনমালা এক কাঠুরিয়ার ঘরে স্বামীকে নিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর বসবাস করল। কিন্তু এরপর এক রাজা একদিন শিকারে এসে তার মাথায় রাজটীকা দেখে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এদিকে স্বামীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কাঞ্চনমালা সুমাই নগর রাজ্যে আসল এবং এখানের রাজকন্যা কুঞ্জমালার দাসী হিসাবে নিয়োজিত হল। এদিকে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস এই যে কুঞ্জমালার স্বামীই হচ্ছেন কাঞ্চনমালার হারিয়ে যাওয়া স্বামী। কুঞ্জমালা ধীরে ধীরে কাঞ্চনমালাকে চিনে ফেলল। তাই সে কাঞ্চনমালাকে বনবাসে পাঠানোর পরিকল্পনা করল। রাজ্যে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটায় এই পরিকল্পনা আরো সহজতর হল। কাঞ্চনমালাকে ডাকিনী রটনা করে বনবাসে পাঠানো হল। বনবাসে গিয়ে কাঞ্চনমালা আবার সেই সন্ন্যাসীকে স্মরণ করল। সন্ন্যাসী তাকে গাছের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। তারপর সেই বনের মধ্যেই সন্ন্যাসী এক সমৃদ্ধ নগর গড়ে তুললেন। সন্ন্যাসী ঘোষণা করলেন,—

"নয়া নগরে কন্যা সুবর্ণ পরতিমা।
যোগ্য দিনে এই কন্যা হবে স্বয়ম্বরা।।"

ঘটনাচক্রে আবারও কাঞ্চনমালার বিয়ে হল অন্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে। সন্ন্যাসী জানালেন যে কাঞ্চনমালা যদি তার স্বামীকে ছেড়ে যায় তবেই তার স্বামী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। স্বামীর মঙ্গলার্থে কাঞ্চনমালা এই শর্তে রাজী হয়ে যায় এবং সে মায়াকাঠি নিয়ে তার বাবার রাজ্যে চলে যায়। কাঞ্চনমালার মায়াকাঠির ভয়ে তার রাক্ষুসী বিমাতা পালিয়ে যায় এবং তার বাবারও মুক্তি ঘটে। সবশেষে বিপত্তি ঘটে কাঞ্চনমালার সতীত্বের প্রশ্নে। যেহেতু সে দীর্ঘ দিন বাইরে ছিল তাই স্থির হল তার সতীত্ব পরীক্ষা হবে। কিন্তু এতেই ঘটল বিপত্তি,—

"সাতরাজ্যের রাজার কাছে মেলানি মাগিয়া।
ধীরে ধীরে উঠে কন্যা মাকঙ্গসা ধরিয়া।।

কাঞ্চনমালা কন্যায় কেও না দেখিল আর।
বাতি নিবার্হলে যেমন ঘর অন্ধকার।।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-তে সংকলিত কাঞ্চনমালার কাহিনির সঙ্গে এই পালার কাহিনিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। রূপকথার একাধিক বৈশিষ্ট্য পালাটিকে অভিনবত্ব দান করেছে।

'পূর্ববঙ্গগীতিকা'-র ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত একটি পালা হচ্ছে 'কাফেন চোরা' বা 'আয়রা বিবির পালা'। পালাটির কাহিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা চায় --- লুধা গাজী নামের এক ওঝা গুরাধন বেপারীর নাতনী পরীকে অপহরণ করে গজালী গ্রামে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পরেই এক সন্তান প্রসব করে পরী মারা যায়। সেই সন্তানটির নাম ছিল মনসুর। কুসঙ্গে পড়ে মনসুর ডাকাতি করতে করতে একদিন আজিম বেপারির দ্বিতীয় স্ত্রী আয়রা বিবির সমস্ত অলঙ্কার ডাকাতি করে নিয়ে গেল। ডাকাতির পাশাপাশি আয়রা বিবিও তার স্মৃতির পাতা জুড়ে রইল। একদিন গভীর রাতে আয়রার ঘরে ঢুকে তার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে মনসুর তার শারীরিক তৃষ্ণা মেটাতে চাইল। এই ঘটনায় আয়রা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। এরপর মনসুর কবরস্থ আয়রার কফিন চুরি করতে চায়। মৃত আয়রার আত্মা তাকে পাঁচওয়াকে নামাজ পরার পরামর্শ দেয়। মনসুর এই পরামর্শ মেনে পাঁচবার নামাজ পড়া শুরু করে দেয়। এই অভ্যাস বশত সে দৌলতদারের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ভোর হয়ে গেলে ফজরের নামাজ পড়া শুরু করে দেয়। এভাবেই তার চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। তবে এই পরিবর্তন অনেকটাই স্ববিরোধিতার নামান্তর। কারণ নামাজ পড়া শুরু করলেও সে ডাকাতি ছাড়ে নি। তার চারিত্রিক পরিবর্তনের পেছনে আয়রার অনুরাগ না পরকালের ভয় ছিল সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় নি। আয়রার যৌবন প্রার্থনা করলেও, তার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে বলে উল্লেখিত করা হয়নি পালাটিতে। কিছুটা অলৌকিকত্ব থাকলেও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে পালাটির অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত 'মহুয়া' পালার কাব্যসৌন্দর্য নিবেদন করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৫ সমাজজীবন

গীতিকায় প্রকাশিত সমাজজীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে গীতিকাগুলি মূলত মধ্যযুগের রচনা। অনেক সমালোচক অনেক কথা বললেও অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তীর মত অনুসরণ করে বলা যায় যে, এই গীতিকাগুলি সাধারণত প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের রচনা। আর ভৌগোলিক দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে, যেহেতু বেশিরভাগ গীতিকাই পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তাই এতে প্রতিফলিত সমাজও বহুলাংশেই ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলেরই। তার গীতিকাগুলির আবেদনের দিকে তাকালে এগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। মৈমনসিংহ অঞ্চলকে মাথায় রেখে পালাগুলি রচিত হলেও এর আবেদন কিন্তু সামগ্রিক। গীতিকাগুলির নারী প্রাধান্যের কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই

মৈমনসিংহ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগত মাতৃতান্ত্রিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন যে বাংলাদেশে নারী প্রাধান্য চিরস্বীকৃত। সে যাই হোক গীতিকাগুলিতে নারী চরিত্র ও নারী সমাজ অনন্যরূপ ধরা দিয়েছে। পছন্দমত স্বামী নির্বাচন করা থেকে শুরু করে, তাকে পাবার জন্য সমস্ত পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রতিকূল পরিবেশে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ সবই গীতিকার নায়িকাদের অনন্যমাত্রা দান করেছে। সেই তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ। সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল এটা সহজেই বোঝা যায় 'বন্দনা' অংশ থেকে। এতে মুসলমান তথা হিন্দু উভয়ের পীর ও দেবতার উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, লোকাচার, উৎসব অনুষ্ঠানের কথাও ফুটে উঠেছে এতে। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনও স্পষ্টরূপ পেয়েছে বিভিন্ন পালার মাধ্যমে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। পূর্ববঙ্গগীতিকায় প্রতিফলিত সমাজজীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের লোকজীবনের অন্যতম বাণীবাহক বাংলার গাথা ও গীতিকা সাহিত্য। গ্রাম বাংলার আঁতুড় ঘর থেকে জন্ম লাভ করা এইসকল গাথা ও গীতিকা যেমন বাংলার নিবিড় মানবসম্পর্ককে বাস্তবায়িত করে, ঠিক তেমনি বাংলার লোক ঐতিহ্যকেও বজায় রাখে । মনে রাখতে হবে গাথা ও গীতিকা উভয়ই হল আখ্যানধর্মী সাহিত্যিক উপাদান যেখানে সাধারণের মুখে মুখে আপন জীবন শৈলীর চিত্র গীত হয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা।' এই গাথা ও গীতিকা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।



১২.৭ অধ্যায় পড়ে কী শিখলাম

- বাংলা লোকসাহিত্যের এক সমৃদ্ধ শাখা গীতিকার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হলাম।
- পূর্ববঙ্গ গীতিকার ও মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো সম্পর্কে অবহিত হলাম।
- মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার জনপ্রিয় কয়েকটি পালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ফুটে উঠেছে।



১২.৮ অতিরিক্ত পঠন

১। চক্রবর্তী বরুণকুমার; (১৪০০); গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য; কলকাতা : পুস্তক বিপনি।
২। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ (১৯৫৪) বাংলার লোকসাহিত্য; কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস।
৪। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (২০১৫); মৈমনসিংহ গীতিকা; কলকাতা : ভারত বুক স্টল।
৫। সেন, দীনেশচন্দ্র; মৈমনসিগীতিকা (১৯২৩), কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।



১২.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

১। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র অন্যতম জনপ্রিয় পালা হচ্ছে 'মহুয়া'। ...আলঙ্কারিক প্রয়োগের দিক থেকেও পালাটি অভিনব। 'মহুয়া' পালার কাহিনি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে তার বিশেষত্বের দিকটি তুলে ধরতে হবে। (অধ্যায় ১.৪ দ্রষ্টব্য)

২। গীতিকায় প্রতিফলিত সমাজজীবন ...স্পষ্টরূপ পেয়েছে, বিভিন্ন পালার মাধ্যমে। বিভিন্ন পালায় প্রতিফলিত সমাজের কথা বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক সমাজজীবনের দিকটি তুলে ধরতে হবে। (অধ্যায় ১.৫ দ্রষ্টব্য)



১২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র অন্তর্গত 'মহুয়া' পালার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন।

২। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র অন্তর্গত 'দেওয়ান মদিনা' পালার বিশেষত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-য় প্রতিফলিত সমাজজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। গীতিকার নারী চরিত্রের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১৩ : বাউল ও সুফি সাধনা

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৩.২ পরিচিতি
১৩.৩ বিশিষ্ট বাউল
    ১৩.৩.১ লালন শাহ
    ১৩.৩.২ দুদ্দু শাহ
    ১৩.৩.৩ পাগলা কানাই
    ১৩.৩.৪ পাঞ্জু শাহ
    ১৩.৩.৫ হাসন রাজা
১৩.৪ বিশিষ্ট সুফি সাধক
    ১৩.৪.১ শাহ মুহম্মদ সগীর
    ১৩.৪.২ দৌলত উজির বাহরাম খাঁ
    ১৩.৪.৩ সৈয়দ সুলতান
    ১৩.৪.৪ দৌলত কাজী
    ১৩.৪.৫ সৈয়দ আলাওল
১৩.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ
১৩.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৩.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৩.৮ অতিরিক্ত পঠন
১৩.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন-

- বাউল সাধনা
- বঙ্গদেশের বিশিষ্ট বাউল সাধক-পদকর্তা
- সুফি সাধনা
- বঙ্গদেশেরবিশিষ্ট সুফি সাধক-কবি

১৩.২ পরিচিতি

'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তি মনে করা হয় 'ব্যাকুল' এবং 'বাতুল' (অসংলগ্ন কথা বলেন এমন উদাসীন ব্যক্তি) শব্দের সমন্বয়ে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর মতো বাউল এবং

সুফিদের সাধনাও অনেক পুরনো। 'বাউল' শব্দটি পাওয়া যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ। বাউলরা মূলত এসেছেন মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর থেকে, এঁরা নিক্ষর হলেও গান বাঁধতেন মুখে মুখে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাউলেরা (পরিচিত 'নেড়া-নেড়ী' নামে) প্রধানত বৈষ্ণবীয় মতে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বাউলেরা (পরিচিত 'নেড়ার ফকির' বা 'বে-শরা ফকির' বা 'মারফতী ফকির' বা 'দরবেশ' বা 'আউলিয়া' নামে) সুফিমতে বিশ্বাস রাখতেন। লালন পন্থী বাউলরা তাঁদের সাধনা ও সঙ্গীতে বাঙলার সুফি মত ধরে রেখেছেন। সেখানে ফানাতত্ত্ব, মোকাম, মঞ্জিল, পাকপঞ্চাতন প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসেছে যা হিন্দু বাউলদের গানে পাওয়া যায় না। উভয় ধারাই একরকম অতীন্দ্রিয় গূঢ় ঐশ্বরিক প্রেমে বিশ্বাসী। বাউলদের নামকরণ নিয়ে নানা মত থাকলেও এঁরা সমাজ-বহির্ভূত আচার-ব্যবহার সম্পন্ন একটি সম্প্রদায়। জাতপাত, বাহ্যিক আচার পরিত্যাগ করে এঁরা নিজের মনের সঙ্গে লীলা করেন। তাঁদের গুরুবাদী সাধন-পদ্ধতি গোপন রাখেন। একমাত্র তাঁদের রচিত গানের মাধ্যমেই বাউলদের তত্ত্ব, ক্রিয়া, দর্শন প্রকাশ পায়।

'সুফ' শব্দের অর্থ 'পশম'। খ্রিস্টীয় ৮ম শতকের শেষদিকে একদল পারসিক প্রচলিত মুসলিম আচার-আড়ম্বর ত্যাগ করে ঈশ্বর-অন্বেষণে ভিন্ন পথ নিলে শুভ্র পশমের পোশাক পরা শুরু ক্রেন-এখান থেকেই তাঁদের নাম হয় সুফি। সুফিরা বিশ্বাস করেন, আল্লা এক এবং সব মানুষ সেই আল্লার অংশ। একমাত্র প্রেমময় ভক্তিই হল সেই আল্লাকে পাওয়ার পথ। সুফি কোনো নতুন ধর্ম নয়, ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকেই এক উদার সাধন-প্রণালী। তাই তাঁরা আনুষ্ঠানিক উপাসনার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা নবী হজরত মুহাম্মদের শিক্ষা অবলম্বন করে পির বা গুরু-কে গুরুত্ব দিয়ে গুরু-শিষ্য সম্পর্কে বিশ্বাসী। সুফিরা পারস্য থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এঁরা বারোটি ধারায় বিভক্ত এবং প্রতি ধারার একজন উল্লেখযোগ্য সাধক ছিলেন। সুফি সাধনা ও বাউল সাধনার মধ্যে মূল পার্থক্য, সুফিরা বিশ্বাস করেন প্রেমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করে আল্লাহ-র সঙ্গে নৈকট্য সাধনে 'ফানা' অবস্থাপ্রাপ্তির সাধনা এবং তার ঊর্ধ্বে 'বাকা' স্তর বা পরম সত্য অনুভব। এটি সম্পূর্ণত অনুভূতিমূলক সাধনা। অন্যদিকে বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া, যেখানে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে ক্রমে কাম থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আত্ম-উপলব্ধি তথা 'মনের মানুষ'-এর উপলব্ধিই লক্ষ্য।

বাউলরা একান্ত গুরুবাদী। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ এবং গুরুস্থানীয় তাঁরাই বাউল গানের রচয়িতা। আর সুফিবাদে পির বা গুরু দিব্যক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি শিষ্যকে পথ দেখান। বাউল সুফিরা গানে আল্লাহকে 'সাই' বলেছেন।

১৩.৩ বিশিষ্ট বাউল সাধক

বাংলা ও বাঙালির এক নিজস্ব সম্পদ বাউল সম্প্রদায়, যাঁদের মর্মবাণী গভীর সংবেদনশীলতা ও মানবতাবাদ। বঙ্গদেশে মুসলিম আগমনের সময় যেসব নিম্ন-সম্প্রদায় সহজিয়া বৌদ্ধ ছিলেন তাঁরা পূর্ব সাধনা বজায় রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয় সুফি মত (যার মাধ্যমে শৈবতন্ত্র, যোগসাধনাও ঢুকে পড়ে এঁদের মধ্যে)। পঞ্চদশ

শতকের গোড়া থেকে হিন্দু ও ইসলাম ভাবধারা সন্নিকটস্থ হওয়ায় এঁরা ভক্তি (প্রেমের পথে ঈশ্বরকে প্রাপ্তি) আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ষোড়শ শতকে চৈতন্যের বাণী হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্প্রীতি ঘটাতে সাহায্য করে। এইভাবে নানা সংমিশ্রণে বাউল সাধনা তৈরি হয় একই সঙ্গে গুরুবাদ ও মানবতাবাদ নিয়ে। এঁরা গুরু-ভিন্ন সাধনের কথা ভাবতেই পারেন না। লোকজীবনের সঙ্গে এঁদের উৎসগত যোগ বর্তমান। এঁরা জাতিভেদ, শাস্ত্র, পরজন্ম গ্রাহ্য করেন না। যোগসাধনায় নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্মাদি তাঁরা চারি চন্দ্রভেদ সাধনায় দেহস্থ ক্রিয়া সকলের মধ্যে অনুভব করেন। নারীর সম্মান এখানে পুরুষের সমান এবং পুরুষের নিকট নারী পূজ্য।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্বার্থান্বেষী শাসক, প্রচলিত ধর্ম, জাতপাত, বর্ণবৈষম্য দ্বারা কণ্টকিত সমাজের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে 'মনের মানুষ' (দেহের মধ্যেই সত্যের আশ্চর্য মূর্তি উপলব্ধি) তত্ত্বে এক নতুন মানবতাবাদের জন্ম দেন বাউলরা। তাঁরা এসেছিলেন দরিদ্র ভূমিহীন নিঃস্ব পরিবারগুলো থেকে। শাসকশ্রেণির বিরোধিতা করায় বাউলরা নিগৃহীতও হয়েছিলেন সমাজপতিদের হাতে। অভিজ্ঞ বাউলেরা ভাববাদ ও রহস্যের আড়ালে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। অনেকে পাগলামির ভানও করেন। নিজমত গুপ্ত রাখাই খাঁটি বাউলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন-বলরাম হাড়ী, সাহেবধনী, কর্তাভজা প্রভৃতি-তবে একটা অন্তর্নিহিত সমন্বয় ছিল প্রত্যেকের মধ্যে।

বাউলদের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে, চৈতন্য আউল চাঁদ নামে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধন-প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। লোকশ্রুতি, এই আউল চাঁদের পৌত্র দুলাল চাঁদ হলেন 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আর আউল চাঁদ এই সম্প্রদায়ের আদি গুরু।

লালন ফকিরের সাধনা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বাউল সাধনার সর্বোচ্চ বিকাশ উনিশ শতকে। বাউলরা দুই শ্রেণিভুক্ত-গৃহী ও বৈরাগী। বৈরাগীরা ভিক্ষাজীবী। সাম্প্রতিককালে এই দুই শ্রেণি আরও বহু উপশাখায় বিভক্ত-হযরতি, পাগলনাথী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেব ধনি,জিকির,ফকির,বাউল, আউল, কর্তাভজা, সাঁই, ন্যাড়া প্রভৃতি।

বিশিষ্ট বাউল সাধকগণের মধ্যে লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, জাদুবিন্দু, চণ্ডীগোঁসাই, হাউড়ে গোঁসাই, গোপাল গোঁসাই, গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, হাসন রাজা, গোঁসাই রসরাজ, গোবিন চাঁদ প্রমুখ জনপ্রিয়।

১৩.৩.১ লালন শাহ (আনুমানিক ১৭৭৪ খ্রি-১৮৯০ খ্রি)

বাউল-শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট সুফিসাধক লালন শাহ প্রায় রামমোহন রায়ের (১৭৭২খ্রি-১৮৩৩খ্রি) সমবয়সী। যতদূর জানা যায়, তাঁর জন্মস্থান যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রাম। আনুমানিক ১৭৯৮ সালে গ্রাম ছেড়ে নবদ্বীপে আসেন। এখানে থাকার সময়েই গান রচনা শুরু করেন। আনুমানিক সাত বছর এখানে বাস করার পরবর্তী দশ বছর তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করেন এবং আনুমানিক ১৮১৫ সালে কুষ্টিয়ায় এসে ছেঁউড়িয়ায় আখড়া তৈরি করে সেখানেই স্থায়িভাবে

সাধনা ও গান রচনায় নিরত থাকেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পরবর্তী বঙ্গদেশে আর্থিক সামাজিক ও ধর্মীয় নানামাত্রিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাঁর গানে কখনোই নিজ ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাত সম্পর্কে সরব হননি। নিশ্চুপ থেকেছেন। এইসব সংকীর্ণতা থেকে তিনি যে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন তাঁর নীরবতা সেকথাই প্রমাণ করে।

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয় জেতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।।

....
জগৎ জুড়ে জেতের কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন বলে জেতের ফাতা
ডুবাইছি সাধবাজারে।।

কিংবা এই গান,

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।।

তিনি মানুষের বাহ্যিক সামাজিক পরিচয় পেরিয়ে তাকে দেখেছেন অন্তর থেকে, মানবহিতৈষী রূপে। তাঁর গানে আছে যুক্তি ও প্রতিবাদ। সংস্কারমুক্ত হয়ে আলোর পথে যাত্রার নিশানা। তিনি 'মনের মানুষ' তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। যেহেতু তিনি একইসঙ্গে হতদরিদ্র পরিস্থিতির স্বীকার এবং সচেতন সামাজিক হিসেবে সমাজ প্রত্যক্ষ করেছেন তাই সেখান থেকে উত্তরণের পথও খুঁজেছেন।

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি-ঋষি যোগী-তপস্বী তারে খুঁজে বেড়াচ্ছে।।

....
আমার হল বিভ্রান্তি মন
বাইরে খুঁজি সাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে।।

অথবা,

এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে সাধন কর।
মানুষ পলাইবে দেহ ছেড়ে পড়ে রবে শুধু ঘর।।

অথবা সেই অতি জনপ্রিয় পদ,

মিলন হবে কতদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে।।

কিন্তু সেই পরম প্রেমিককে ক্ষণিকের জন্য পেতে না পেতেই যে তিনি অধরা তাও তিনি বুঝেছিলেন,

খাঁচার ভিতর অচীন পাখী কেমনে আসে যায়।

ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম পাখীর পায়।।

বেদ-বিরোধিতার আড়ালে আসলে সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রের বিরোধিতাই ছিল লক্ষ্য। আবার সংসার ও ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়ে যে সত্যকে পাওয়া যায় না সেকথাও বাউল দর্শনে এসেছে। যেসব সাধক সংসার পরিত্যাগ করে জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং অলৌকিক ঈশ্বর খুঁজে বেড়ান তাঁরা ভ্রান্ত বাউল।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীদের বিপরীতে লালন শাহ যে বিশ্বাসের কথা বলেছেন সেগুলি এরকম, তাঁরা কেবল জীবন্ত মানুষের পূজা করেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না করে ইহকালেই দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সাধনায় ব্রতী হন, দেহের মধ্যেই অমৃত অন্বেষণ করেন, নারী তাঁদের সাধন-সঙ্গিনী এবং প্রচলিত মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান করেন তাঁরা। আর একমাত্র গুরুবাদী পন্থাতেই যে এসব সম্ভব সে বিষয়েও লালন নিঃসন্দেহ ছিলেন,

আমি বলি তোরে মন গুরুর চরণ কর রে ভজন।
গুরুর চরণ পরমরতন কর রে সাধন।।
....
মহতের সঙ্গ ধর
কামের ঘরে কপাট মার
লালন ভনে সে রূপ দরশনে
পাবি রে পরশ রতন।।

সুস্থ দীর্ঘ জীবন এবং স্বাধীন পরিবেশ বাউলের কাছে স্বর্গ আর আনন্দ লাভই হল মোক্ষ। তাই পরলোকে লালন অবিশ্বাসী,

ভজ মানুষের চরণ দুটি, নিত্যবস্তু পাবে খাঁটি
মলে হবে সকল মাটি, ত্বরায় এভেদ লও জেনে।।
মলে পাব বেহেস্তখানা তা শুনে তো মন মানে না।
বাকির লোভে নগদ পাওনা
কে ছাড়ে এই ভুবনে।।

'গুরু' হলেন সেই মানুষ যিনি সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরত্ব লাভ করার পর অন্যদের শিষ্যত্ব প্রদান করে সিদ্ধির পথ দেখাতে পারবেন, তাই লালন বলেন,

গুরু রূপে ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত করে।

কেবল নাম দিয়ে বস্তুর গুণ পাওয়া যায় না। তাই লালন লেখেন,

না জেনে করণ-কারণ শুধু কথায় কি হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি, বীজ কেন রোপে।।
গুড় বললে কি মুখ মিষ্টি হয়
দ্বীপ না জ্বাললে আঁধার কি যায়
অমনি মতো আল্লাহ বলায়

আল্লাহ কি পাবে।।

তাঁরা যে অনুমানে বিশ্বাসী নন, অদেখায় আস্থা রাখেন না তাই লালন বলেন,

শুনতে নাই আন্দাজী কথা
বর্তমান জান হেথা।

লালনের জন্ম-মৃত্যুর সময়কাল গ্রহণযোগ্য হলে প্রায় সমগ্র উনিশ শতক তাঁর প্রতিভা প্রত্যক্ষ করেছিল। আর এই শতক তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গভূমির ঐতিহ্য বিরোধের নয়, তা সমন্বয়ের। সেই ধারায় লালন এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। বিশ্বমানবতার জয়গানই ছিল তাঁর আকাঙ্খা। তাই লিখেছেন,

'ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই।

লালনের গানে বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। তিনি হজরত মুহম্মদ, কৃষ্ণ, চৈতন্যকে আল্লাহ বা ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণের অবতার মনে করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অমোঘ সত্য,

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।।
....
ধর্ম কুল গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কেবা দেখায়ে দেবে।।

আবার বাঙালিকে আরবি শেখার আগে ভাল করে বাংলা ভাষা শেখার পরামর্শ দিয়েছেন লালন। তাঁদের ছিল মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা, একই সঙ্গে বাংলার লোকজীবন ও লোকসমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকেই লোকধর্মের এক উজ্জ্বল শাখা হয়ে ওঠে বাউল মতবাদ। লালন এই মতের প্রধান উদ্‌গাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

লালন শাহ-কে প্রকাশ্যে হাজির করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ববঙ্গে জমিদারী দেখভালের জন্য যাওয়ার পর তিনি পরিচিত হন বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দীর্ঘ কথা হত লালনের শিষ্যদের সঙ্গে। কবি মুগ্ধ হন তাঁদের কথা, গান ও গানের সুরে। লালনের প্রায় তিনশ গানের নকল করা দুখানি খাতা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। 'প্রবাসী'-র ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ সংখ্যায় লালনের ২০টি গান প্রকাশ করেন তিনি। বঙ্গভঙ্গের সময় বাউলের সুরেই তিনি গান বাঁধেন। নিজেকেও 'রবি বাউল' আখ্যাত করেছেন তিনি।

কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-য় (১০ম ভাগ, ১৭শ সংখ্যা, ভাদ্র/আগস্ট ১৮৭২ খ্রি) লেখা হচ্ছে, 'লালন শাহ নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম আবিষ্কার

করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। .... ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সে কথা বাহুল্য।'

অন্যত্র দেখা যাচ্ছে, লালন শাহ অপ্রতিরোধ্য এক গুরু, যাঁর বিপুল অনুসারী সমগ্র কুষ্টিয়া, নদীয়া, রাজশাহী, চব্বিশ পরগণা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে আছেন, ফলত এঁকে প্রতিহত করা একান্ত জরুরি। কিন্তু বাস্তব এই, যাঁরা লালনকে পরাস্ত করতে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাউল মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

১৩.৩.২ দুদ্দু শাহ (আনুমানিক ১৮৪১ খ্রি-১৯১১ খ্রি)

লালন শাহের অন্যতম শিষ্য হলেন দুদ্দু শাহ। তিনি লালন শাহের দর্শনের যথাযোগ্য বিশ্লেষক। গুরু লালন যেভাবে বিশ্বাসের কথা বলেছেন তা তিনিও মেনে নিয়েছেন। দুদ্দু তাঁর এক গানে বাউল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

'তাইত বাউল হইনু ভাই
এখন বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবীদাওয়া নাই।'

এমনকি বাউল আর বৈষ্ণব যে এক নয় সেকথাও এসেছে তাঁর গানে,

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই।
বাউলধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই।।
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ।
তুলসীমালা সব অনুষ্ঠানে সদাই।।

বাউল যে জাতপাতের ঊর্ধ্বে অখণ্ড মানবতাবাদে বিশ্বাসী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুশাসন, শ্রেণিবিভাজন থেকে মুক্ত একথা স্পষ্ট। তাই তিনি স্পষ্টতই লেখেন,

জাতিগোত্রে আমার বাসা ভবিষ্যতে হবে জাতির দুর্দশা।
লালন শাঁই দরবেশের ভাষা দুদ্দু যায় কয়ে।।

কারণ সুফির মতো বাউলেরও বড়ো কথা, মানুষ-ভজনা। মানুষের মধ্যেই যে ব্রহ্মলাভ সম্ভব সেকথা মেনেই তিনি বলেন,

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল।।
পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে চক্ষু না দেয় অনুমানে।
মানুষ ভজে বর্তমানে হয়রে কবুল।।
বেদ তুলসী মালা টেপা এসব তারা বলে ধোকা।
শয়তানে দিয়ে ধাপ্পা সব করে ভুল
মানুষে সকল মেলে দেখে শুনে বাউল বলে।
দীন দুদ্দু তাই বলে লালন শাঁইজীর কুল।।

অনুমানে তিনি যে বিশ্বাস করেন না সেকথা এখানে স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন। তাছাড়া

সর্বতো ভাবে দেহকে কেন্দ্র

করেই তাঁদের সাধনা। তাই বলেন,

জীবন তীর্থ-ধর্ম পথ এই কথা বাউলের মত
বস্তুবাদী বাউল আদত কেহ কেহ কয়।
না করে অনুমান ভজন করে না মুক্তির অন্বেষণ
জীবনই সত্য নিরূপণ দীন দুদ্দু জানায়।

গুরুর মতে বিশ্বাস রেখে দুদ্দু-ও নারী পূজায় আস্থা রেখেছেন। তাঁর কাছে 'আত্মসুখ ব্যভিচার', তাই নর-নারীর

স্বাধীন মিলনে নারীকে সেবা করা, সুখ দেওয়া বাউল জীবনের কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন,

মেয়ের চরণ নেরে মাথায় করে।
মেয়ে বিহনে এ ভুবনে গতি নাইরে।।
ত্যাজে নারী বনবাসী হলিরে মর্কট সন্ন্যাসী।
তাঁর চরণে গয়াকাশী দেখলি নেরে।।
বাঞ্ছাকল্পতরু ধনী সাধুশাস্তরে প্রমাণ শুনি
বৈদিক ধোঁকায় নাহি চিনি কভু তাঁরেরে।।
স্ত্রীরূপে সেই মা জননী রসিকমুখে হয় বাখানি
দুদ্দু রচে তার কাহিনি যুক্তকরে।।

তাঁদের 'মানুষ-তত্ত্ব' এসেছে অনেক গানেই। এরকমই একটি গান,

মানুষ রেখে পূজে ম'লি খড়ের বোন্দা।
এমন বেওকুফ কে দেখেছে এমন ধাঁধা।।
শিব কালী কৃষ্ণ নারায়ণ মানুষে সবাই হলে নিরূপণ।
জ্যান্ত ত্যাজে তবে কেন মরা ভজে মরিস দাদা।।
শক্তিসাধক পুণ্যবান যাঁরা দেবের খ্যাতি পেয়েছেন তাঁরা।
সে দেব এখন হয় না সৃজন বলে কোন গাধা।।
নররূপ হলো তাঁহারই রূপ তুলসীনোড়া পূজে কোন বেওকুফ।
দরবেশ লালন বলে দুদ্দু ভুলে খুঁজে বেড়ায় ধাঁধা।।

তিনিও পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখেন নি,

এবার হারালে জনম আর পাবে না।
যত বলো পুনর্জনম তাতে তো পরান ভরে না।।

বিশেষত সমাজে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর অসারতা বুঝে লিখেছেন,

কেন কূপমণ্ডূক হও রে ভাই,
হিসেব করে বোঝ সবাই,
খোদার সত্তার কোথাও খোঁজ নাই,

অধীন দুদ্দু ভেবে বলে।।

এঁরা বাস্তবে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন তাই গানে তুলে এনেছেন। ভাবের কল্পনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত।

১৩.৩.৩ পাগলা কানাই (আনুমানিক ১৮০৯ খ্রি- ১৮৮৯ খ্রি)

কবি পাগলা কানাই লালনের সমকালীন এক দরিদ্র কৃষক সন্তান। তাঁকে জীবন-ধারণের জন্য কৃষিকাজের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। তাঁর গানে যেমন তত্ত্বকথা এসেছে তেমনি এসেছে সহজ সুরও। তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন, জাতের পরিচয়ই আসল পরিচয় নয়,

কেউ বলে দুর্গা হরি
কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি
তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।

১৩.৩.৪ পাঞ্জু শাহ (আনুমানিক ১৮৫১ খ্রি- ১৯১৪ খ্রি)

পাঞ্জু শাহ ছিলেন সর্বজনীন মানবতাবাদের প্রবক্তা। সকল প্রকার হিংসা দ্বন্দ্ব কলহ মুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজের কথা ভাবতেন তিনি। তাই তিনি লিখে ফেলেন এমন একটি গান যেখানে সমাজের এই দলাদলি, বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

দলীল পড়িয়া ভাই
মৌলবী হলো তাই, হায় গো।
মনেতে ভেবেছে এই ভেস্তে যাবে চলে।
আবার, ইঞ্জিল পড়ে কেউ
গর্দ আদমী হল সেও, হায় গো।
মোর দিন ভাল বলে ডংকা মেরে চলে।
ভগবত পড়ে কেউ
পণ্ডিত হল সেও হায় গো।
বলে সেও স্বর্গে যাবে, হিন্দু লোকের দলে।
নাচানাচি করে তায় পড়লো গোলমালে।

বাউল শাস্ত্রপন্থী নন, তাঁরা গুরুপন্থী। গুরু-বিনে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছনোর গুহ্য সাধন পথ কে বলবেন?

বড় সাধ মনে ক'রে
ধরেছিনু মোরশেদেরে, সাঁই গো!
তাঁহার কদম মোর কপালে না হইল।।
পাঞ্জু বলে বিনয় ক'রে,
দয়া ক'রে দয়াল মোরে, সাঁই গো।

দেও গো চরণ-তরী, দিন বয়ে গেল।।

১৩.৩.৫ হাসন রাজা (আনুমানিক ১৮৫৪ খ্রি-১৯২২ খ্রি)

বাউল সম্প্রদায়ের অপর এক অন্যতম সাধক হলেন হাসন রাজা। গানের মধ্য দিয়ে তিনিও আত্মমুক্তির পথ সন্ধান করেছেন। মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর কঠিন মনোভাব অনেক গানেই প্রকাশ পেয়েছে।

হাসন রাজায় কয়, নামাজ ছাইড়া দিছি
বেস্তে যাইবার ভয়।
নামাজ রোজা করলে বেস্তে যাইবেরে নিশ্চয়।
পরের মন্দ ছাড়িয়াছি দুজখেরি ডরে।
বেস্ত-দুজখ এরাফে প্রভু নিওনা গো মোরে।।

তিনি বেহেস্ত-দোজখ কিছুই চান না। বেহেস্তে যাতে না যেতে হয় তাই তিনি নামাজ-রোজা এসবও ছেড়ে দিয়েছেন।

জীবনভর তিনি ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সুফির যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বঙ্গভূমিতে বিরাজ করছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন বাউল কবির গানে। হাসন রাজাও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর গানে বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে,

প্রেমের বাজারে বিকায় মাণিক ও সোনা।
যে জন চিনিয়া কিনে, লাভ হয় তিন দুনা রে।।
প্রেমিকেরা প্রেম-বাজারে করে আনা যানা।
অপ্রেমিক তো যায় না কেহই, চোখ থাকিতে কানা রে।।
প্রেম-বাজারে গিয়ে যারা বানাইয়াছে খানা।
মরণ তাদের দূর হইয়াছে, সর্বদাই জিনা রে।।
হাসন রাজা প্রেম-বাজারে গিয়ে হইল ফানা।
নাচন বাদন করিয়া গায় প্রেমের এই গানা রে।।

তাঁর একটি বহুল প্রচলিত গান,

আমি হৈতে আল্লা রসুল, আমি হৈতে কূল।
পাগলা হাসান রাজা বলে, তাতে নাই ভুল।।
....
আপনা চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাসান রাজা আপন চিনিয়ে এই গান গায়।।

১৩.৪ বিশিষ্ট সুফি সাধক

অনুমেয় মওলানা জালাল উদ্দীন মুহম্মদরুমী (১২০৭খ্রি-১২৭৩খ্রি)-র 'মসনবী' কাব্যগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে কবি সাদী (১১৮৪ খ্রি-১২৯১খ্রি), হাফিজ (১৩৮৯খ্রি), জামী (১৪১৪

খ্রি) প্রমুখের কাব্যের মাধ্যমে সুফি তত্ত্বের সঙ্গে বাঙালির সাহিত্যিক পরিচয় ঘটে। ইসলাম-ভূমি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময় বহু সুফি-দরবেশ বঙ্গদেশে আসেন। তাঁরা পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, বিশেষত চিশ্‌তি ও সোহরাবর্দী সম্প্রদায়। বঙ্গদেশে আগমনের পর এঁরা এখানকার যোগসাধনা, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়া চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেন, নিজেরাও প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে সুফি সাধকেরা এদেশীয় বিভিন্ন ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হন। তাই বাউল, বৈষ্ণব ও সুফিদের মধ্যে মত, পথ ও সাধনার প্রভেদ থাকলেও উদ্দেশ্য এক। একের বাণীতে অন্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বাউলদের একটা বড়ো অংশ ছিলেন সুফি। বাউলরা যাকে বলেন 'দেহের মাঝে আছে রে সোনার মানুষ' তাকেই সুফিরা বলেন 'আনাল হক'। এখানেও পির বা গুরু শিষ্যকে পথ দেখান। সুফিবাদের কল্যাণে ধর্মানুষ্ঠান কিছু শিথিল হয়, পরলোক সম্বন্ধীয় ভীতি দূর হয়, প্রেম ও ভক্তি বৃদ্ধি পায়, 'আশিক' (স্রষ্টা) ও 'মাশুক' (সৃষ্টি)-র মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক কল্পিত হয়। সুফিদের উদার মানবতাবোধ বাংলায় দ্রুত প্রসারিত হয়। ফলে কেবল মুসলিম নন, অনেক দলিত ও নিম্নবর্গের হিন্দুও সুফি আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ অবধি। ভারতে সমন্বয়ের প্রথম ধাপ প্রত্যক্ষ হয় কবীরের (১৩৯৮ খ্রি- ১৪৪৮খ্রি) রচনায়। বাংলায় প্রত্যক্ষ হয় চৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রি-১৫৩৩খ্রি)-এ। সেই সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি বাংলা সুফি কবিদের রচনা প্রণয়োপাখ্যান, এবং সুফি গজল-এ পাওয়া যায়। সামা, গজল, কাওয়ালি গেয়ে দিওয়ানা হওয়াই সুফিদের সাধন পথ। এছাড়া পীরমঙ্গল, গাজী বিজয়, সত্যপীরের পাঁচালি, রসুল বিজয় কাব্যে বাংলার ইসলাম ভিত্তিক সুফি মতের প্রতিফলন ঘটে।

১৩.৪.১ শাহ মুহম্মদ সগীর (আনুমানিক ১৪শ/১৫শ শতক)

ধর্মীয় কিংবা ইসলামী ঐতিহ্যের পাশাপাশি মানবাধিকার ও রোমান্টিক উপাদান সাহিত্যে আনেন মুসলিম কবিরা। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা কালেই বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ-র রাজত্বকালে শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯ খ্রি- ১৪০৯খ্রি) কোরান-অবলম্বনে রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রেমমূলক রম্য কাব্য। সুফি দর্শনের হাত ধরে বাংলার বর্ণ-বিধ্বস্ত নিপীড়িত মানুষের জীবনে স্নেহ মমতা সাম্যের আশীর্বাদ নেমে এসেছিল। এই কাব্যের উপাদান ইরাণ থেকে আহৃত হলেও বর্ণনায় এদেশের ভূগোল ও সমাজ বর্ণিত হয়েছে। এখানে কবি ধর্মীয় বিষয় বাংলায় লেখা পুণ্যের কাজ মনে করেছেন। যাতে মুসলিম ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। তাই রোমাণ্টিকতার পাশাপাশি সুফি প্রভাবও একাব্যে হাজির। মানুষ ঈশ্বরেরই অংশ, তাই পরম প্রিয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়াই সুফিদের চরম আকাঙ্খা। তাই কাব্যে নায়ক-নায়িকার মধ্যে দুর্নিবার প্রেম এসেছে যা পথের সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে প্রিয়ের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করে। এই রূপকের আড়ালেই ঈশ্বরপ্রেম কল্পিত হয়েছে।

১৩.৪.২ দৌলত উজির বাহরাম খাঁ (ষোড়শ শতক)

এই কবির লেখা একই রকম ঐশ্বরিক প্রেমের রূপক কাব্য 'লাইলী মজনু' বাংলার মানুষকে দীর্ঘদিন প্রেমের আস্বাদ দিয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে 'লাইলী মজনু'-র কাহিনি পরিচিত। ফারসি ভাষার কবি এবং সুফি সাধক জামী-র 'লাইলী মজনু' কাব্য থেকে এটি ভাবানুবাদ। এর মধ্যে থাকা মরমী আবেদন আধ্যাত্মিক মনের রসদ। এখানে লায়লীর জন্য মজনু প্রেমে 'দিওয়ানা'। লায়লীকে পেতে সে অশেষ সাধনা করে। শেষে না পেয়ে মজনুর দৈহিক প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। প্রেমের কামনা-বাসনা দূর হয়ে হৃদয় ঔদার্য ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়। সেই পবিত্র হৃদয়ে মজনু সর্বদাই লায়লীকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিই ভক্তের হৃদয়ে ঐশ্বরিক উপলব্ধি। সুফি মতে, সাধনার দ্বারা দেহ ও মন শুদ্ধ করে পরম সত্যকে অন্তরে পাওয়া যায়। তখনই ভক্তের উন্মাদনা রূপ পাবে পরম স্থৈর্যের, হৃদয়ে হবে মরমী উপলব্ধি।

১৩.৪.৩ সৈয়দ সুলতান (ষোড়শ শতক)

এই বাঙালি সুফি কবির (১৫৫০খ্রি-১৬৪৮খ্রি) জন্ম চট্টগ্রামের চক্রশালায়। সুফি সাধনায় তাঁর গুরু ছিলেন সৈয়দ হাসান। এবং কবি মুহম্মদ খান আবার ছিলেন সুলতানের শিষ্য। কবি সুলতানের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'নবীবংশ', 'জ্ঞানপ্রদীপ' ইত্যাদি। 'নবীবংশ'-এ নবীরসুলের জীবনী এবং ইসলামের মর্মকথা আছে। বাংলা ভাষায় ধর্মকথা রচনা করায় সামাজিক বাধার মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে বাংলা ভাষী সবাই কাব্য পড়ে বুঝতে পারেন। তাই লেখেন, 'আলিমে কিতাব পড়ি বাখানে যে কালে/ হিন্দুয়ানী করি যদি না বাখানি বোলে/ বঙ্গদেশী সকলরে কিরূপে বুঝাইব?'

অপর গ্রন্থটিতে আছে সুফিতত্ত্ব ও সুফির আচরণীয় বিষয়। একে তিনি অভিহিত করেন 'দিব্যচক্ষু' বলে, 'এ দর্পণ দর্শিলে খণ্ডিব যত ধন্ধ/নিরক্ষিলে দর্পণ জানিবা ভালোমন্দ'। এই গ্রন্থটির সারমর্ম হিসেবে তিনি রচনা করেন 'জ্ঞানচৌতিশা' কাব্য।

১৩.৪.৪ দৌলত কাজী (সপ্তদশ শতক)

আরাকান-রাজ থিরি-থু-ধম্মা (শ্রী সুধর্ম্মা, রাজত্বকাল ১৬২২খ্রি-১৬৩৮খ্রি)-র সেনাপতি আশরফ খাঁ-র নির্দেশে হিন্দি কবি সাধন রচিত 'মৈনাসত' অবলম্বনে 'সতী ময়নাবতী' বা 'লোর-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করলেও সম্পূর্ণ করার পূর্বেই লোকান্তরিত হন। তিনিও পূর্বোল্লিখিত রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। ১৬৫৯ খ্রি-এ এই কাব্য সম্পূর্ণ করেন সর্বাধিক পরিচিত মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল। দৌলত কাজী কিছু বৈষ্ণব পদও রচনা করেন।

১৩.৪.৫ সৈয়দ আলাওল (সপ্তদশ শতক)

ভাগীরথী তীরস্থ ফতেহাবাদ পরগণার জালালপুর গ্রামে মুসলিম কবি আলাওল (১৬০৭খ্রি-১৬৮০খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে তিনি আরাকানে উপনীত হন এবং একসময়

তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রকাশিত হয়। রাজা থদো মিন্তার (রাজত্বকাল ১৬৪৫খ্রি-১৬৫২খ্রি)-এর মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে হিন্দি ভাষার কবি, চিশ্‌তিয়া নিজামিয়া সম্প্রদায়ের শিষ্য মালিক মুহম্মদ জায়সীর ফারসি ভাষায় রচিত আধ্যাত্মিক রূপককাব্য 'পদুমাবৎ'-এর বঙ্গানুবাদ করেন 'পদ্মাবতী' নামে। এখানে প্রেমের যে স্বরূপ তা সুফি ভক্ত ও ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্ক। 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জমাল' কাব্য রচনা শুরু করলেও মাগন ঠাকুরের মৃত্যু, চক্রান্তবশে কারারুদ্ধ হওয়া, তারপর মুক্ত হয়ে চরম দুর্দশায় পড়ে রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মাসুদ শাহ-এর কাছে সুফি কাদেরী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন আলাওল। এরপর 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জমাল' কাব্য শেষ করেন।

এছাড়াও সুফি সাধক-কবি হলেন, 'পঁরজামাল' কাব্যের রচয়িতা হাজী মুহম্মদ (১৫৫০খ্রি-১৬২০খ্রি)।

সত্যপীরের পাঁচালি —ফয়যুল্লাহ, আরিফ প্রমুখ কবির পাশে বহু হিন্দু কবিও এই পাঁচালি রচনা করেছেন।

সুফি গজল — বৈষ্ণব কাব্যের প্রধান চরিত্র এবং পরিবেশের আড়ালে সুফি কবিরা তাঁদের সুফিতত্ত্ব প্রকাশ করেন এই গজলগুলিতে। বহু পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। এখানে চাঁদগাজীর পদ উল্লেখ করা হল-

বাঁশী বাজান জাননা।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এ-পার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি।।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাউল সাধনা-পদ্ধতি কেমন?
২। বাউলদের 'মনের মানুষ' তত্ত্ব কী?
৩। কয়েকজন বিশিষ্ট বাউলের নাম লিখুন।
৪। সুফি তত্ত্বে 'ফানা' ও 'বাকা' কী?
৫। কয়েকজন বিখ্যাত সুফি কবির নাম লিখুন।

১৩.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

বাউল এবং সুফি সাধনার মধ্যে প্রক্রিয়াগত ফারাক থাকলেও উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এক, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মিলন। সুফিরা ঈশ্বর এবং ভক্তের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করেন।



বাউল নিজের মধ্যেই চালিয়ে যান মনের মানুষের খোঁজ।

১৩.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বর্তমান অধ্যায় থেকে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট বাউলদের রচিত গানের মধ্য দিয়ে তাঁদের সাধনা,

বিশ্বাস ও ব্যক্তি পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

- বাউলদের সাধনা দেহভিত্তিক যোগক্রিয়া-নির্ভর নর-নারীর যুগলবন্দি সাধনা। নারী এখানে পূজ্য।
- এঁরা প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার পরিত্যাগ করেছিলেন।
- এঁদের কাঙ্খিত লক্ষ্য 'মনের মানুষ'-এর সঙ্গে মিলন।
- গুরু-নির্ভর এই সাধনা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গোপন থাকে।
- অভিজ্ঞ গুরুরাই গান রচনা করেন।
- এঁদের কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ নেই। একমাত্র গানগুলিই এঁদের চেনার উপায়।
- বঙ্গদেশে সুফি সাধনার প্রবেশ এবং এদেশে ধর্ম ও সমাজে তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে।
- বাংলার বিভিন্ন সুফি কবিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১৩.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

ক) নর-নারীর যুগনদ্ধ যোগক্রিয়া সম্বলিত ইন্দ্রিয়-নির্ভর সাধনা।

খ) বাউলের মনের মধ্যে স্থিত ঐশ্বরীয় সত্তা বা বিশুদ্ধ 'আত্ম'।

গ) লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, হাসন রাজা প্রমুখ।

ঘ) প্রেমভক্তি ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে নৈকট্য লাভের অবস্থা 'ফানা'। তার পরবর্তী উচ্চ স্তরে পৌঁছে পরম সত্য লাভ হল 'বাকা'।

ঙ) শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রমুখ।

১৩.৮ অতিরিক্ত পঠন

- চক্রবর্তী, সুধীর; (২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ) বাংলার বাউল ফকির; কলকাতা : পুস্তক বিপনি
- ঝা, শক্তিনাথ; ২০১০ বস্তুবাদী বাউল; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- দত্ত, অক্ষয় কুমার; ১৩৯৭ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়; করুনা প্রকাশনী
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; (1946) Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature, Calcutta : University of Calcutta
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ১৩৫০ আত্মবোধ; শান্তিনিকেতন-১৩; রবীন্দ্র-রচনাবলী (খণ্ড ১৬); বিশ্বভারতী
- ——; ১৩৫২ মানুষের ধর্ম; শান্তিনিকেতন-১৩; রবীন্দ্র-রচনাবলী (খণ্ড ১৬); বিশ্বভারতী
- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ; ১৩৬৪ বাংলার বাউল ও বাউল গান; কলকাতা : ওরিয়েণ্ট বুক

কোম্পানি
- ভট্টাচার্য, সলিল; ২০২৩ ভারতের সাধনা ও সূফী মতবাদ; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং কোম্পানি
- ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ; ২০১৫ বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী
- শরীফ, আহমদ; ১৯৬৯ বাংলার সুফিসাহিত্য; ঢাকা : সময় প্রকাশন
- সেন, অঞ্জন ও পাল, সন্দীপ (সম্পাদিত); ২০২২ সুফিবিশ্ব; ঢাকা : ভারতীয় সাহিত্য প্রকাশ
- হক, মুহম্মদ এনামুল; ২০১৯ বঙ্গে সূফী প্রভাব; ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স



১৩.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাউল সাধনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।
২। বাউল সাধনার উদ্দেশ্য কী ছিল?
৩। বিখ্যাত বাউল লালন শাহের গানের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যখ্যা করুন।
৪। লালন শাহের গানে কীভাবে সুফি মতের প্রকাশ ঘটেছে উদাহরণসহ মন্তব্য করুন।
৫। লালন শাহের শিষ্য হিসেবে দুদ্দু শাহের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৬। বঙ্গদেশে সুফি সাধনার স্বরূপ বিবৃত করুন।
৭। বাউল এবং সুফি সাধনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৮। সুফি কবি হিসেবে প্রণয়কাব্য রচয়িতাদের সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৯। সুফি কবি সৈয়দ সুলতানের অবদান আলোচনা করুন।

.....

অধ্যায় ১৪ : অপরাপর সাহিত্য প্রয়াস

বিন্যাস-ক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪.২ পরিচয়

১৪.৩ যুগসন্ধির কাল ও কবিত্ব লক্ষণ

১৪.৪ কবিওয়ালাদের উদ্ভব

১৪.৪.১ হরু ঠাকুর

১৪.৪.২ ভোলাময়রা

১৪.৪.৩ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

১৪.৫ আখড়াই ও হাফ-আখড়াই

১৪.৬ টপ্পা

১৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

১৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

১৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- যুগসন্ধির কাল এবং সেই সময়ের কবিদের লক্ষণ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- কবিওয়ালাদের উদ্ভবের ধারণা পাবেন।
- হরুঠাকুর, ভোলাময়রা এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির প্রতিভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আখড়াই, হাফ-আখড়াই এবং টপ্পা গানের ধারণা পাবেন।

১৪.২ পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, একদিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের ক্রম উত্থান এবং নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গলের অতি প্রগতিশীলতা। সেইসময়ে মধ্যযুগের দেবতাবাদ ও ভক্তিরসের বেড়া টপকে সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে নিয়ে শাণিত ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এই যুগসন্ধির কালে কবিদের কবিত্ব লক্ষণ ছিল অনেকটাই বাস্তব সমাজ ও সময়কেন্দ্রিক।

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম বিভাগ 'কবিগান'। এই সময়ে বিশিষ্ট কবিওয়ালাদের উদ্ভবের কারণও ছিল যুক্তিসম্পন্ন। তাঁদের কবিপ্রতিভা এবং এই কবিগানের ধারার অগ্রগতির ইতিহাসও লক্ষণীয়। শুধু তাই নয় এরপর আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ্পাগানের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং হারিয়ে যাওয়ার ইসিহাসও আমাদের অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৪.৩ যুগসন্ধির কাল ও কবিত্ব লক্ষণ

যুগসন্ধিক্ষণ অর্থাৎ দুই যুগের মিলনক্ষেত্র। যুগসন্ধিক্ষণ বলতে এমন একটি সময়কে বোঝায় যেখানে, একটি যুগ শেষ হয়ে অন্য একটি যুগ শুরু হয় বা দুটি যুগ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ১৭৬১ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে যুগসন্ধিক্ষণের কাল বলা হয়। কেননা এই সময়ে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। একদিকে ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮৬১ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ছাড়া কোন সাহিত্যিক প্রতিভা লক্ষ করা যায় না। এই দুই কবির লেখনীতে একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়, তেমনি অন্যদিকে নতুন সাহিত্যিক চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, যা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন—

'বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অনন্য সাধারণ, পতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি পঁতনের জন্য খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। ..... কাব্য সাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং পতন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা।'

এই সময়ের কবিদের কবিত্ব লক্ষণ অনেকটাই বাস্তবধর্মীতায় পরিপূর্ণ ছিল। একদিকে মধ্যযুগের শেষ, অন্যদিকে আধুনিক যুগের শুরু অর্থাৎ যুগসন্ধিক্ষণে কবিদের লেখায় বরাবর বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে—

- সমাজচেতনা।
- যুক্তিপ্রধান মনোভাব।
- ইতিহাসচেতনা।
- কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধাচারণ।
- উনিশ শতকের নবজাগ্রত যুগচেতনাকে সমর্থন।
- অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- স্বাদেশিকতা।
- রচনাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা তথা স্বাধীনধর্মীতা বজায় রাখার চেষ্টা।

১৪.৪ কবিওয়ালাদের উদ্ভব

বাংলা লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা হল 'কবিগান'। এই ধারায় লোককবিরা মুখে মুখে পদ রচনা করে তাৎক্ষণিক ভাবে সুর দিয়ে গান পরিবেশ করেন। কবিগান পরিবেশনকারীদের বলা হয় কবিয়াল। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, শ্যামাসঙ্গীত, সারিগান, গাজির গান, টপ্পা ইত্যাদি সংগীত ছাড়াও অন্য এক ধরণের যে গান অষ্টাদশ শতকের বাংলা জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, তা হল 'কবিগান'। যাঁরা এই কবিগান গাইতেন, তাঁদের বলা হত 'কবিওয়ালা'।

কবিগানের তিনটি যুগ গঠনযুগ, ঐশ্বর্যযুগ এবং অন্ত্যযুগ। সজনীকান্ত দাশ তাঁর 'বাংলার কবিগান' গ্রন্থে বলেছেন — 'বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন সাংগীতিক ধারার মিলনে কবিগানের জন্ম। এই ধারাগুলির নাম বহু বিচিত্র- তরজা, পাঁচালি, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপকীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কাগীতি ইত্যাদি।' ড° সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতেও কবিগানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কবিওয়ালাদের প্রকৃত বিকাশকাল হল ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যবর্তী সময়।'

অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে কেবলমাত্র বীরভূম জেলাতেই শ তিনেক খ্যাতনামা কবিওয়ালা বিদ্যমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবিওয়ালা ছিলেন গোঁজলা গুঁই। তাঁর শিষ্য রঘুনাথ দাস (দাঁড়া-কবির প্রবর্তক), লালু-নন্দলাল, কেষ্টা মুচি, রামজী থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দী এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবিওয়ালাদের উদ্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বিখ্যাত কবিওয়ালারা ছিলেন— হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, যজ্ঞেশ্বরী দাসী, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ভবানী বণিক। এছাড়াও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কবিওয়ালার মধ্যে অন্যতম হলেন— বলহরি দে, শম্ভুনাথ মণ্ডল, তারকচন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র শীল, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিনয়কৃষ্ণ অধিকারী, স্বরূপেন্দু সরকার, গৌতম মজুমদার, সাতু রায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মুকুন্দ দাস প্রমুখ।

১৪.৪.১ হরু ঠাকুর

কলকাতার শিমুলিয়াতে বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন হরু ঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী/দীর্ঘাড়ি। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি গান রচনার পাশাপাশি সুর দিতেন। প্রথম দিকে গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য রঘুনাথ দাস কবিওয়ালার দলে 'জিল' দিলেও পরবর্তীতে শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন হরু ঠাকুর। সৌখিন গায়ক হিসেবে প্রথমদিকে গান গেয়ে পারিশ্রমিক না নিলেও পরে তিনি 'সখের দল'-কে 'পেশাদারি' দলে রূপান্তরিত করেন এবং বাংলার বিভিন্ন ভূস্বামী ও বিত্তবানদের ভবনে কবিগান করে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি খ্যাতি লাভ করেন।

কথিত আছে, রাজসভায় 'বড়শি গিলেছে যেন চাঁদে' চরণটি পূরণ করার জন্য রাজা

সভাকবিদের আদেশ দেন। সভায় উপস্থিত সভাকবিরা চরণটি সম্পূর্ণ করতে না পারলে হরু ঠাকুরকে ডাকা হয়। এরপর হরু ঠাকুর সভায় তৎক্ষণাৎ সেই চরণটি সম্পূর্ণ করেন—

'একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড়ো কাঁদে।
রানি অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বড়শি গিলেছে যেন চাঁদে।।'

রাজা খুশি হয়ে তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন এবং সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে রাজবাড়িতে বা অন্যান্য অভিজাত ধনীগৃহে কবির লড়াই হলেই তাঁকে বিচারক হিসেবে থাকতে হত।

গুরু-শিষ্যের কবিগানের লড়াই বেশিরভাগই অনুষ্ঠিত হত মহারাজা নবকৃষ্ণের ভবনে। বহু প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা তথা ভবানী বণিক, নীল ঠাকুর, ভোলা ময়রা ও অন্যান্যরা এই হরু ঠাকুরের দলেই ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, হরু ঠাকুর 'ভবানী বিষয়ক', 'সখী সংবাদ', 'বিরহ', 'খেউড়', 'লহর' প্রভৃতি সকল প্রকার রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে তাঁর সর্বাপেক্ষা খ্যাতি ছিল 'খেউড়' ও 'লহর' গানের বিষয়ে। তাঁর নামের ভবানী বিষয়ক গানে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় লক্ষ করা যায়, যার ভাষা সরল এবং আবেগ অকৃত্রিম—

'পথের সম্বল ছিল যাদের তারা, ওগো তারা মা,
তারা পার হলো সব অনায়াসে।'

সখী সংবাদ ও বিরহের গানে হরু ঠাকুরের গগনস্পর্শী প্রশংসার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে মূলত ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের আর্তনাদ পরিলক্ষিত—

'অকূল পাথারেতে
ডোবে নৌকা, রাখো ওহে রাধানাথ।'

রঘুনাথ দাস হরু ঠাকুরের গানগুলো সংশোধন করে দিতেন, তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হরু ঠাকুর গানের ভণিতায় 'রঘু', 'দাস রঘুনাথ' নাম ব্যবহার করতেন। দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'বাঙালির গান' গ্রন্থে হরু ঠাকুরের ৪২টি কবিগানের নমুনা রয়েছে। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় কবিগানগুলো হল —

- 'হরিনাম লইতে অলসো করো না রসনা।'
- 'শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়ে।'
- 'সখিরে রসালো আলসে।'
- 'মানিনী শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে।'

সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গতই বলেছেন-

'হরু ঠাকুর পিতামহ ভীষ্মের মতো ভক্তশিষ্য ও বিদ্রোহী শিষ্য উভয়ের দ্বারা মান্য হয়েছিলেন, সমাজে ও কবিওয়ালাদের জীবনকে অনেকটা সংযত আদর্শে তুলে ধরেছিলেন।'

কথিত আছে, মহারাজা নবকৃষ্ণের ভবনে একবার কবিগানের সময় হরু ঠাকুরের গানে খুশি হয়ে রাজা একটি শাল উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু হরু ঠাকুর সেই শালটি তাঁর ঢুলীর মাথায় জড়িয়ে দেন, যার ফলে রাজা অপমানিত বোধ করেছিলেন। জানা যায়, পৃষ্ঠপোষক রাজা

নবকৃষ্ণের মৃত্যু হলে হরু ঠাকুর শোকে ভেঙে পড়েন এবং সঙ্গীত জগত থেকে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নেন।

১৪.৪.২ ভোলা ময়রা

প্রখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রার প্রকৃত নাম ছিল ভোলা মোদক। হুগলী জেলার গুপ্তি পাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। কলকাতার বাগবাজারে তাঁর পিতা কৃপারামের মিষ্টির দোকান ছিল। সামান্য শিক্ষা লাভ করে পিতার দোকানে কাজ করেন বলেই তিনি এই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। একটি গানের মাধ্যমেই তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন—

'আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা
বাগবাজারে রই।'

শৈশবে সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি ভাষা শিখলেও কবিগানের টানে তিনি বাংলাতে গান লেখা শুরু করেন। হরু ঠাকুরের কাছে তিনি গানের শিক্ষা নেন। গুরুর প্রেরণায় 'বাঁধুটি' কবিগান দিয়ে তাঁর কবিগানের সূচনা হয়। ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ রসবোধের কারণেই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনেক গল্পকাহিনি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

ভোলা ময়রা খুব দ্রুত মুখে মুখে কবিতা বানাতে পারতেন। উপস্থিত বুদ্ধি, চটুল আক্রমণাত্মক বাগ্‌ভঙ্গি, লঘু-গুরু বিষয়বস্তু দ্বারা সমাজের ত্রুটির কথা শ্লেষপূর্ণ ভঙ্গিতে গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করে শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন তিনি। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ও হোসেন খাঁকে প্রপক্ষ করে অশ্লীল, অভব্য ইঙ্গিতপূর্ণ গান গেয়ে তিনি প্রতিপক্ষের বাক্য হরে নিতেন। প্রকৃত পক্ষে লড়াইয়ে তাঁর চটকদারী জবাবের জন্যই এতটা খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি।

তাঁর সমসাময়িক কবিয়াল রাম বসুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মুক্ত ধারার কবিগানে চলে আসেন। জানা যায় সেই সূত্রেই তিনি বহুবার রাম বসুর সঙ্গে কবির লড়াইয়ে নামেন। এছাড়া তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাম বসু, বলাই সরকার, যজ্ঞেশ্বর দাস, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হোসেন খাঁ প্রমুখ। ভোলা ময়রার নিজের রচিত গান খুব বেশি পাওয়া যায় না। কথিত আছে, তাঁর জন্য অধিকাংশ গান রচনা করে দিতেন হরু ঠাকুর। এমনকি কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, সাতু রায় সহ আরও কয়েকজন বাঁধনদার তাঁর দলের জন্য গান লিখে দিতেন। দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'বাঙালির গান' গ্রন্থে ভোলা ময়রার কবিগানের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ভোলা ময়রার একটি ছড়াগানে বাংলার কোন জেলার কি উত্তম, তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়—

'ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো কই।
ঢাকার ভালো পাতা ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভালো দই।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহের ভালো আম।
উলোর ভালো বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভালো, রাজশাহীর জামাই।

নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই।
দিনাজপুরের কায়েত ভালো, হাবড়ার ভালো শুঁড়ি।
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্ধমানের চাষী ভালো, চব্বিশ পরগণার গোপ।
গুপ্তিপাঞ্জার মেয়ে ভালো, শীঘ্র বংশলোপ।
হুগলির ভালো কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভালো ঘোল।
ঢাকের বাদ্য থামলেই ভালো, হরিহরি বোল।'

জেনে রাখা প্রয়োজন, ভোলা ময়রার জীবন অবলম্বনে পীযুষ গাঙ্গুলির পরিচালনায় ১৯৭৭ সালে 'ভোলা ময়রা' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। উল্লেখ্য, রসগোল্লার উদ্ভাবক নবীনচন্দ্র দাস ছিলেন এই ভোলা ময়রার জামাতা। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভোলা ময়রাকে সমকালের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করে বলেছেন—

'বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।'

১৪.৪.৩ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

পর্তুগীজ নাগরিক অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রথম ইউরোপীয় বাংলা ভাষার কবিয়াল। শোনা যায়, তাঁর পিতা পর্তুগীজ এবং মা বাঙালি ছিলেন। তিনি উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ফরাসডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। তিনি জাতিতে পর্তুগীজ খ্রিস্টান। তাঁর পুরো নাম হ্যান্সম্যান অ্যান্টনি (Hensman Anthony), মূলত কবিগানের জন্য একসময় তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

প্রথমদিকে গোরক্ষনাথ গানের বাঁধনদার হলেও পরবর্তীতে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নিজেই গান বাঁধতে পারদর্শী হন। তাঁর নামে যে কয়েকটি গান পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় তিনি হিন্দু পৌরাণিক তথ্য হিন্দুর মতোই রপ্ত করেছিলেন। তাঁর গানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধে মানুষ এবং মানবতার কথা পাওয়া যায়। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গানগুলি-

- 'সাধন ভজন জানিনে মা, জেতে তো ফিরিংগি।'
- 'জয় যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।' (আগমনী পর্যায়ের গান)
- 'বেঁধে দে মা পীতধড়া, গলায় দে মা গুঞ্জায়ছড়া
  মস্তকে দাও মোহনচূড়া, বাঁশী দাও করে।' (গোষ্ঠলীলার পদ)

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি 'সৌদামিনি' নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ নারীকে সতীদাহ হওয়ার থেকে রক্ষা করেন এবং বিয়ে করেন। শোনা যায়, তিনি কলকাতার দক্ষিণে মা কালিকার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যা 'ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি' নামে পরিচিত।

ভোলা ময়রা, রাম বসু, ঠাকুর সিংহ প্রমুখ যুদ্ধজয়ী কৌশলী কবিওয়ালাদেরও অ্যান্টনির

আক্রমণের মুখে বহুবার হার মানতে হয়েছে। তাঁর গানে উদার প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। রাম বসুর সঙ্গে কবিগানের লড়াইয়ে সেই চিত্র লক্ষ করা যায়—

রাম বসু — 'বল হে অ্যান্টনি, আমি একটি কথা জানতে চাই।
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।'

অ্যান্টনি — 'এই বাংলার বেশে আনন্দেতে আছি।
হয়ে ঠাক্‌রে সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।'

রাম বসু — 'সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রি সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুনকালি।'

অ্যান্টনি— 'খ্রীস্টে আর কৃস্টে কিন্তু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ-ও কথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে।
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পাই।'

১৯৬৭ সালে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। উত্তম কুমার অভিনীত এই সিনেমায় কবিয়াল ভোলা ময়রার সঙ্গে অ্যান্টনির কবিগানের লড়াইও দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সালে তাঁর জীবন এবং বর্তমান প্রজন্মে তাঁর পুনর্জন্ম মিলিয়ে 'জাতিস্মর' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

১৪.৫ আখড়াই ও হাফ-আখড়াই

আখড়াই

আঠার শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত একটি বিশেষ রীতির জনপ্রিয় গান হল আখড়াই গান। রামনিধি গুপ্ত ও কুলুইচন্দ্র সেন ছিলেন এই নতুন রীতির গানের প্রবর্তক। সেইসঙ্গে রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন এই রীতির পৃষ্ঠপোষক।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা গানের যে ধারাগুলো বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হল আখড়াই গান। জনশ্রুতি রয়েছে—

- সেন রাজার আমলে নৃত্যগীত সহযোগে যে শাস্ত্রীয় গীতের প্রচলন ছিল, তারই একটি শাখা 'আখড়াই' নামে পরিচিত।
- 'গীতগোবিন্দম্'-এ উল্লিখিত 'প্রবন্ধম্' শৈলী নানা বিবর্তনে নাটগীতি থেকে আখড়াই গান এর রূপ নিয়েছে।
- আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' থেকেও জানা যায়, গায়ক, বাদক এবং নর্তকদের যৌথ সম্প্রদায়কে 'আখড়া' বলা হত। শাস্ত্রীয় তাল সমন্বিত এই আখড়াই সঙ্গীত কালক্রমে স্বভাব কবিদের জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে 'কবির লড়াই' তথা কবিগানের জন্ম দিয়েছে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১২৬০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় জানিয়েছেন—

'প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের ভদ্র সন্তানেরা আখড়াই গানের সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ আখড়াই প্রায় তিনশত বৎসরের বেশি পুরনো সঙ্গীত ধারা।'

অষ্টাদশ শতকে এই আখড়াই গানের দুটি শাখা ছিল- 'খেউর' ও 'প্রভাতী'। 'খেউর' ছিল অত্যন্ত অশ্লীল, প্রভাতী ও সুশ্রাব্য ছিল না। অনেকেই মনে করেন, আখড়াই গান গৌড়বঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়ে, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে অবস্থান করার পর অষ্টম শতকে চুঁচুড়া হয়ে কলকাতায় প্রবেশ করে। এরপর আখড়াই গানকে অনেকটা শালীন করে তোলা হয় এবং 'ভবানী' বিষয়ক নতুন অংশ এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

আখড়াই গানের প্রতিযোগিতা হলেও এখানে কবিগানের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চুঁচুড়া অঞ্চলে ঢোল-কাঁসি-হাড়ি-কলসি মিলিয়ে মোট ২২ রকমের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হত বলে সেই অঞ্চলে দলের নাম হয়েছিল 'বাইশেরা'।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) এবং তাঁর আত্মীয় কুলুই চন্দ্র সেন আখড়াই গানের সংশোধন করেন। এমনকি নিধুবাবু ভদ্র আখড়াই গান শেখানোর জন্য কলকাতায় একটি আখড়াই শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। তাঁর দেখাদেখি কলকাতার বেশ কিছু শৌখিন মানুষ আখড়াই শিক্ষাকেন্দ্র খুললেও মূলত নিধুবাবুর প্রভাবে টপ্পার গায়ন রীতি এবং বেহালা, সেতার, তানপুরা, বীণা, বাঁশি, জলতরঙ্গ, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে বিভিন্ন রাগ রাগিণীতে বাজানো সাজের বাজনা বা অর্কেস্ট্রা এই গানে স্থান করে নেয়।

আখড়াই এর 'ভবানী' বিষয়ক অংশে পার্বতী সম্পর্কিত গান, 'খেউড়ে' লৌকিক প্রেমের তীব্র মিলন আকাঙ্খা এবং 'প্রভাতীতে' রজনী প্রভাতের অবসন্নতা জনিত বেদনার গান গাওয়া হত। এর প্রতি অংশেই মহড়া, কিতেন আর অন্তরা থাকতো। গানগুলি মূলত পয়ার ছন্দে রচিত হত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আখড়াই গান বেশ জনপ্রিয় থাকলেও অন্যান্য গানের স্রোতে এই ধারাটি হারিয়ে যেতে থাকে।

এই আখড়াই গানের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

- বাংলা লোকসংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা আখড়াই গান, যেখানে কাঁসি, খোল, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
- এই গানের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর শক্তিশালী এবং আবেগপূর্ণ সুর ও গানের কথার মধ্যে গভীরতা।
- আখড়াই গানের আসরে বাদ্যযন্ত্র এবং গানের মধ্যে একটি বিশেষ সমন্বয় থাকে, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।
- আখড়াই গানের ঐতিহ্যবাহী রূপ এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

হাফ-আখড়াই

ঊনবিংশ শতাব্দীর আখড়াই গানের একটি বিবর্তিত ধারা হল হাফ-আখড়াই। নিধুবাবু

আখড়াই গানের নতুন রূপ দিলে পরবর্তীতে দুই শতক ধরে প্রচলিত থাকলেও নিধুবাবুর বার্ধক্যের কারণে এবং উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ক্রমে ক্রমে তা হারিয়ে যেতে থাকে। এরই মধ্যে নিধুবাবুর প্রধান শিষ্য মোহনচাঁদ বসু ১৮৩২ সালে দাঁড়াকবি গানের মতো করে হাফ-আখড়াই গানের সূচনা করেন।

১৮৩২ সালে বড়বাজারের রামসেবক মল্লিকের বাড়িতে সর্বসাধারণের সামনে প্রথম হাফ-আখড়াই গানের আসর বসে। এই গানে তিনি কবিগানের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তর ও সখী সংবাদ যুক্ত করেছিলেন। এই হাফ-আখড়াই গানে অন্তরা থাকতো না এবং গানের পদ রচিত হত চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, ডবল ফুকা, মেলতা, মহড়া, খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় ডবল ফুকা, দ্বিতীয় মেলতা ইত্যাদি ধারাক্রমে। আখড়াই গানের মতো উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাফ-আখড়াই গান বেশ জনপ্রিয় থাকলেও অন্যান্য গানের স্রোতে এই ধারাটি হারিয়ে যেতে থাকে।

এই আখড়াই গানের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

- আখড়াই গানের একটি পরিবর্তিত রূপ হল হাফ-আখড়াই গান। যেখানে আখড়াই গানের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় থাকলেও সুর এবং গানের কথার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।
- হাফ-আখড়াই গানের আসরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আখড়াই গানের মতো হলেও এখানে গানের tempo এবং সুরের পরিবর্তন দেখা যায়।
- হাফ-আখড়াই গান সাধারণত আখড়াই গানের চেয়ে কিছুটা সহজবোধ্য এবং হালকা।
- এই হাফ-আখড়াই গানের মাধ্যমেও লোকসংস্কৃতির ধারা বজায় থাকে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। আখড়াই, হাফ-আখড়াই সম্পর্কে আপনাদের ধারণা প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৬ টপ্পা

কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান হল 'টপ্পা' গান। আঠার শতকের শেষে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি তথা টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয়। প্রধানত উটের গাড়ি চালকের মুখেই এই টপ্পা গান বেশি শোনা যেত। শোরী মিয়া নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ টপ্পা গানগুলকে সাংগীতিক আদর্শে সাজিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আর এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবু বাংলা টপ্পা গান রচনা করেন। এখানেই ভারতীয় হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতের ধারার সঙ্গে বাংলা রাগ-সংগীত চর্চা যুক্ত হয়। পরবর্তীতে টপ্পাকার কালীমির্জা, বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রীতির প্রবর্তক রামশংকর ভট্টাচার্য এবং বাংলা ভাষায় খেয়াল রচয়িতা রঘুনাথ রায় বাংলা গানকে আরও সমৃদ্ধ করে হিন্দুস্থানী রাগ সংগীতের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন।

টপ্পার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন—

- A. F. Strangways তাঁর 'Music of India' গ্রন্থে বলেছেন- 'পাঞ্জাবের উট চালকদের লোকগান থেকে টপ্পার উৎপত্তি'।
- অনেকে আবার বলেন 'আদি টপ্পাতে পাঞ্জাবি ভাষার আধিক্য রয়েছে। সেই বিচারে বলা যায় পাঞ্জাবের লোকগীতি থেকে গানের সূত্রপাত ঘটেছিল। হয়তো অন্যান্য পেশার মানুষের সঙ্গে উট চালকেরা এই গান গাইতেন।'
- রাজেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক' গ্রন্থে টপ্পার উৎস সম্পর্কে লিখেছেন— 'টপ্পা ছিল রাজপুতনার উষ্ট্র চালকদের গীত। শোনা যায়, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যেসব বণিক উটের পিঠে চেপে বাণিজ্য করতে আসত। তাদের গানের দানাদার তানকেই বলা হত জমজমা। আসলে জমজমা শব্দে দলবদ্ধ উষ্ট্র বোঝায়।'

বাংলা টপ্পা

বাংলা টপ্পা গানের প্রাণপুরুষ ছিলেন কালী মীর্জা। তিনি হুগলীতে বসবাস কালে বাংলা টপ্পা গানের প্রচলন শুরু করেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং গায়কও ছিলেন। এরপর বাংলা টপ্পা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবুর সূত্র ধরে। বিহারের ছাপরা জেলায় কালেক্টর অফিসে দ্বিতীয় কেরানি হিসেবে কাজ করার সময় লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের শোরী মিয়ার টপ্পার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এরপর ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে এসে শোভাবাজারের একটি আটচালা ঘরে প্রতি রাতে নিধুবাবু আনুষ্ঠানিক ভাবে টপ্পার সূচনা করেন।

কালী মীর্জা এবং নিধুবাবুর পরে বাংলা টপ্পাকে সচল রাখেন শ্রীধর কথক। তবে তাঁর গানে নিধুবাবুর প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়। এরপর পশ্চিমা টপ্পা শিখে বাংলা টপ্পার আসরে নাম লেখান মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সংগীতে অসাধারণ দখলের জন্য তিনি মহেশ ওস্তাদ নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এরপর শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন টপ্পা গানের শেষ জনপ্রিয় গায়ক।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে অর্ধ-শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হিসেবে টপ্পা গান একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। সংস্কৃত 'লম্ফ' শব্দ গূঢ়ার্থে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে গৃহীত হয়েছিল। এর অর্থ সংক্ষেপ্ত। খেয়াল বা ধ্রুপদের সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে হিন্দিতে 'টপা' শব্দ গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই শব্দটি দাঁড়ায় 'টপ্পা'। টপ্পা গানে ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কালাংড়া, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়া প্রভৃতি রাগের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। কিছু জনপ্রিয় টপ্পা গান —

- 'নানান দেশে নানান ভাষা।'
- 'পিরীতি না জানে সখী।'
- 'আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে।'
- 'সখি! কোথায় পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম।'
- 'এ কি তোমার মানের সময়? সমুখে বসন্ত।'
- 'অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব।'
- 'বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা।'



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। টীকা লিখুন— 'টপ্পা'। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেশ কিছু টপ্পাঙ্গের রচনা করেছিলেন, কিন্তু বাণীর ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন অনেক বেশি। পাশাপাশি তিনি বৈতালিক টপ্পা রচনা করেছিলন। রবীন্দ্রনাথের পর সার্থক টপ্পা রচনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের টপ্পার চলন অনেকটাই নিধুবাবুর টপ্পার মতো। তবে তাঁর গান সুর-তাল ও বাণীর সুসমন্বয়ে অনেক বেশি মহিমান্বিত।



১৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা—

- যুগসন্ধির কাল এবং সেই সময়ের কবিদের লক্ষণ সম্পর্কে জানলাম।
- কবিওয়ালাদের উদ্ভবের ধারণা পেলাম।
- হরুঠাকুর, ভোলাময়রা এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির প্রতিভা ও তাঁদের কবিগান প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে জানলাম।
- আখড়াই, হাফ-আখড়াই এবং টপ্পা গানের উৎস এবং বিস্তার সম্পর্কে ধারণা পেলাম।



১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ

১৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। আখড়াই আঠার শতকের শেষে ও ঊনিশ শতকের গোড়ায় ...লোকসংস্কৃতির ধারা বজাই থাকে। ...এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (১৪.৫ অংশ থেকে)

২। কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান হল 'টপ্পা' গান। ...এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তৈরি করুন। (দ্রষ্টব্য ১৪.৬ অংশটি)

১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধির কাল ও কবিত্ব লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। কবিওয়ালাদের উদ্ভবের ইতিহাস লিখুন।

৩। কবিওয়ালা হরু ঠাকুর সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৪। কবিওয়ালা ভোলা ময়রার কবিগানের বিষয়ে লিখুন।

৫। কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির প্রতিভা আলোচনা করুন।

৬। আখড়াই, হাফ-আখড়াই সম্পর্কে তোমার ধারণার পরিচয় দিন।

৭। টীকা লিখুন — 'টপ্পা'।

.....